হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

সময়ের কথা এবং আত্মবিশ্লেষণ

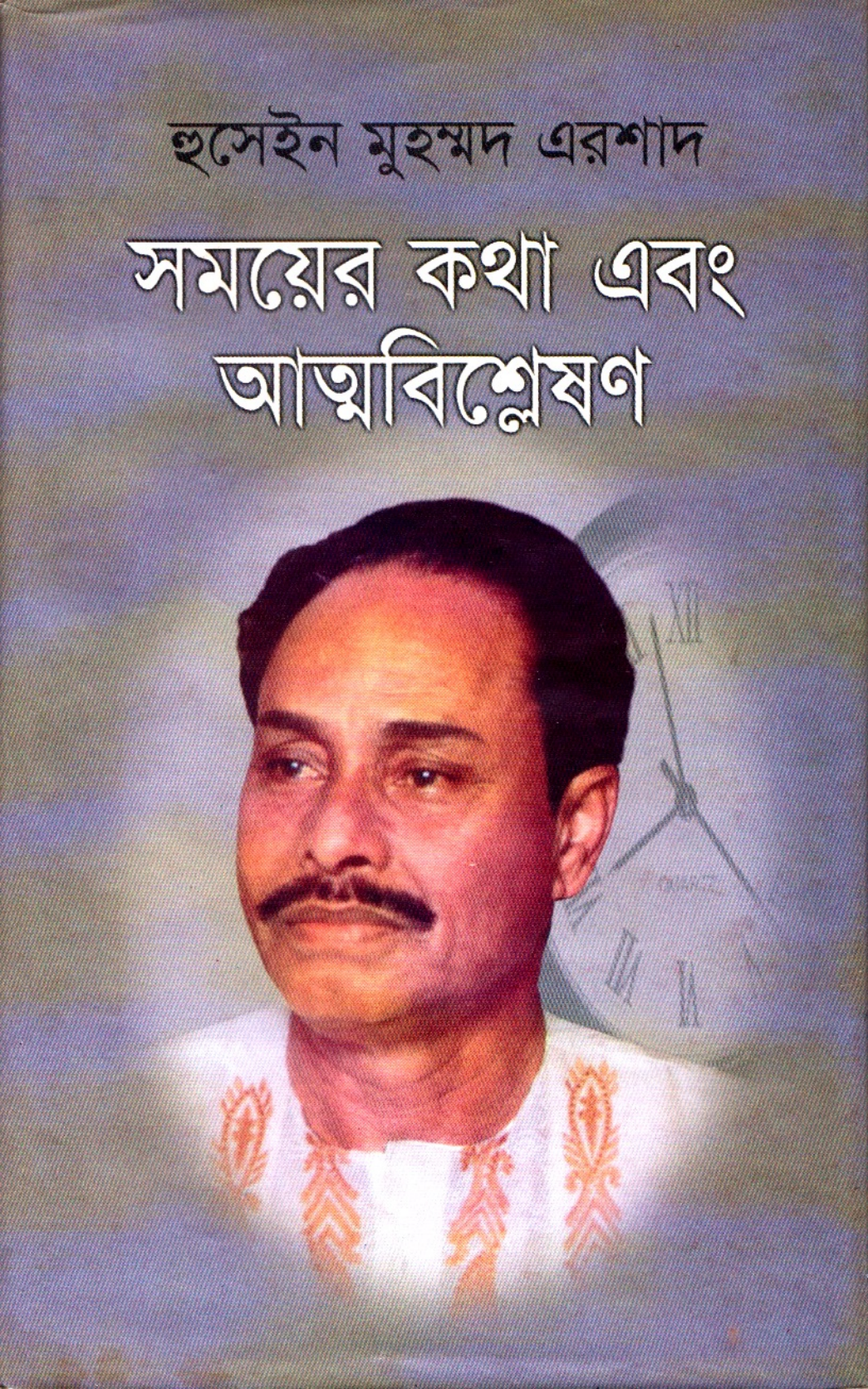

সময়ের কথা এবং আত্মবিশ্লেষণ

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

সম্পাদনা : সুনীল শুভরায়

আকাশ

www.pathagar.com

প্রকাশকাল :
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
জুন ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক :
ডা. সাদত আলী সিকদার

প্রকাশক :
আলমগীর সিকদার লোটন

আকাশ
সিকদার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫৬০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১৫২৬৯৭০

গ্রন্থস্বত্ব :
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ :
পঙ্কজ পাঠক

অক্ষর বিন্যাস
আরিফ ইকবাল আহমদ (রনি)
এম.এ. রহিম খান

মুদ্রণ :
সিকদার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৩৫৬৪

প্রাপ্তিস্থান :
বাড়ি নং ৭৫ই, সড়ক নং ১৭/এ, বনানী
ঢাকা ১২১৩
ফোন : ৮৮১৩৪৩৩, ৯৮৮৪১৭৭
Distributor :
House # 75E, Road # 17/A Banani,
Dhaka 1213
Bangladesh
Phone (880-2) 8813433 (880-2)9884177

মূল্য : ২০০ টাকা

Somoyer Khatha Abong Atmobishleshon
Need of the Hour and Self Appraisal by Hussain Muhammad Ershad
Published by Alamgir Sikder Loton. AKASH 38 Banglabazar. Dhaka-1100. Bangladesh.
Phone (880-2) 7165600 Email : akashpublications @yahoo.com
Price Taka 200 U. S. $ 15 only.

ISBN 984-8728-02-3

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জাতীয় পার্টির অগণিত কর্মী শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। ওদের ভালোবাসার প্রতিদান দেবার মতো কিছুই আমার কাছে নেই। আমার চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি দিয়ে সাজানো এই ক্ষুদ্র বইটি জাতীয় পার্টির সকল কর্মীর উদ্দেশে উৎসর্গ করে আমি তৃপ্তিবোধ করছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা : সময়ের কথা এবং আত্মবিশ্লেষণ -- ৯
দেশের জন্য যা করেছি এবং আগামীতে যা করতে চাই -- ১১
জাতীয় পার্টি : একটি সমালোচনা এবং আত্মবিশ্লেষণ -- ৩৮
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন পদ্ধতি এবং আমার কিছু প্রস্তাব -- ৪৮
হাসিনা–খালেদা সমঝোতা আমিও দেখতে চাই -- ৬৩
বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতির পরিকল্পনা -- ৭০
এ যুগের গোয়েবল্‌স গাফ্‌ফারনামা -- ৮০
বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ এবং আজকের প্রেক্ষাপট -- ৯২
নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার -- ৯৯
নির্বাচন নিয়ে যেভাবে ভাবছি -- ১০৬
সংকট নিরসনে আসুন সমঝোতার পথে -- ১১১
স্মৃতিতে প্রথম সার্ক সম্মেলন এবং আজকের প্রেক্ষাপট -- ১২০
জোট সরকারের চার বছর এবং কিছু মূল্যায়ন -- ১৩০
জোট হতে পারে কর্মসূচির ভিত্তিতে -- ১৪০
আরো একটি অপপ্রচার এবং কিছু কথা -- ১৪৬
সমালোচনার জবাব– প্রসঙ্গ বিদিশা -- ১৫৩
মানবজমিন এবং একজন পিতার অশ্রুসজল ঈদ -- ১৬০
খুলনাবাসীর একটি স্বপ্ন পূরণ -- ১৬৪
পল্টনে যা বলেছি -- ১৬৯
আমার জীবনের বৈচিত্র্যময় ঈদ -- ১৮০
কবিতায় আমার স্মৃতিময় ঈদ -- ১৮৬
ফজল শাহাবুদ্দীনের জন্মদিনে -- ২০১
স্মৃতিতে অম্লান মাওলানা মান্নান -- ২০৯
সংবাদপত্রের আদিকাল থেকে আজকের 'সমকাল' -- ২১৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা : সময়ের কথা এবং আত্মবিশ্লেষণ

'আত্মবিশ্লেষণ এবং আরো কিছু কথা'– আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ। এর আগে ২০০৪-এ একুশের বইমেলায় 'দেশ ও দশের কথা বলছি' নামে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। সাহিত্যমালা বইটি প্রকাশ করেছে। প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা আমাকে অনেকখানি উৎসাহিত করেছে– আরো বেশি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু সময়ের খুবই অভাব। সার্বক্ষণিকভাবে রাজনীতি করলে আর কোনোদিকে মন দেয়া যায় না। তারপরও কিছু ঘটনাকে উপলক্ষ করে লেখার তাগিদ আসে, যা উপেক্ষা করা যায় না। সেভাবেই লেখা হয়ে গেছে এই গ্রন্থে সংযোজিত নিবন্ধগুলো। লেখাগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিছু আছে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের ওপর। ফলে সেগুলো কালোত্তীর্ণ হয়নি। তবে ইতিহাস হিসেবে এসব কথা থেকে যেতে পারে।

লেখালেখির ব্যাপারে কবিতায় আমি যতোটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি– প্রবন্ধে-নিবন্ধে ততোটা নই। কবিতার দুটো লাইনের মধ্যে মনের অনেক ভাব প্রকাশ করা যায়, সেখানে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে স্থাপন করা যায়। তবে কবিতায় হাত দিয়েছি সেই ছোটবেলায়। কবিতা নিয়েই পূর্বে চর্চা করেছি বলে আমার লেখার হাতটা ওখানেই গণ্ডিবদ্ধ ছিলো। প্রবন্ধ লেখায় হাত দিয়েছি– এই সবেমাত্র। একেবারে পরিণত বয়সে। তাও আবার নিজের ইচ্ছায় নয়। কবিতা লিখেছি নিজের মনের তাগিদে আর প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছি পত্রিকার সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের তাগাদা পেয়ে। লেখা শুরু করে দেখলাম– ভালোই তো লাগে। মনের ভাবকে এখানে প্রসারিত করার সুযোগ আছে।

আমাকে নিয়ে কয়েকজন কলামিস্টও বেশ কিছু লেখা লিখেছেন। তার মধ্যে বেশিরভাগই আমার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা। যে কোনো সমালোচনাকেই আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বিজ্ঞ কলামিস্টদের মতামতকে সম্মানও করি। তবে অসত্য অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হলে আহত হই। আর আহত হলে ব্যথা প্রকাশ করার অধিকার তো আমার থাকেই। তাই কয়েকজন কলামিস্টের কিছু অসত্য অভিযোগ এবং অহেতুক আমাকে দোষারোপ করার বিরুদ্ধেও কলম ধরেছি। আবার সমালোচনার জবাবে আত্মবিশ্লেষণও

www.pathagar.com

করেছি। এসব লেখা বিভিন্ন সময়ে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আমার একান্ত কিছু মৌলিক লেখাও আছে। এই গ্রন্থে আরো সংযোজন করেছি আমার রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক কিছু লেখা। আছে কিছু সাহিত্যনির্ভর প্রবন্ধ। আমার বিশ্বাস-ভালোবাসা, আগামীর জন্য কিছু সংস্কার প্রস্তাব এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য– এসব মিলিয়েই এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। 'সময়ের কথা এবং আত্মবিশ্লেষণ'– যদি বিজ্ঞ পাঠকমহলকে সাময়িক তৃপ্তি দিতে পারে, তাহলেই আমার প্রচেষ্টা সফল হবে।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

www.pathagar.com

দেশের জন্য যা করেছি এবং আগামীতে যা করতে চাই

এক বিপর্যস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো। তারপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নয়টি বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার। সেখানে কতটুকু সফল হয়েছি বা বিফল হয়েছি– তার মূল্যায়ন করতে হলে পরবর্তী সময়ের সাথে আমার আমলের যোগবিয়োগ করার প্রয়োজন হবে। আমার মনে হয় দেশের মানুষ সে অংকটি নির্ভুলভাবে করতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে এখানে কিছু কথা বলতে চাই। তবে আমি যেহেতু একজন সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ– সেহেতু আমার চিন্তা-চেতনা-ভাবনায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যদি কিছু লিখতে চাই তাও হয়ে যায় রাজনৈতিক উপজীব্য।

আমি '৯০-এর ডিসেম্বরে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং একজন প্রধান বিচারপতিকে বিশ্বাস করে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর উভয় পক্ষের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতিতে আমাকে জেলে যেতে হয়েছিলো। অতঃপর জনতার আদালতে আমি সুবিচার পেলেও ক্ষমতার আদালত আমাকে মুক্তি দেয়নি। একনাগাড়ে ছয় বছর জেলে দুর্বিষহ দিন কাটিয়ে বাইরে এসে দেখলাম আমার সেই একান্ত প্রচেষ্টায় গড়া এক সমৃদ্ধ নতুন বাংলাদেশ আবার তামাটে হয়ে গেছে। গত দেড় দশকে দেশ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে। এখান থেকে উত্তরণের জন্য আমি কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সভা সমাবেশে আমি তা উল্লেখও করেছি। আমি বলেছি– আমি যা করতে পারবো সেই কর্মসূচিই প্রণয়ন করেছি। গৃহীত কর্মসূচি সফল করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। অতীতে তার প্রমাণ রেখেছি। আগেই বলেছি– এক বিপর্যস্ত দেশের দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো। দায়িত্ব গ্রহণ করে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পেরেছি– তার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এদেশের মানুষ বুঝতে পারবে আমি আমার কর্মসূচি সফল করতে পারবো কিনা। অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ক্ষমতা গ্রহণ

www.pathagar.com

করে মাত্র দুই বছরের মধ্যে যেসব কাজ করেছি তার কিছু বিবরণ এখানে তুলে ধরতে চাই।

০১. মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৪২ থেকে ২৬, বিভাগের সংখ্যা ৬০ থেকে ৪৫ এবং দফতরের সংখ্যা ২৫৫ থেকে ৮১টিতে হ্রাস করেছি।
০২. স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং রাষ্ট্রীয় বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের সংখ্যা ১৫৫ থেকে ১০৯টিতে হ্রাস করেছি এবং ৩০টি একই ধরনের সংস্থাকে ১২টিতে একত্রীকরণ করা ছাড়াও ১৩টি সংস্থা বিলুপ্ত করেছি।
০৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর, রাষ্ট্রীয় বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনগুলোতে পৃথকভাবে কাজের দায়িত্ব বর্ণনাপূর্বক কর্মচারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সমাপ্ত করেছি।
০৪. ৫ স্তর বিশিষ্ট পদ্ধতির স্থলে কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ৩ স্তর বিশিষ্ট বিকেন্দ্রীকরণমূলক প্রশাসন চালু করেছি।
০৫. ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর পর্যন্ত এক বছর সময়ে পর্যায়ক্রমে ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত করার কর্মসূচি সমাপ্ত করেছি।
০৬. আমার শাসনামলে ৪২টি মহকুমাকে জেলায় উন্নীতকরণের ফলে সর্বমোট জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪টিতে।
০৭. শূন্যপদ পূরণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সঠিক সংখ্যক হারে ক্যাডারভুক্ত অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করেছি।
০৮. ১৯৮৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৪ মাসে ৪৮১টি গুরুত্বপূর্ণ ও ৩৬৩টি বিবিধ ধরনের মন্ত্রী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ১১৮টি ছাড়া বাকি সব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছি।
০৯. 'অস্থায়ী' ভিত্তিতে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।
১০. সকল ধরনের সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ করেছি।
১১. সকল ক্যাডারভুক্ত কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা নির্ভুলভাবে প্রণয়ন।
১২. সরকারি কর্মচারীদের ৫৭ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ বাধ্যতামূলককরণ করেছি।
১৩. কোনো স্থানে ৩ বছরকাল চাকরি সম্পূর্ণ হবার পর সরকারি কর্মচারীদের অন্যত্র বদলির বিধান আবশ্যিক হিসাবে চালুকরণ করেছি।
১৪. সংশোধিত বার্ষিক গোপনীয় ফরম প্রবর্তন করেছি।
১৫. বিদেশে বিভিন্ন কোর্স, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে যোগদানের জন্য অফিসারদের নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।
১৬. অফিসে হাজিরার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু এবং অসুস্থতা সংক্রান্ত ছুটির বিধিগুলো সুনির্দিষ্টকরণ করেছি।

www.pathagar.com

১৭. শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেছি।
১৮. ইতিপূর্বে প্রবর্তিত 'দূত-পুল'-এর বিলোপ সাধন করেছি।
১৯. 'গ্রাম সরকার' পদ্ধতির বিলোপ করে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে বিরোধের অবসান ঘটিয়েছি।
২০. সরকারি যানবাহন ব্যবহারের জন্য কঠোর নিয়ম-পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।
২১. সরকারি বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করেছি।
২২. ঢাকার একটি মাত্র হাইকোর্ট বেঞ্চকে রংপুর, যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট এবং চট্টগ্রাম– এই ৬টি অতিরিক্ত বেঞ্চে সম্প্রসারণ করেছিলাম।
২৩. ত্বরিত বিচারের উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি দন্ডবিধি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি আইন সংশোধন করেছি।
২৪. গ্রামীণ জনসাধারণের নাগালের মধ্যে প্রতিটি উপজেলায় মুন্সেফ কোর্ট স্থাপন করেছিলাম।
২৫. একটি নয়া ভূমি সংস্কার নীতির মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছি। এতদসম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার দু'টি নয়া অধ্যাদেশ জারি করে:
ক. ভবিষ্যতে সংগৃহীত জমির সিলিং ৬০ বিঘা।
খ. বর্গাচাষীদের জন্য চাষের অধিকার ৫ বছর।
গ. বর্গা জমির উৎপাদিত ফসল যুক্তিপূর্ণভাবে উপকরণের জন্য এক-তৃতীয়াংশ, শ্রমের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং জমির মালিকানার জন্য এক-তৃতীয়াংশ ভাগ করা।
ঘ. ক্ষেতমজুরের জন্য ন্যূনপক্ষে সাড়ে তিন সের চাল অথবা সমমূল্যের অর্থ মজুরি হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।
২৬. ১৯৮২ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশ অনুসারে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশীদের জন্য বাংলাদেশের শিশু দত্তক হিসেবে গ্রহণ বেআইনি ঘোষণা করেছি।
২৭. ১৯৮৩ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশ মোতাবেক নারী নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছি।
২৮. ১৯৮২ সালে জারিকৃত প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮০ সালের যৌতুক প্রতিরোধ আইনকে আরো জে ারদারভাবে কার্যকরি করেছি।
২৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংস্থার মাধ্যমে শিশুসদন, এতিমখানা, ভবঘুরেদের আশ্রম এবং পঙ্গু শিশু কেন্দ্রগুলোকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
৩০. মোটর যানবাহনের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম প্রবর্তন এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালনা এবং দুর্ঘটনা মোকাবেলায় শাস্তি প্রদান ও বীমা ব্যবস্থার জন্য ১৯৩৯ সালের মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্টের স্থলে নয়া অধ্যাদেশ জারি করেছি।

www.pathagar.com

৩১. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং চা-বোর্ডের সদর দফতর ঢাকার বাইরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।
৩২. চট্টগ্রাম পৌরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীতকরণ করেছি।
৩৩. ১৯৮২ সালের পয়লা জুলাই থেকে দেশব্যাপী মেট্রিক পদ্ধতির মাপ ও ওজন প্রবর্তন করেছি।
৩৪. সুষ্ঠুতর প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধির সংশোধন করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২টি মৎস্য সংরক্ষণ জলযান সংগ্রহ করেছি।
৩৫. পর্যায়ক্রমে কারা সংস্কার কমিটির সুপারিশ কার্যকর করেছি।
৩৬. আত্মসমর্পণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপথগামী উপজাতীয়দের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং তাদের পুনর্বাসনে বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা গ্রহন করেছি।
৩৭. জাতীয় প্রেস কমিশন গঠন করেছি।
৩৮. টেলিভিশন এবং রেডিও একত্রীকরণের মাধ্যমে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ গঠন করেছি।
৩৯. সাভারে জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছি।
৪০. ট্যাক্সি, বেসরকারি বাস এবং ট্রাকে সরকার নির্ধারিত যথাযথ রং ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছি।
৪১. পাসপোর্ট প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণ করেছি।
৪২. শিল্প শ্রমিকদের জন্য বেতন এবং উৎপাদন কমিশন গঠন করেছি।
৪৩. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম, যৌথ দল-কষাকষির এজেন্ট নির্ধারণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনের অনুমোদন করেছি।
৪৪. অধিক হারে বিদেশে চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি এবং রিক্রুটিং এজেন্টদের হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে বহিরাগমন অধ্যাদেশ জারি করেছি।
৪৫. বাংলাদেশীদের বিদেশে চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস লিঃ (বোয়েসেল) নামে একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানি গঠন করেছি।
৪৬. কতিপয় শ্রমকল্যাণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি।

অর্থ এবং বিনিয়োগ

৪৭. আর্থিক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেছি। ফলে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ স্বাধীনভাবে হিসাবরক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা লাভ করে। এই কার্যক্রমের ফলে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধা-বিপত্তি দূর হয়।

www.pathagar.com

৪৮. বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক এবং আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮১-৮২ সালে শতকরা ০.৯ ভাগ থেকে ১৯৮২-৮৩ সালে শতকরা ৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

৪৯. মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৮১-৮২ সালের শতকরা ১৬ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালে শতকরা ১০ ভাগেরও কর্ম পর্যায়ে হ্রাস করা হয়।

৫০. সরকারের সঠিক অর্থ সংক্রান্ত নীতি, রফতানি বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণের ফলে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪শ' কোটি টাকায়। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের জুন পর্যন্ত এই মজুদের পরিমাণ ছিলো ২শ' ৫০ কোটি টাকা।

৫১. ১৯৮১-৮২ সালের ১২ শত ৫৫ কোটি টাকার রফতানি আয়ের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালের প্রথম নয় মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫শ' কোটি টাকায়।

৫২. ১৯৮১-৮২ সালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত ৭শ' ৭০ কোটি টাকার স্থলে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে দাঁড়ায় ১৫শ' কোটি টাকায়।

৫৩. বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) জন্য অর্থ প্রদান পদ্ধতি সহজকরণ করেছি।

৫৪. ১৯৮৩-৮৪ সালে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে উপজেলা পর্যায়ে অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ১শ' ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। উপজেলাগুলোতে উন্নয়ন বাবদ সরকারের বরাদ্দ ১শ' ৭১ কোটি টাকা। প্রতিটি উপজেলার জন্য এই সাহায্যের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতায় উপজেলা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত ছিলো।

৫৫. অবাধ অর্থনীতি জোরদার এবং সঞ্চয়ে জনগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ছয়টি নতুন বেসরকারি ব্যাংক খোলার অনুমতি দিয়েছিলাম।

৫৬. 'উত্তরা' ও 'পূবালী' ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে পাবলিক লিঃ কোম্পানিতে পরিণত করেছি।

৫৭. পেনশন বিধি ও পদ্ধতি সহজ করেছি।

৫৮. সকল সরকারি কর্মচারী, শিল্প-শ্রমিক, শিক্ষক এবং সাংবাদিকদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ হারে মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করেছি।

৫৯. বেতনের ক্ষেত্রে টাইম-স্কেল প্রবর্তন করেছিলাম।

৬০. একটি নতুন বেতন কমিশন গঠন। এখানে উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ বেতন ও সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছিলো ১৯৭৭ সালে।

৬১. কোনো রকম কর প্রদান করেনি এমন আয়ের অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে ২৭৩ কোটি টাকার অধিক আয়ের ঘোষণাপত্র পাওয়া যায়। এর ফলে সরকারের ৩৭ কোটি টাকারও বেশি আয় হয়।

www.pathagar.com

৬২. অধিকতর সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত কর-কাঠামো প্রবর্তন করেছি।
৬৩. পরিকল্পনা কমিশন, উপজেলাসমূহ সরকারি উন্নয়ন সংক্রান্ত সাহায্য ও সহযোগিতার সদ্ব্যবহারের নীতিমালা নির্ধারণ করেছি।
৬৪. স্টক এক্সচেঞ্জ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অর্থবহ পদক্ষেপ করেছি।
৬৫. ১৯৮২ সালের নয়া অধ্যাদেশের পদ্ধতি মোতাবেক বৈদেশিক দান/সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করেছি।
৬৬. যাকাত তহবিল এবং যাকাত বোর্ড গঠন করেছি।
৬৭. ২ কোটি টাকার বরাদ্দের মাধ্যমে 'হিন্দু ধর্ম কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা এবং বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রত্যেকটির জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে দু'টি পৃথক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছি।
৬৮. সরকারি হিসাব (পাবলিক একাউন্টস্) কমিটি গঠন।
৬৯. স্বল্প সুদে দেশের উপজেলাসমূহে এবং গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার ঋণ দানের সুবিধাদি সম্প্রসারিত করেছি। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছি।
৭০. কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট কৃষিঋণের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৪৮টি শাখাকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করেছি।
৭১. আমার শাসনামলে কৃষিঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১-৮২ সালের ৪২৪ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮২-৮৩ সালে কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮০ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৮৯০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়। সহজ শর্তে ঋণদানের ফলে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহারের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং এর ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
৭২. অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে দু'বছর মেয়াদি বিশেষ ট্রেজারি বন্ড ছাড়া হয় এবং পাঁচ বছর মেয়াদি সঞ্চয় সার্টিফিকেট চালু করা হয়।
৭৩. বৈদেশিক ঋণের বিনিময় হারের পরিবর্তন এবং অপচয় হেতু ব্যাংক এবং অন্যান্য অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহীতাদের দায়-দায়িত্ব লাঘব করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চালু করেছি।
৭৪. প্রবাসী বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারদের জন্য ব্যাংকিং ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করেছি।

শিল্প ও বাণিজ্য

৭৫. বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ এবং অলাভজনক সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত করে সেগুলোকে রক্ষা করার লক্ষ্যে উদার শিল্পনীতি গ্রহণ করেছি।

www.pathagar.com

৭৬. সরকার শুধুমাত্র ছয় শ্রেণীর মৌলিক শিল্প হাতে রেখে অবশিষ্ট সব সেক্টরের শিল্প দেশী-বিদেশী ও বেসরকারি পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করেছিলাম।

৭৭. বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার নীতি হিসেবে সরকার ৩৩টি পাটকল এবং ২৫টি বস্ত্রমিল থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে সেগুলো বাংলাদেশী মূল মালিকদের কাছে প্রত্যর্পণ করেছি। ফলে এসব ক্ষেত্রে উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ-এরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

৭৮. ১১৫৮টি পরিত্যক্ত অথবা কায়েমি স্বার্থবাদী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৮০টি ইউনিট থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আরো ৪৮১টি ইউনিট হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন ছিলো।

৭৯. দেশে বিদ্যমান দু'টি কর্পোরেশনের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে জীবন ও সাধারণ বীমা ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়। কোন বিদেশী কোম্পানিকে সাধারণ বীমা ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

৮০. সরকার নিয়ন্ত্রিত 'দি বাংলাদেশ অবজারভার' এবং 'চিত্রালীকে' পূর্বতন মালিকানায় ফিরিয়ে দিয়েছি।

৮১. 'দৈনিক বাংলা', 'বিচিত্রা' এবং 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর স্বাধীন ব্যবস্থাপনার জন্য 'দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট' ও 'বাংলাদেশ টাইমস ট্রাস্ট' নামে দু'টি পৃথক ট্রাস্ট গঠন করেছি। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিলুপ্ত করেছি।

৮২. চট্টগ্রামস্থ রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ জোনে কাজ শুরু হয় আমার শাসনামলে।

৮৩. নতুন শিল্পের মঞ্জুরি দানের পদ্ধতি ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্প দফতরে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি।

৮৪. কতিপয় উৎসাহ প্রদানকারী সুবিধাসহ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

৮৫. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্যও উৎসাহ প্রদানকারী সুবিধাদি প্রদান করেছি।

৮৬. স্থানীয় শিল্পসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য ৪৪টি আইটেমের দ্রব্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।

৮৭. ইটখোলায় জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহারে উৎসাহদানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি।

৮৮. কক্সবাজারে পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্কমুক্ত দোকান উদ্বোধন এবং মোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং রেস্ট হাউজগুলোর পুঁজি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে একটি সুস্থভিত্তিক সংস্থায় পরিণত করেছি।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

৮৯. পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমন্বয় সাধন করেছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছি।

৯০. উপজেলা পর্যায়ে ৩১ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৩ জন বিশেষজ্ঞসহ ৯ জন ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলাম। পল্লী এলাকার ৩৯৭টি উপজেলার মধ্যে ৩৩৩টিতে এরূপ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু হয়।

৯১. প্রতিটি ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণাধীন থাকে। এইসব কেন্দ্রে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত ঔষধ এবং কর্মচারী দিয়ে সুসংগঠিত করা হয়েছিলো।

৯২. রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত ডাক্তারের সংখ্যা ৫৯১৭-তে বৃদ্ধি করেছি।

৯৩. বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কিংবা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য ডাক্তারদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অন্তত এক বছর মেয়াদি চাকরি বাধ্যতামূলক করেছিলাম।

৯৪. জনগণের দুয়ারে অত্যাবশ্যকীয়, নিরাপদ এবং কার্যকর ঔষধ-পথ্য সুলভ মূল্যে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নতুন ঔষধ নীতি কার্যকর করেছি। ৪ হাজার প্রকার ঔষধের মধ্যে ১৭০৭ প্রকার ঔষধ নিষিদ্ধ করা হয়। শুধুমাত্র ২৫০ প্রকার ঔষধ অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ হিসেবে রাখা হয়। উপজেলা পর্যায়ে ৩৩ প্রকার ঔষধের ব্যবহার জরুরি হিসেবে অনুমোদন করেছি।

৯৫. ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের ফি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম।

৯৬. বেসরকারি ক্লিনিক, নার্সিং হোম ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিগুলোর মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম।

৯৭. সরকারি হাসপাতালগুলোতে পথ্যের বরাদ্দ ৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ টাকা করেছি। হাসপাতালের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পেয়িং বেডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিলো।

৯৮. মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষা পদ্ধতি সুবিন্যস্ত ও জোরদার করেছিলাম।

৯৯. ১৯৮৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ থেকে ১.৭ শতাংশে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটি 'দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নাধীন ছিলো। উপজেলাগুলোর জন্য স্থিরীকৃত স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির লক্ষ্যমাত্রা বহু উপজেলায় অতিক্রম করেছিলো।

কৃষক ও কৃষি উপকরণ

১০০. আমি কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলাম এবং উন্নয়ন বাজেটের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ এই খাতে বরাদ্দ করেছি।

www.pathagar.com

১০১. আমার সরকারের গতিশীল নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮২-৮৩ সালে খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ৫১ লাখ টনে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য এই লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৬১ লাখ টন নির্ধারণ করা হয়।

১০২. সেচ প্রকল্পাধীন চাষাবাদ এলাকা পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ সালের ৩৬ লাখ একরের স্থলে ১৯৮৩-৮৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ লাখ একরে দাঁড়ায়।

১০৩. ১৯৮৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে ১৭,৩০০টি গভীর নলকূপ, ১ লাখ ২০ হাজার ৬ শ'টি অগভীর নলকূপ এবং ৪২ হাজার ৩০০টি লো-লিফট পাম্প বসানো হয়েছিলো।

১০৪. পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সারের ব্যবহার ২০% বৃদ্ধি পায়।

১০৫. কৃষকদের নিকট সহজ শর্তে কৃষিঋণ বিতরণ বাড়তি খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। ১৯৮১-৮২ সালের ৪২৪ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১৮ কোটি টাকায়।

১০৬. গম উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ সালে এর উৎপাদন ছিলো মাত্র ৪ লাখ টন এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে তা ২০ লাখ টনে দাঁড়ায়।

শিক্ষা বিষয়ক

১০৭. শিক্ষাকে আরো বাস্তবমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক চাহিদার পূর্ণ উপযোগী হিসেবে ঢেলে সাজানোর জন্য শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি।

১০৮. আমার শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রতি ২ বর্গকিলোমিটার এলাকার বা ২০০০ জনসংখ্যার জন্য একটি করে প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো।

১০৯. ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

১১০. পূর্ববর্তী দু'বছরের শূন্য পদসমূহে ১২ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করেছি।

১১১. প্রাইমারি বিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করেছি।

১১২. চার বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাসমূহ একই দিনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। পরীক্ষার ফলাফলও একই সঙ্গে ঘোষণার ব্যবস্থা করেছি। চার বোর্ডের পাঠ্যক্রমও অভিন্ন নির্ধারণ করা হয়।

১১৩. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বেসরকারি পর্যায়ে ছেড়ে দিয়েছি। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ব্যবস্থা বাতিল করেছি।

www.pathagar.com

১১৪. প্রতি উপজেলায় অন্তত একটি বালিকা ও একটি বালক বিদ্যালয়কে এবং প্রতি জেলা সদর দফতরে একটি কলেজকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছি। ২১টি কলেজকে জাতীয়করণ করেছি। ৯টি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করেছি।

১১৫. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধাদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছি। শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা তাদের বেতনের ৭০ ভাগে উন্নীত করেছি।

১১৬. ১৮০০ জন কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ফলে প্রায় ২০০০টি শূন্য পদ নতুন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা শুরু করেছিলাম।

১১৭. বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাচিত কলেজসমূহের শিক্ষাঙ্গন সুবিধাদির উন্নয়ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিলো :

ক) অতিরিক্ত ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় হল এবং ১৭টি কলেজ হোস্টেল নির্মাণ।

খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দোতলা বাসসহ অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা।

গ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ।

ঘ) উন্নত ডাইনিং রুম ও বিনোদন সুবিধা।

ঙ) 'পে অ্যাজ ইউ আর্ন' প্রকল্পে স্কুটার বরাদ্দের মাধ্যমে ছাত্রদের সম্পূরক আয়ের ব্যবস্থা করা।

১১৮. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে এসেছি।

১১৯. কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রশিক্ষণের জন্য 'বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট'-কে শিক্ষা বিভাগ থেকে শ্রম ও জনশক্তি বিভাগে হস্তান্তর করেছি।

অবকাঠামো উন্নয়ন :

স্থল যোগাযোগ

১২০. জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় এবং প্রত্যন্ত পল্লী পর্যায়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলাম।

১২১. জাতীয় নীতি হিসেবে সব উপজেলার সাথে পাকা সড়কের যোগাযোগ অগ্রাধিকার দিয়েছি। দুই বছরের মধ্যে ২০৬টি উপজেলায় সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করেছি।

১২২. মাওয়া হয়ে ঢাকা-খুলনা বিকল্প রাস্তা নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে যায় এবং ঢাকা-মাওয়া অংশের কাজ শেষ পর্যায়ে থাকে।

১২৩. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিম্নাঞ্চলীয় রাস্তার (যাত্রাবাড়ী-শীতলক্ষ্যা) নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত করেছি।

১২৪. গণচীনের সহায়তায় বুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

www.pathagar.com

১২৫. জাপানের বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে।
১২৬. যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য টার্মিনাল ভবন নির্মাণসহ আরিচা এবং নগরবাড়ী সার্বিক উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করেছি।
১২৭. দুই বছরের মধ্যে ভুয়াপুর ও সিরাজগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকা এবং সংযোগ সড়কসমূহের সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়।
১২৮. খুলনা-মংলা সড়ক এবং কুমিল্লা-চান্দিনা বাইপাস নির্মাণ সমাপ্তির পথে থাকে।
১২৯. সিলেটের সঙ্গে ভৈরব হয়ে ঢাকার সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ সমাপ্ত করেছি।
১৩০. উপজেলা গঠনের ফলে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ বিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করে। এ লক্ষ্যে কাজের বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি, সরকারি সহায়তা এবং স্থানীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী পল্লী অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাস্তা, কালভার্ট নির্মাণ এবং পুরাতন সড়কের সংস্কার করেছি।
১৩১. শহরাঞ্চলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার কার্যক্রম জোরদার করেছি। এই সবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কারিগরি ক্ষেত্রে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।
১৩২. রেল যোগাযোগকে সুষ্ঠুতর করার লক্ষ্যে রেলওয়ে বোর্ড-এর বিলুপ্তি এবং রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল এবং রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল নামে দু'টি সংস্থা গঠন করেছি।
১৩৩. ভ্রাম্যমাণ জনসাধারণের সুবিধার্থে রেল স্টেশনসমূহের সংস্কার সাধন করেছি।
১৩৪. রেলওয়ে ৩০টি ডিজেল ইঞ্জিন ও ১২শ' ৫৫টি মালবাহী বগি সংগ্রহ করে এবং ১শ' ৬টি যাত্রীবাহী বগি সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

নৌ-যোগাযোগ

১৩৫. দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে মংলা বন্দরের সার্বিক উন্নয়ন করেছি। ৫টি জেটি নির্মাণের ফলে ২৫ ফুট নাব্যতা বিশিষ্ট একাধিক জাহাজ থেকে মাল উঠা-নামার সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
১৩৬. নতুন বন্দরের সুবিধার্থে নদীর খনন কাজ অব্যাহত রেখেছি।
১৩৭. আমার আমলে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরে স্থাপিত হয় অতিরিক্ত ৫টি চলাচল ছাউনি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক গুদামঘর, বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যাদি উঠা-নামার উপযোগী একটি জেটি এবং জেটি সংলগ্ন ৩০ ফুট নাব্যতা বিশিষ্ট জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা করেছি।
১৩৮. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল সংস্থার সাংগঠনিক এবং সার্ভিস পর্যায়ে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছি।

www.pathagar.com

১৩৯. ১৯৮৩ সালে 'বাংলাদেশ বাণিজ্য জাহাজ চলাচল অধ্যাদেশ' জারির মাধ্যমে বহুকালের পুরাতন আইন বাতিল হওয়ায় পতাকাবাহী জাহাজসমূহ হুকুম দখল ও রেজিস্ট্রেশন প্রশাসনিক ক্ষমতার আওতায় আসে। অনুরূপভাবে ১৯৮২ সালের 'বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সংরক্ষণ)' অধ্যাদেশ জারির ফলে বাংলাদেশের জাহাজসমূহের বাণিজ্যে ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

বিমান যোগাযোগ

১৪০. বেসামরিক বিমান চলাচল দফতর এবং বিমানবন্দর উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুতর করার লক্ষ্যে ২টি সংস্থার একত্রীভূত 'বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ' নামে একটি একক সংস্থা গঠন করেছিলাম।

১৪১. রাজশাহী বিমানবন্দরের নির্মাণ সমাপ্ত করেছি ফলে রাজশাহী বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের আওতায় আসে।

১৪২. সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত করেছি।

১৪৩. চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে বোয়িং উঠা-নামার উপযোগী রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছি।

১৪৪. বাংলাদেশ বিমানের কার্যক্রম যুগোপযোগী এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৪টি সর্বাধুনিক ডি.সি.১০-৩০ বিমান ক্রয় করেছি।

১৪৫. বিমানের রং জাতীয়তার প্রতীক লাল ও সবুজে পরিবর্তন করেছি।

টেলিযোগাযোগ :

১৪৬. ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে ২শ' ১২টি উপজেলায় উন্নত ডাক ব্যবস্থা বাস্ত বায়ন করেছি।

১৪৭. বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ডায়ালিংক পদ্ধতির আওতায় আসে।

১৪৮. পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতি চালু হয়।

১৪৯. জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ১শ' ৩৯টি উপজেলার ভেতর ৭৮টি উপজেলায় ৩০ লাইনের 'মেগনেটো এক্সচেঞ্জ' স্থাপন সমাপ্ত হয়।

বৈদ্যুতিক ও খনিজ শক্তি

১৫০. পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃযোগাযোগ স্থাপনের ফলে প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকার জ্বালানি খরচের সাশ্রয় হয়।

১৫১. আশুগঞ্জে ৬০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট চালু করেছি।

www.pathagar.com

১৫২. চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, বরিশাল, ঘোড়াশাল এবং আশুগঞ্জে বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশন নির্মাণ সমাপ্তির পর্যায়ে থাকে।

১৫৩. প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২৪ মাসে রাজস্ব আয় দাঁড়ায় ৫শ' কোটি টাকা। এই অংক পূর্ববর্তী ২ বছরের রাজস্ব আয় থেকে ১৬ শতাংশ বেশি।

১৫৪. ১শ' ২৬টি উপজেলায় বিদ্যুতায়নের বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করি। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য উপজেলাসমূহ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৫. ২ বছরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সর্বমোট ৫ হাজার মাইল বিতরণ লাইন স্থাপন সমাপ্ত করে।

১৫৬. দেশের পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ ও কারিগরি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন করেছি।

১৫৭. জরুরি ভিত্তিতে বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের সঙ্গে তিতাস গ্যাসের সংযোগের জন্য ৩২ মাইলব্যাপী ২০ ইঞ্চি লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সংযোগ স্থাপনের ফলে দেশের দু'টি প্রধান গ্যাস উৎসের সমন্বয় ঘটে এবং দেশের কল-কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন প্রকল্প এবং গৃহস্থালি কাজে অধিকতর গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

১৫৮. জয়পুরহাট কঠিন শিলা খনি এবং সিমেন্ট উৎপাদন প্রকল্পের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছি।

১৫৯. তিতাস গ্যাসের ৬ নম্বর কূপ চালু করা হয় এবং ৭ ও ৮ নম্বর কূপের 'সারফেস গ্যাদারিং ফ্যাসিলিটিজ' সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়।

১৬০. সীতাকুণ্ড কূপের খনন কাজ দ্রুত অগ্রগতির পথে থাকে।

<u>পানি উন্নয়ন</u>

১৬১. 'ন্যাশনাল ওয়াটার মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছি।

১৬২. বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ প্রণীত দেশের দীর্ঘতম বাঁধ 'তিস্তা বাঁধ প্রকল্প'-এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন থাকে। ১৯৮৫ সাল নাগাদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

১৬৩. মুহুরি সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করেছি।

১৬৪. মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছি।

১৬৫. কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, মনু নদী প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী প্রকল্প, পাবনা সেচ প্রকল্প এবং উত্তরবঙ্গ নলকূপ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যায়।

১৬৬. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলার জন্য শহর সংরক্ষণ প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

১৬৭. জারিকৃত নতুন জলকর অধ্যাদেশের লক্ষ্য ছিলো প্রকল্পসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। সে লক্ষ্যে সফল হয়েছি।

নির্মাণ কাজ

১৬৮. জরুরি ভিত্তিতে উপজেলাসমূহে কোর্ট ভবন, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং অফিসার ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছিলাম এবং তাতে সফল হয়েছি।

১৬৯. মুজিবনগরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছি এবং যথাসময়ে সমাপ্ত করেছি।

১৭০. উপজেলা এবং জেলা সদর দফতরসমূহের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ দ্রুগ এগিয়ে নিয়েছি।

১৭১. ৬ হাজার ৫ শ' ৩৭টি বাড়ির জরিপের আলোকে ১৯৮৪ সালের ৩০ জুন নাগাদ পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর বিক্রির শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছি।

১৭২. সচিবালয়ের অভ্যন্তরে মন্ত্রণালয়সমূহের যথাযথ স্থান সংকুলানের জন্য এলাকা পুনঃবণ্টন করেছি।

১৭৩. প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে পুরাতন গণভবনকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন-এ রূপান্তর করেছি।

১৭৪. সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের বাস উপযোগী স্বল্প ব্যয়ের ফ্ল্যাট ও ভবন নির্মাণের কয়েকটি প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিয়ে এসেছি।

১৭৫. ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য আবাসিক প্লট বরাদ্দ করেছি।

ঢাকার উন্নয়ন :

১৭৬. মহানগরী ঢাকার শুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণের জন্য পূর্বেকার Dacca-এর পরিবর্তে Dhaka প্রবর্তন করেছি।

১৭৭. রেকর্ড সময়ের মধ্যে সাভারস্থ স্মৃতিসৌধের নির্মাণ সমাপ্ত করেছি।

১৭৮. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের চত্বর সম্প্রসারণ করেছি।

১৭৯. বায়তুল মোকাররম মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন ভবনের সম্প্রসারণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সমাপ্ত করেছি।

১৮০. জাতীয় সংসদ ভবন এবং তৎসংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করেছি।

১৮১. রমনায় অবস্থিত তিন জাতীয় নেতার মাজারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছি।

১৮২. শাহবাগে নির্মিত জাতীয় জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছি।

১৮৩. জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রেকর্ড সময়ে একটি ভিভিআইপি টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ সমাপ্ত করেছি।

১৮৪. একটি জাতীয় ঈদগাহ্ নির্মাণ করেছি।

www.pathagar.com

১৮৫. সচিবালয়ের সম্মুখস্থ এলাকায় একটি নাগরিক সংবর্ধনা কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

১৮৬. পুরনো রেলওয়ে এলাকায় বাগানসহ একটি সবুজ পার্ক স্থাপন করা হয়। এতে করে নগরীর কেন্দ্রস্থলের নগরবাসীদের জন্য বহুদিনের প্রয়োজনীয় ভ্রমণের স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

১৮৭. পুরনো ঢাকা এলাকায় যানবাহনের সহজ যাতায়াতের জন্য নর্থ সাউথ রোড এবং ওয়ারী খাল রোড সম্পূর্ণ করেছি।

১৮৮. আগারগাঁও-মিরপুর রোড নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করি। এর ফলে মিরপুর এলাকা থেকে নগরীতে যাতায়াতের দূরত্ব হ্রাস পায়।

১৮৯. মিরপুর ও গুলশান পৌরসভা দু'টোকে ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

১৯০. প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ঢাকা নগরীর সকল রাস্তার দায়িত্ব কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করেছি।

১৯১. নতুন এয়ারপোর্ট রোডের উন্নয়ন এবং তিনটি স্থানে স্থায়ীভাবে শুভাগমন তোরণ নির্মাণ করেছি।

১৯২. উত্তরা এবং বারিধারা আবাসিক এলাকায় নতুন প্লট বরাদ্দ করেছি।

১৯৩. পুরনো ঢাকায় ৩টি খেলার মাঠ এবং ২৮০টি বিপণী বিশিষ্ট ধূপখোলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করে উক্ত এলাকায় অবিস্মরণীয় উন্নয়ন সাধন করেছি।

১৯৪. অনেকগুলো কাঁচা বাজার ভেঙে দিয়ে পৌর কর্পোরেশন কর্তৃক আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট নতুন বাজার নির্মাণ করেছি।

১৯৫. গুলশান এবং ধূপখোলায় নতুন মার্কেট নির্মাণ এবং নবাব ইউসুফ মার্কেট, ২ নং কাওরান বাজার এবং রায়ের বাজারের পুনঃসংস্কারের কাজ ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করেছি।

১৯৬. ফুলবাড়িয়া কেন্দ্রীয় বাস স্টেশনে যানবাহনের ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে তেজগাঁও, গাবতলী ও যাত্রাবাড়ীতে ৩টি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ করেছি।

১৯৭. মিরপুরস্থ গাবতলীর গরুর হাট মিরপুর সেতু ও তুরাগ নদীর পাশে সরিয়ে নিয়েছি।

১৯৮. এক ডজনেরও বেশি শিশু পার্ক নির্মাণ করেছি।

১৯৯. সড়কের যানবাহন চলাচল চিহ্নিতকরণ ও ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা হয়।

২০০. নগরীর আবর্জনা সরানোর অতীতের অব্যবস্থা গরু গাড়ির স্থলে ট্রাক চালু করা হয়।

২০১. নগরীর সমস্ত রাস্তাঘাট যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছি।

২০২. নগরীকে সুন্দর করে তোলার ও নগরবাসীদের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দানের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি।

www.pathagar.com

২০৩. নগরীর পানি সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি জন্য ওয়াসার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

২০৪. পুরনো লাইন বদলিয়ে নতুন লাইন স্থাপন, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বকেয়া বিল আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করেছি।

২০৫. নগরীর প্রত্যেকটি রাস্তাঘাট ও গলিতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছি।

২০৬. নগরবাসীদের জন্য গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেছি।

২০৭. ১৯৮৩ সালের ৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪তম ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানে স্বাগতিক দেশ হিসেবে ঢাকা মর্যাদা লাভ করে। সম্মেলনকালে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল দেশ ও প্রতিনিধিদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

আমার আমলে যে সব কর্মসূচি পদক্ষেপ ও সংস্কার বাস্তবায়নের ফলে ঘুমন্ত বাংলাদেশ উন্নয়নের ছোঁয়ায় জাগ্রত হয়েছিলো– তার কিছু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করতে চাই :

১. উপজেলাভিত্তিক তিন স্তরের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু।

২. মাত্র এক বছরের মধ্যে ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ।

৩. মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করার ফলে পূর্ববর্তী ২১টি জেলার সংখ্যা ৬৪টিতে উন্নীত হয়।

৪. প্রত্যেক উপজেলায় ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ কোর্ট স্থাপন।

৫. একটিমাত্র হাইকোর্ট বেঞ্চকে বিকেন্দ্রীকরণ করে ঢাকার বাইরে জেলা সদর কুমিল্লা, রংপুর, বরিশাল, যশোর, চট্টগ্রাম ও সিলেটে ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন।

৬. আইন সংস্কার কমিশন গঠন।

৭. ১৯৮৮ সালের ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি আইন সংশোধন।

৮. যৌতুক নিরোধ আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ জারি।

৯. নারী নির্যাতন (প্রতিরোধমূলক শাস্তি) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ জারি।

১০. মুসলিম পারিবারিক আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮৫ জারি।

১১. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারি।

১২. 'বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু আদেশ ১৯৭২' বাতিল ঘোষণা।

১৩. বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী স্থাপন।

১৪. বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

১৫. পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ৬/৭ বছর ধরে পদোন্নতি বন্ধ থাকার পর মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির বিধান চালু।

১৬. গেজেটেড পদে মহিলাদের জন্য ২০% পদ সংরক্ষণ।

www.pathagar.com

১৭. দেশে প্রথমবারের মতো ৪০ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ।
১৮. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শকতরা ৫০ ভাগ পদে মহিলাদের নিয়োগের ব্যবস্থা।
১৯. মেয়েদের জন্য পৃথক ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা।
২০. পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা।
২১. মহিলা বিষয়ক পরিদফতর গঠন ও পরে অধিদফতরে উন্নীতকরণ।
২২. মহিলাদের জন্য চাকরি বিনিয়োগ তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।
২৩. মহিলাদের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
২৪. ঔষধ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২৫. ভূমি সংস্কার।
২৬. বর্গাচাষীদের প্রজাস্বত্ব ভোগের মেয়াদ ৫ বছর নির্দিষ্টকরণ।
২৭. দেশে প্রথমবারের মতো কৃষি শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ।
২৮. বর্গাচাষীদের চাষকৃত জমির ফসল তেভাগা নিয়মের ভিত্তিতে বণ্টন।
২৯. বেনামিতে জমি ক্রয় বা হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ।
৩০. বাস্তুভিটা থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ রহিতকরণ।
৩১. সরকারি খাস জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ।
৩২. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের ব্যবস্থাপনায় জলমহাল হস্তান্তর।
৩৩. গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা।
৩৪. মাত্র দু'বছরে (১৯৮৮-৯০) সারা দেশে ৫৬৮টি গুচ্ছগ্রাম স্থাপন করে তাতে প্রায় ২১০০০ ছিন্নমূল ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসিত করা।
৩৫. ঋণগ্রস্ত কৃষকদের ঋণের জাল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন।
৩৬. বেসরকারি খাতে ব্যাংক ও বীমা স্থাপনের অনুমতি প্রদান।
৩৭. বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার ফলে এই খাতে শিল্প স্থাপনে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ শূন্যের কোঠা থেকে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটিতে উন্নীত হয়।
৩৮. শিল্পক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালেই শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত হয়।
৩৯. কালো টাকা উদ্ধার করে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্তকরণ।
৪০. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।
৪১. তৈরি পোশাকে রফতানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রফতানিকারকদের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিলো চতুর্থ।

www.pathagar.com

৪২. খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯-৯০ সালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ, প্রায় ২ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়।
৪৩. বিনিয়োগ বোর্ড গঠন।
৪৪. রফতানি আয় সোয়া এক কোটি বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।
৪৫. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৮১-৮২ সালের মাত্র শূন্য দশমিক এক শতাংশ থেকে মাত্র চার বছরের মধ্যে তা শতকরা পাঁচ ভাগের ওপর বৃদ্ধি পায়।
৪৬. বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
৪৭. দায়িত্ব গ্রহণের সাত বছরের মধ্যে সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত হয়।
৪৮. পল্লী কৃষিঋণ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৫০টি শাখাকে কৃষি ব্যাংকের আওতায় আনা।
৪৯. ১৯৮২ ও তার পরে ১৯৮৬ সালে (সংশোধিত) বাস্তবমুখী শিল্পনীতি ঘোষণা।
৫০. ৩৩টি পাটকল ও ২৬টি বস্ত্রকলসহ ৫৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করা হয়।
৫১. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
৫২. চট্টগ্রামে ইউরিয়া ও যমুনা (তারাকান্দি) সার কারখানা স্থাপন।
৫৩. মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন।
৫৪. রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলসমূহকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান এবং নতুন রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা। ৮ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ১৭ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি কাঁচা রাস্তা নির্মাণ। ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে ৪১৭টি উপজেলা সদরকে দেশের সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।
৫৫. চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুসহ (বুড়িগঙ্গা সেতু) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি বৃহৎ সেতুসহ (নির্মাণের শেষ পর্যায়ে আরো ১৮টি) সারা দেশে ৫০৮টি ছোট-বড় সেতু নির্মাণ।
৫৬. ৪৬০টি উপজেলায় নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন।
৫৭. দেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন।
৫৮. দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতির প্রবর্তন।
৫৯. আন্তর্জাতিক সাবস্ক্রাইবার্স ডায়ালিং পদ্ধতির প্রবর্তন।
৬০. দেশের প্রথম বিরতিহীন আন্তঃনগর দ্রুতগামী ট্রেন সার্ভিসের প্রবর্তন। ২৮টি আন্তঃনগর দ্রুতগামী ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়।
৬১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত ২৮৭টি উপজেলায় হেলিপ্যাড নির্মাণ।

www.pathagar.com

৬২. যমুনা নদীর উপর বহুমুখী সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও 'যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ' গঠন। সেতু নির্মাণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজস্ব সূত্রের উপর সারচার্জ ও লেভি আরোপ এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে আন্তর্জাতিক সাহায্যের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।
৬৩. পার্বত্য অঞ্চলের বিপথগামীদের পুনর্বাসন এবং এই অঞ্চলের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন।
৬৪. সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬৫. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।
৬৬. দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকা প্রায় ১২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ পুরণ। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় এবং শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।
৬৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পূর্ণ সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান।
৬৮. প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণে উন্নীতকরণ। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ২০ লাখ টাকার একটি ট্রাস্ট গঠন।
৬৯. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই বাতিল।
৭০. পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা। নারী শিক্ষার এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালের সরকারগুলো অধিকতর উচ্চতর পর্যায়ে নারীশিক্ষাকে অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হন।
৭১. স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের বেতনের টাকা প্রদানের ব্যবস্থা।
৭২. বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকদেরকে সরকারি গেজেটেড অফিসারের অনুরূপ সত্যায়ন ক্ষমতা প্রদান।
৭৩. বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সরকার প্রদত্ত অনুদান ১৯৮০-৮১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ করা।
৭৪. অজস্র মাধ্যমিক স্কুলকে জাতীয়করণসহ অনেক বেসরকারি স্কুলকে সরকারিকরণ।
৭৫. নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির (অবজেকটিভ টাইপ) প্রবর্তন।
৭৬. দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস একীভূত করে সারা দেশের জন্য একটি মাত্র শিক্ষা কারিকুলাম প্রবর্তন।
৭৭. চারটি বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল একই সাথে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭৮. পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব পুস্তক প্রকাশক সমিতির কাছে অর্পণ।
৭৯. নতুন পর্যায়ে ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন।
৮০. ঢাকায় মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন।
৮১. মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (পরবর্তীকালে উন্মুক্ত) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

www.pathagar.com

৮২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল নির্মাণ।

৮৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

৮৪. নিরাপদ প্রসব কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে ২৫০০০ দাইকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮৫. বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসকদের ফি নির্ধারণ।

৮৬. প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন ও ৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ ৯ জন চিকিৎসক নিয়োগ।

৮৭. ১২ হাজার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর এড-হক নিয়োগ নিয়মিতকরণ।

৮৮. পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত ৮ হাজার ব্যাংক কর্মচারীর অধিকাংশকে পুনর্বহাল এবং মৃত্যুবরণকারী ব্যাংক কর্মচারীদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৮৯. সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের সময়সীমা ৫৭ বছর নির্ধারণ করে সংসদে আইন পাশ।

৯০. সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বল্প আয়ের কথা বিবেচনা করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দু'টি প্রধান ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে উৎসব বোনাস প্রদান।

৯১. টাইম-স্কেল প্রদান।

৯২. উপযুক্ত স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান।

৯৩. চিত্তবিনোদন ভাতা ও গৃহনির্মাণ আগাম পুনঃপ্রবর্তন।

৯৪. পে-কমিশন গঠন ও বাস্তবায়ন।

৯৫. শিল্প-শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো প্রবর্তন।

৯৬. ঢাকায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট শ্রমজীবী হাসপাতাল নির্মাণ।

৯৭. শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ২৭০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫৬০/- টাকায় নির্ধারণ।

৯৮. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরিবারের জন্য ঢাকায় বনানী আবাসিক এলাকায় বাড়ি বরাদ্দ। বাড়িটিকে ভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ বিল এবং পয়ঃপ্রণালী ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের আওতামুক্ত রাখা হয়।

৯৯. মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রফিকের মায়ের জন্য একটি আবাসিক বাড়ি নির্মাণের জন্য ১ লাখ টাকা প্রদান।

১০০. মূল নকশার ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পরিপূর্ণ অবয়ব দান।

১০১. কবি আহসান হাবীবের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বনানী গোরস্থানের জমির মূল্য মওকুফ।

www.pathagar.com

১০২. সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল ১৯৮৭' পাস।
১০৩. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন।
১০৪. ঢাকা জাদুঘরকে জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তর।
১০৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবিস্মরণীয় স্মৃতি সঞ্জীবিত করে রাখা এবং সামগ্রিকভাবে নজরুল চর্চার উদ্দেশ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।
১০৬. জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের প্রথা প্রবর্তন।
১০৭. ভাষা আন্দোলনের মহান শহীদ শফিকুর রহমানের স্ত্রী এবং শহীদ রফিকের মাকে রাষ্ট্রপতির তহবিল থেকে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা ভাতা প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত।
১০৮. মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ।
১০৯. দুস্থ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী এবং তাদের পরিবারের দুস্থ সদস্যদের মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদান।
১১০. রেডিও-টেলিভিশনে গায়ক-গায়িকাদের পরিবেশিত গান পুনঃপ্রচারের ক্ষেত্রে রয়্যালটি প্রদানের সিদ্ধান্ত।
১১১. শেরেবাংলা নগরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা।
১১২. চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসকে জিয়া জাদুঘর ও পাঠাগারে রূপান্তর।
১১৩. শুধুমাত্র বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলককরণ।
১১৪. ইংরেজিতে রাজধানী 'Dacca'-এর পরিবর্তে ধ্বনিগতভাবে বাংলা উচ্চারণের কাছাকাছি হওয়ায় উক্ত বানানটি 'Dhaka'-য় পরিবর্তন।
১১৫. ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে পার্ক নির্মাণ।
১১৬. সংসদ সদস্যদের জন্য শুল্কমুক্ত গাড়ি প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন।
১১৭. পুরাতন সংসদ ভবনকে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রূপান্তর।
১১৮. জাতীয় তিন নেতার মাজারের ওপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ।
১১৯. দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ অনেক মন্দিরের সংস্কার সাধন।
১২০. হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।
১২১. বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।
১২২. চট্টগ্রাম পৌরসভাকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে রূপান্তর।
১২৩. সারা দেশের পৌরসভাসমূহের আওতা সম্প্রসারণ।
১২৪. আয়কর রিটার্ন ও হিসাব পদ্ধতি সহজতরকরণ।
১২৫. স্বল্প আয়ের লোকের কর হ্রাস।
১২৬. সিলেট শহরে গ্যাস সরবরাহ।
১২৭. ঢাকার তোপখানা রোডের সম্প্রসারণ।
১২৮. নগর ভবন ও পুলিশ সদর দফতর নির্মাণ।

www.pathagar.com

১২৯. বনানী গোরস্থান সম্প্রসারণ।
১৩০. পান্থপথ সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
১৩১. রোকেয়া সরণি সড়ক নির্মাণ।
১৩২. জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার (এরশাদ প্যারেড স্কোয়ার) স্থাপন।
১৩৩. জাতিসংঘের শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণের সূচনা।
১৩৪. নির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি। একজন রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান।
১৩৫. International Institute of Environment Studies and Disaster Management প্রতিষ্ঠা।
১৩৬. জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ পরিষদ প্রতিষ্ঠা।
১৩৭. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর প্রতিষ্ঠা।
১৩৮. মুসলমানদের জন্য মদ্যপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা।
১৩৯. মাদকদ্রব্য রাখার অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবনের বিধান প্রবর্তন।
১৪০. অ্যাসিড নিক্ষেপের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রবর্তন।
১৪১. অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন জারি।
১৪২. ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিষিদ্ধকরণ আইন জারি।
১৪৩. সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণ।
১৪৪. পাঠ্যপুস্তকে বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনী অন্তর্ভুক্তকরণ।
১৪৫. প্রতিদিন দু'বার টেলিভিশনে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদের আগে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশস্তিমূলক নেপথ্য সঙ্গীতসহ জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রদর্শন।
১৪৬. ৬৪টি জেলা হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের জন্য মাত্র ১০১ টাকা প্রতীক মূল্যে পাঁচ কাঠা করে জমি বরাদ্দ দান।
১৪৭. মাত্র ১ টাকা প্রতীক মূল্যে ২২টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মালিকানায় হস্তান্তর।
১৪৮. ১৫ খণ্ডে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশ।
১৪৯. মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরির বয়স ৩০ থেকে ৩২ বছরে বৃদ্ধি এবং চাকরি ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ কোটা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৫০. ঢাকার মিরপুরে দ্বিতীয় জাতীয় স্টেডিয়াম নির্মাণ।
১৫১. মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ।
১৫২. ২২টি সাবেক জেলা সদরে স্টেডিয়াম নির্মাণ।
১৫৩. জাতীয় স্টেডিয়াম চত্বরে অবস্থিত ক্লাবসমূহের স্থানান্তর।
১৫৪. দেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা।
১৫৫. ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা।

www.pathagar.com

১৫৬. শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা।
১৫৭. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও অফিসসমূহে বেলা ১.১৫ মিনিট থেকে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত পনেরো মিনিট জোহর নামাজ আদায়ের জন্য বিরতি প্রদান।
১৫৮. জাতীয় ঈদগাহ্ প্রতিষ্ঠা।
১৫৯. ঢাকায় স্থায়ী হাজী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা।
১৬০. মসজিদের ওপর আরোপিত কর মওকুফ।
১৬১. বায়তুল মোকাররম মসজিদের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ।
১৬২. জাকাত বোর্ড ও জাকাত তহবিল গঠন।
১৬৩. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।
১৬৪. ঢাকায় বন্যা নিরোধ বাঁধ নির্মাণ।
১৬৫. উড়িরচরে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি স্থায়ী পরিবারকে ৬ বিঘা করে জমি প্রদান।
১৬৬. প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ।
১৬৭. বিমানবন্দর রেলস্টেশন স্থাপন।
১৬৮. পল্লী এলাকায় দুস্থ মানুষের জন্য ২৫% কম মূল্যে পল্লী রেশনিং-এর আওতায় খাদ্য বিতরণ।
১৬৯. রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকাসহ সকল প্রচার মাধ্যমে বিড়ি-সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ।
১৭০. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের আধুনিকীকরণ।
১৭১. রাজধানীতে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের আবাসন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ভর্তুকিযুক্ত প্লট প্রদান।
১৭২. আমার শাসনামলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে। ১৯৮২ সালে আমি যখন ক্ষমতা গ্রহন করি তখন বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো ৮৫৭ মেগাওয়াট। আর যখন ক্ষমতা ছেড়ে দেই তখন দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ২৮৫২ মেগাওয়াট।

আমি ক্ষমতার থাকাকালে দেশ ও দশের জন্য যা করেছি– তার কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরেছি। আমি এখনো রাজনীতিতে আছি। আল্লাহর যদি ইচ্ছা থাকে– জীবনের বাকি দিনগুলো দেশ ও জাতির সেবায় রাজনীতির সাথেই সম্পৃক্ত থাকবো। আমি সংস্কার ও কর্মসূচীভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। জনগণের সেবায় এবং দেশের কল্যাণে আমি যা ভাবি বা যা করতে চাই- তা সুস্পষ্টভাবে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপনও করি। আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, আগামীতে ক্ষমতায় যাবার প্রত্যাশাও করি। কারণ আমাদের মতো দেশে ক্ষমতার বাইরে থেকে দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণের কাজ করা খুবই কঠিন এবং সম্ভবও নয়। উদাহরণ হিসেবে দেখাতে চাই যে, উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশে সত্যিকার অর্থে আমূল পরিবর্তন এসেছে। দেশের আশি ভাগ মানুষ উন্নয়ন কাকে বলে তা বুঝতে শিখেছে– উপজেলা ব্যবস্থা কার্যকর হবার ফলে।

www.pathagar.com

এটা আমি বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলাম– কারণ তখন ক্ষমতা আমার হাতে ছিলো। ক্ষমতার বাইরে থেকে হাজার বার বুঝিয়েও অন্য কোনো ক্ষমতাসীনদের দিয়ে কখনোই এটা করাতে পারতাম না। আমি মনে করি উপজেলা ব্যবস্থার চেয়েও আরো একটি কার্যকর ও দেশের জন্য সময়োপযোগী সংস্কার কর্মসূচি হচ্ছে প্রাদেশিক ব্যবস্থা। আমি এই প্রাদেশিক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছি। দুইটি সেমিনারের মাধ্যমে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের অভিমত গ্রহণ করেছি। তারা এক বাক্যে বলেছেন– প্রাদেশিক ব্যবস্থা দেশের জন্য একটি অতিউত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করতে হলে যারা ক্ষমতায় থাকেন– তাদের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা এই প্রস্তাবনার বিপক্ষেও বলছেন না– আবার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগও নিচ্ছেন না। সুতরাং এটা বাস্তবায়ন করতে গেলে ক্ষমতায় যাবার প্রয়োজন আছে। একইভাবে আমি নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারেরও একটা ফর্মুলা দিয়েছি। বিশ্বের যে সব গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পদ্ধতি আছে– তার মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের নির্বাচন পদ্ধতির আলোকে আমিও নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছি। আমি এটাও বিশ্বাস করি দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ এবং অস্ত্র-অর্থ ও সন্ত্রাসীদের প্রভাবমুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমার প্রস্তাবিত নির্বাচন পদ্ধতির আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু আমি ক্ষমতার বাইরে থেকে আমার প্রস্তাবনার যতই যুক্তি থাকুক না কেনো তা সরকারকে শোনাতে বা মানাতে পারছি না।

বর্তমান দুনিয়ায় গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয় কেন? কারণ এখানে ক্ষমতাসীনরা তার নিজের ইচ্ছায় সব কিছু করতে পারেন না। জনগণের কাছে তাদের কৈফিয়ত দিতে হয়। যুক্তিপূর্ণ অভিমত, কর্মসূচি বা দাবি মেনে নিতে হয়। কিন্তু এখানে এ সব কিছুই অনুপস্থিত। স্পষ্টই বলা হয়– "জনগণ ৫ বছরের জন্য আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। এই সময় আমাদের খুশি মতো দেশ চালাবো।" গণতন্ত্রের নামে জনগণের কাঁধে বন্দুক রেখে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বহুমাত্রায় স্বৈরশাসন চালিয়ে যায়। সে কারণেই কালিমালিপ্ত হয় গণতন্ত্র। যদি সুযোগ পাই তাহলে এই ঝলসে যাওয়া গণতন্ত্রকে আবার ঝকঝকে করার চেষ্টা করবো। গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষেরও কল্যাণ সাধন করতে হবে। সে কারণে বিগত দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশে বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্যে আমি প্রাথমিকভাবে ষোল দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। গত পয়লা মার্চের মহাসমাবেশে আমি এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। যা আমি করতে পারবো– এবং যা করা সম্ভব সে রকম কর্মসূচিই আমি দিয়েছি। হয়তো সময়ের দাবিতে আরো কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আপাতত যে কর্মসূচি দিয়েছি তার মধ্যে আছে :

০১. উপজেলা আদালত ও পারিবারিক আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা চালু করতে চাই। স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করে এবং নির্বাচিত

www.pathagar.com

উপজেলা চেয়ারম্যানদের কাছে উপজেলার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। যদি সুযোগ পাই তাহলে এক বছরের মধ্যে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবো।

০২. প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন ব্যতীত এই সমস্যাসংকুল দেশে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনা করা বা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যদিও এটা দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটা আমূল সংস্কারের বিষয়– তথাপিও আমি মনে করি পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

০৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেয়া হবে। গত পনের বছরে দুইটি দল প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দিতে পারেনি। আমি সুযোগ পেলে এক বছর সময়ের মধ্যে এটা নিশ্চিত করবো।

০৪. নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে চাই। সন্ত্রাস, অস্ত্র ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে হয়তো সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সময় লাগবে।

০৫. ধর্মীয় মূল্যবোধকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে চাই। মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল মওকুফ করে দেবো। জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে প্রথমেই এ ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হবে। এবং এক বছরের মধ্যে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে।

০৬. কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে সার, ডিজেল, কীটনাশক সরবরাহ করতে চাই এবং কৃষি উপকরণের কর শুল্ক মওকুফ করা হবে। কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো সার্টিফিকেট মামলা থাকবে না। সহজ শর্তে কৃষিঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

০৭. দেশের পাট শিল্পের গৌরব ফিরিয়ে আনতে আধুনিকভাবে আদমজীর মতো জুট মিল প্রতিষ্ঠাসহ বন্ধ শিল্প কারখানা চালু করা হবে। প্রত্যেক উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তোলাসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা হবে। আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশ পাটের দেশ হলেও বিদেশী সংস্থার পরামর্শে এখানে পাট শিল্পকারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু যাদের পরামর্শে পাটকল বন্ধ হয়– তাদের অর্থায়নেই আবার প্রতিবেশী দেশে পাটকল গড়ে উঠে। আমি দেশের পাট সম্পদকে আবার স্বর্ণসূত্রে পরিণত করবো ইনশাল্লাহ।

০৮. সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দমনে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে। সন্ত্রাসসহ অপরাপর অপরাধ দমন করা কঠিন কোনো কাজ নয়– এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছাই বড় কথা। আমি ঘোষণা করেছি– ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিন মাসের মধ্যে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি সমূলে নির্মূল করবো।

০৯. উত্তরবঙ্গসহ দেশের সর্বত্র পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সারা দেশে সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

www.pathagar.com

১০. গুচ্ছগ্রাম, পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। ক্ষমতায় থাকাকালে যে গুচ্ছগ্রামগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলাম– সেগুলো আদর্শ গ্রামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু গত ১৫ বছরে অভাবের তাড়নায় কিংবা নদী ভাঙনে লাখো লাখো মানুষ ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে। ফলে ঢাকা শহরে বাড়ছে ভাসমান মানুষের ভিড়। তাদের আমি গুচ্ছগ্রামে একটা ঠিকানা দিতে চাই।

১১. পল্লী রেশনিং চালু করা হবে। যদি সুযোগ পাই– তাহলে এক বছরের মধ্যে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের কাছে রেশনিং ব্যবস্থায় চাল-ডাল-তেল-চিনি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো। যাতে গ্রামের মানুষ নিয়মিতভাবে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে চাই।

১২. উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মঙ্গা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া হবে। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে মঙ্গার আগ্রাসন। এই অঞ্চলের মানুষ বছরের তিন মাস কাজের সুযোগ পায়– বাকি নয় মাস বেকার থাকে। ফলে সেখানে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষাবস্থা। স্থানীয়ভাবে সেটাকেই বলে মঙ্গা। এই মঙ্গা দূর করতে মানুষের কাজের ব্যবস্থা করার কোনো বিকল্প নেই। সে কারণেই এখানে শিল্প স্থাপন করতে হবে।

১৩. বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে চাই। সরকারি কর্মচারীদের সর্বশেষ মূল বেতনের সমান পেনশনের ব্যবস্থা করতে চাই। এটা ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধেই বাস্তবায়ন করতে চাই।

১৪. বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ৯০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগে উন্নীত করতে চাই। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে শিক্ষক সমাজকে বঞ্চিত করার কোনো অবকাশ নেই। তাই যদি সুযোগ পাই এক বছরের মধ্যে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করবো।

১৫. সুলভ মূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন সরকারি শিক্ষকদের সমতুল্য করতে চাই। এই কর্মসূচীও এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

আমার মধ্যে একটি সুপ্ত বাসনা কাজ করে। তা হলো আলেম ওলামায়েদের দাবি অনুসারে দেশে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। যদি সুযোগ পাই– তাহলে এই ইচ্ছা বাস্তবায়নে আমি একান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

১৬. স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে। যতই নারী অধিকারের কথা বলা হোক না কেনো, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক এই নারী সমাজ এখনো অধিকার বঞ্চিত রয়েছে। তাদের সচেতন করে তুলতে হলে এবং নারীদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হলে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার

www.pathagar.com

দিতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমি সুযোগ পেলে এক বছরের মধ্যে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবো।

এসব কর্মসূচি নিয়েই আমার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে চাই। লক্ষ্য যদি থাকে মহৎ আল্লাহ গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন নিশ্চয়– সে বিশ্বাস আমার আছে।

www.pathagar.com

জাতীয় পার্টি : একটি সমালোচনা এবং আত্মবিশ্লেষণ

গত অক্টোবর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে আমি লন্ডনে ছিলাম। ফলে দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর-নিবন্ধ-প্রবন্ধ বা রাজনৈতিক কলামগুলো পড়তে পারিনি। গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো সম্পর্কে জেনে নিয়েছি মাত্র। দেশে ফিরে শুনলাম ২১ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট হারুনুর রশীদ আমাকে নিয়ে একটা নিবন্ধ লিখেছেন। নিজের সম্পর্কে প্রকাশিত লেখা পড়ে দেখার আগ্রহ স্বভাবত সকলেরই থাকে। তাই ইনকিলাবের ওই দিনের সংখ্যাটি সংগ্রহ করলাম এবং গভীর মনোযোগের সাথে লেখাটি পড়লাম। 'নিয়তির বরপুত্র এরশাদ : সংশয় ও সম্ভাবনা'– শিরোনামের এই নিবন্ধে হারুনুর রশীদ আমার বেশ সমালোচনা করেছেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন। লেখাটি আমি একাগ্রতার সাথে উপভোগ করেছি এবং এক কথায় বলতে পারি খুবই ভালো লেগেছে। কারণ এতোদিনে আমি একটি গঠনমূলক সমালোচনার সম্মুখীন হলাম। বলতে পারি এটি একটি নির্মল সমালোচনা। আমার রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভবিষ্যতে কী করণীয় থাকতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে উল্লিখিত নিবন্ধে। আমি এখন সার্বক্ষণিকভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত এবং একটি রাজনৈতিক দলেরও প্রধান। সে হিসেবে দাবি করতে পারি, আমি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সুতরাং আমার পক্ষে-বিপক্ষে যদি কোনো আলোচনা থাকে, তা রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এতোদিন পত্র-পত্রিকায় যতো সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছি তার সিংহভাগই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। সত্যি বলতে কী– কলামিস্ট হারুনুর রশীদের এই নিবন্ধটি একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক সমালোচনা বলে আমার মনে হলো। তাই তার সমালোচনার প্রতি সম্মান রেখে আমিও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। এটা ঠিক আত্মপক্ষ সমর্থন নয়– কিছুটা পর্যালোচনার মধ্যে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা মাত্র।

কলামিস্ট শুরুতেই বলেছেন– আমি তাকে মাঝে মাঝে ফোন করি, এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তাঁর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মহানুভবতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। হারুনুর রশীদের লেখা আমি গভীর আগ্রহের সাথে পাঠ করি। তার লেখায় ধারালো যুক্তি থাকে, শব্দের বাঁধন ভালো লাগে। সেখানে নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

দৃষ্টি থাকে, ন্যায়-নীতি বোধের সমাহার থাকে। তাই এই লেখককে ভালো লাগে। তাঁকে ফোন করে নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ করে আত্মসুখ অনুভব করি। আলোচ্য লেখার শিরোনামটিতে আমাকে নিয়তির বরপুত্র বলা হয়েছে। 'বরপুত্র' অনেক বড় শব্দ। আমি তা কোনো ক্ষেত্রে হতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে এটা সত্য– নিয়তিই আমাকে টেনে এনেছে বর্তমান পর্যায়ে। কর্মজীবনে একজন সৈনিক হিসেবে আবির্ভূত হওয়া বা সেখানে সাফল্য অর্জন করা আমার নিজ প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু তারপর রাষ্ট্রনায়কের জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন বরণ করা নিয়তির বিধানেরই ফল। যা আমি গ্রহণ করতে চাইনি– তা আমার ওপর আরোপিত হয়েছে বা পরিবেশ পরিস্থিতি আমাকে সেখানে নিয়ে গেছে। নিয়তির সেই বিধানে যদি ইতিবাচক দিক থাকে এবং সেখানে যদি অভূতপূর্ব সাফল্য আসে, তাহলে হয়তো আমি বিজ্ঞ মহলের বিবেচনায় 'বরপুত্র' হতে পেরেছি। সেই নিয়তির নির্দেশিত যাত্রায় কতোটুকু সংশয় বা সম্ভাবনা আছে– তাও আমি নিয়তির হাতে ছেড়ে দিতে চাই। নিয়তি– সে তো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছারই ফল মাত্র। আমি আল্লাহরই নির্দেশিত পথে চলতে চাই। ফল দেয়ার মালিক যিনি, তিনিই দেবেন– এই বিশ্বাসই আমার পথ ও পাথেয়।

হারুনুর রশীদের আলোচনার মূল কথা হচ্ছে– আমি আমার দলকে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করতে পারিনি। অর্থাৎ আমার দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মতো সমান্তরাল হতে পারেনি। তিনি লিখেছেন যে, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমানের চেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় ছিলাম। এটাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আমার শাসনামলেই দেশে সর্বাধিক উন্নয়ন হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি আমার দলকে কেনো আওয়ামী লীগ বা বিএনপির সমকক্ষ করতে পারলাম না– সেটাই তাঁর প্রশ্ন। রশীদ সাহেবের এই বক্তব্যের সাথে আমি কোনোভাবে দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তা যথার্থ। তবে দল গঠনে আমার ব্যর্থতার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, সে ব্যাপারে আমার কিছু দ্বিমত আছে। আমি সে দ্বিমত নিয়েও আলোচনায় যেতে চাই না। যে কারণে আমি ব্যর্থ হয়েছি– আমার দিক থেকে তার কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। আমিও স্বীকার করি– সাংগঠনিকভাবে আমার পার্টি যতোটা মজবুত হওয়া উচিত ছিলো তা হয়নি। কেনো এমন হলো– সে প্রশ্নের সম্মুখীন আমি বহুবার হয়েছি। নিজেও এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি এবং নিজেকে নিজে পর্যালোচনাও করেছি। এখানে বলতে চাই সেই আত্মসমালোচনার কথা।

আমি আগেই বলেছি– নিয়তির নির্দেশিত পথে চলতে গিয়েই আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং নিজেকে রাজনীতির সাথে জড়াতে হয়েছে। আমি বারবার বলেছি এবং এখনও বলছি যে, রাষ্ট্রক্ষমতা আমি চাইনি– এটা আমার ওপর আরোপিত হয়েছে। রাজনীতিতে নামবো– এ কথাও কখনো ভাবিনি। এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েও রাজনীতির কথা ভাবিনি। আমাকে

www.pathagar.com

যখন ক্ষমতা গ্রহণ করতে হলো, তখন অর্পিত দায়িত্ব আমি সুচারুভাবে পালনের চেষ্টা করেছি। কোন পরিস্থিতিতে এবং কোন পরিবেশে আমি দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলাম– সে কথা হয়তো দেশের জনগণ এখনো ভুলে যায়নি। বিশৃঙ্খল দেশে আমি সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলাম। আমি গর্বের সাথে বলতে পারি– সেখানে সফল হয়েছি। তখনকার বিপর্যস্ত দেশে একটা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে আমি আমার নিজ কর্মস্থলে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। আমি ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেছি এবং দেশে সুষ্ঠু-স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে ১৯৮৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছিলাম। তখন আমার কোনো রাজনৈতিক দল ছিলো না। নির্বাচিত সরকারের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবার ইচ্ছা আমার ছিলো। ১৯৮৪ সালে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণেরও আমার কোনো সুযোগ ছিলো না। আজ আমি প্রশ্ন করতে চাই– কোন দূরদর্শিতা দেখিয়ে সেদিন দেশের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো না? ১৯৮৪ সালে যদি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো, তাহলে তো আমাকে ৯ বছর ক্ষমতায় থাকতে হয় না। আমার প্রতি যদি সুবিচার করা হয়, তাহলে তো বুঝতে হবে– আমি ক্ষমতার লোভী ছিলাম না। বঙ্গবন্ধু বাকশাল কায়েম করেছিলেন নিজে আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে দল গঠন করে নিজে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁর নবগঠিত দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কিন্তু আমি ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজে দল গঠন না করে ২ বছরের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে সরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ক্ষমতা থেকে সরতে দেয়া হয়নি। কারণ নির্বাচন ছাড়া তো ক্ষমতার রদবদল সম্ভব ছিলো না। তাই নিয়তির আঁকা ছকে পা ফেলতে গিয়েই আমাকে রাজনীতিতে নামতে হলো। এই রাজনীতিতে জড়িত হবার পেছনেও রয়েছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান ভূমিকা। কারণ '৮৪ সালে সকল দল নির্বাচনে এলে তো আমাকে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন হয় না। এখন আসা যাক আমার গঠিত রাজনৈতিক দল কেনো বিএনপি বা আওয়ামী লীগের সমপর্যায়ে যেতে পারলো না সে প্রসঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে– দেশের প্রধান দু'টি দল কেনো সাংগঠনিকভাবে সফল হলো সে কথা। বিশদভাবে তা বলতে হলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবুও আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলি। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। কারণ বৃটিশ শাসনাধীন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এই দুই ভূখণ্ড এক পতাকার তলে অবস্থান করেছে। তারপর সঙ্গত এবং অনিবার্য কারণে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তার আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে হয়নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সে

www.pathagar.com

আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম লীগ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বা লিয়াকত আলীর মতো নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দান করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তানে সেই মুসলিম লীগ বেশি দিন দাপটের সাথে টিকতে পারেনি। এতো বড় ঐতিহ্যবাহী একটি দল ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং কালে তা আওয়ামী লীগে পরিণত হয়েছে। অনেক সময়ের পথ পেরিয়ে এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে সেই দলটি এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এটি বাংলাদেশের প্রধান দুই দলের মধ্যে অন্যতম একটি। এই আওয়ামী লীগেও ভাঙন কম হয়নি। একাধিকবার দলটি ব্র্যাকেটবন্দি হয়েছে। দলীয় কোন্দলের কারণে এ দলেরও সাংগঠনিক দুর্বলতা কম নেই। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দলীয়ভাবে তাদের অবস্থান তো সুদৃঢ় আছেই। তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হবে যে– এতোদিনের একটি পুরাতন দল হিসেবে একুশ বছর পর কোনোমতে ক্ষমতায় এসে আবার যেভাবে ক্ষমতা হারিয়েছে– তাও অদূরদর্শিতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার ফল।

এখানে আওয়ামী লীগের সাথে আমার দলের কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন আমার সরকারের বিরুদ্ধে সকল দল মিলিতভাবে আন্দোলন করেছিলো। আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে জাতীয় পার্টির প্রতি তৎকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এক ধরনের দলীয় দৃষ্টিকোণ নিয়ে বৈরী আচরণ করেছে। কোনো ধরনের নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়নি জাতীয় পার্টির প্রতি। আমাকেসহ দলের প্রায় সব সিনিয়র নেতাকে জেলে রাখা হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়েছে। পালিয়ে বা আত্মগোপন করে জাতীয় পার্টির নেতাদের নির্বাচন করতে হয়েছে। আমরা রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে পারিনি। দলীয় প্রার্থীরা অনেক জায়গায় প্রচারেও নামতে পারেননি। তা সত্ত্বেও আমরা সে নির্বাচনে ৩৫টি আসনে জয়লাভ করেছি। আমি নিজে জেলে থেকে নির্বাচন করে ৫টি আসনে জয়লাভ করেছি। অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার আগে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্বাচনের সময় সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ৬২টি আসনে জয়লাভ করেছে। আমরা যদি '৯১-এর নির্বাচনে সব দলের মতো সুযোগ-সুবিধা পেতাম এবং আমি মুক্ত অবস্থায় নির্বাচন করতে পারতাম, গণতন্ত্রের নিয়ম-নীতি যদি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতো– তাহলে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতার ইতিহাস এখন অন্যভাবে লিখতে হতো। ফলে জাতীয় পার্টি এবং পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন নেমে এসেছিলো তাতে তারা সংগঠিত হতে পারেনি। ভয়-ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করেছে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কখনো এতেটুকু ম্লান হয়ে যায়নি– যা সাংগঠনিক ভিত মজবুত থাকার একটি অন্যতম শর্ত। আমার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়েই বিএনপি সরকার গঠন করে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার

www.pathagar.com

পরিপন্থী নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় ফিরে আসতে সংবিধান সংশোধন করেছে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন তখন দেশে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করেছে। তিনি সেই শূন্যতা পূরণ করতে পেরেছিলেন বলেই তার প্রতিষ্ঠিত দলটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জিয়ার শাসনামলের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাকশাল ব্যবস্থা কায়েম করেন, তখন গণতন্ত্রমনা মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই সাথে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের নেশা চাপা অবস্থায় ছিলো। '৭০-এর নির্বাচনে জামায়াত ছিলো আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং তারা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করে ৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই জামায়াতসহ তাদের সমমনা দলগুলো পাক বাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতার পর তারা বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমায় রক্ষা পেয়ে গেলেও তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকে। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর আওয়ামী লীগ ও বাকশালবিরোধী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার বিরোধিতাকারী সকল শক্তি গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। সেই সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে একমত নয়, এমন একটি বৃহৎ গোষ্ঠীও সংগঠিত হয়ে ওঠে। অপরদিকে রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার, আওয়ামী সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ আওয়ামী লীগের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। রাজনীতির এই সংকটজনক মুহূর্তে জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেন, তখন সেখানে প্রচণ্ড ভিড় জমে যায়। এখানে নীতি-আদর্শের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায় আওয়ামী লীগের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব। আওয়ামী লীগের বিপক্ষে বিএনপি হয়ে যায় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক মঞ্চ। জিয়াউর রহমানের সুবাদে জামায়াত রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। নির্বাচনে জামায়াতের মতো দলগুলোর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন জেনারেল জিয়া। তখন সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিএনপি মজবুত হতে না পারলেও জনপ্রিয়তা তুঙ্গে চলে যায়। জিয়াউর রহমানও নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক ক্যাডার গড়ে তুলতে সক্ষম হন। যুবশক্তিকে তিনি এমনসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন যা সামগ্রিকভাবে যুব সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালেও তারা বিএনপির জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যায়। দল করার সুবাদে যুবকরা টোল-ইজারা-খাজনা তোলার নামে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত চাঁদাবাজি করার প্রবণতা চালু করে দেয়। সন্ত্রাসেরও জন্ম হতে থাকে। কলেজ-ভার্সিটিতে ছাত্রদের মধ্যে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে বিএনপির প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও সুবিধাভোগীরা এই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মটিকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে। জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় এবং

www.pathagar.com

তাঁর ব্যক্তিগত সততার কারণে বিএনপির প্রতি জনপ্রিয়তা অটুট থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী বিএনপি সরকার তাদের পূর্ববর্তী গৌরবগুলো আর ধরে রাখতে পারেনি। নেতিবাচক দিকগুলো মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, বিএনপিরই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশকে রক্ষা করার জন্য আমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

আমি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করলাম তখন রাজনীতি করা বা অধিক সময় ক্ষমতা ধরে রাখার ইচ্ছা যে আমার ছিলো না সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যাহোক, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ যখন হলো না, তখন রাজনৈতিক দল গঠন করা আমার জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে আমার প্রশাসনিক দক্ষতায় দেশে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসে এবং উন্নয়ন-সমৃদ্ধির ধারা প্রবর্তিত হবার ফলে নবীন-প্রবীণ এবং নিবেদিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার জন্য আমার কাছে তাগিদ আসতে থাকে। কারণ তখনও দেশবাসীর মধ্যে একটি দলের বাকশালী শাসনের ভীতি এবং অন্য একটি দলের ব্যর্থতার জন্য তাদের প্রতি অনীহার ভাবটি প্রবল ছিলো। তবে একথাও স্বীকার করি যে, ক্ষমতাসীন দলে সব সময় কিছু সুবিধাবাদীর অনুপ্রবেশ ঘটে। আমি একটি কথা সব সময় বিশ্বাস করেছি এবং এখনও করি, তা হলো– রাজনীতি রাজনীতিকদের হাতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। তাই আমি দেশের বিজ্ঞ রাজনীতিকদের নিয়েই দল গঠনের চেষ্টা করেছি। এবং আমার দলে যারা যোগদান করেছিলেন তারা সবাই এ দেশের নিবেদিত আর পোড়-খাওয়া রাজনীতিকই ছিলেন। দলের নেতৃত্বে যে একজন ইমেজসম্পন্ন লোক থাকা দরকার সে ইমেজ আমি ততোদিনে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কারণ একটি বিপর্যস্ত দেশকে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি যোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রিত আইন-শৃঙ্খলা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দিয়ে জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলাম। তাই আমার নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দলটি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয়েছিলো। তবে একথাও সত্য যে, ক্ষমতায় থেকে দল গঠন করলে তার মধ্যে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি বা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সাহস একটু কম থাকে। আমার নেতৃত্বে যে দলটি গড়ে উঠেছিলো সেখানে বিভিন্ন দল, মত ও আদর্শের রাজনৈতিক নেতাদের সমাবেশ ঘটেছিলো। তাদের মধ্যে সমন্বয় করতেই আমাকে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করেই চলতে হয়েছে। তবে আমি সফল ছিলাম যে, আমার দলে দেশের বিজ্ঞ রাজনীতিকদের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। এবং এখনো আমি গর্বের সাথে বলতে পারি– আমার মন্ত্রিসভা সবচেয়ে দক্ষ, যোগ্য ও কর্মঠ ছিলো। যাদের দিয়ে আমি দেশের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়– তারপরও কেনো আমি আমার দলকে দেশের বৃহত্তম দলের সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। তার কার্যকারণ তো অবশ্যই আছে। প্রধান কারণ– আমি দলের চেয়ে দেশকে ভালোবেসেছি বেশি। যদি দলকেই বেশি

www.pathagar.com

ভালোবাসতাম তাহলে হয়তো আমার দল আরো বেশি সময় ক্ষমতায় থাকতে পারতো এবং দলও বেশি সুসংগঠিত হতো। এ কথার ব্যাখ্যায় যেতে চাই।

দেশ পরিচালনার সময় আমি জনগণের উত্তম সেবা নিশ্চিত করতে চেয়েছি এবং দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ বড় করে দেখেছি। দলের লোকের স্বার্থের দিকে তাকাইনি। আমার সময়ে দেশে উন্নয়ন কাজ বেশি হয়েছে। ফলে প্রচুর টেন্ডার হয়েছে। কিন্তু 'টেন্ডারবাজি' শব্দের উদ্ভব হয়নি। আমি আমার দলের কর্মীদের যদি টেন্ডারবাজি কাজটার সাথে পরিচিত করাতাম তাহলে আমার জন্য অবশ্যই একটি বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ সৃষ্টি হতো। তারা আমার দলের জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করতো। আমি যুব কমপ্লেক্সের মতো ব্যবস্থা চালু করে যুবকদের মাস্তানি করা বা চাঁদাবাজি শিখিয়ে কিংবা তাদের সন্ত্রাসী বানিয়ে নিজের দলের ক্যাডারে পরিণত করতে চাইনি। এটাও আমার এক ধরনের সাংগঠনিক দুর্বলতা। আমি ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশের শিক্ষাঙ্গন আমার দলের ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইনি। আমি আমার দেশের ছাত্র সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছিলাম। যখনই দেখেছি ছাত্ররা রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনকে রণক্ষেত্রে পরিণত করছে, ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে রাজনীতির নামে সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে– তখনই নিজের ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করে সব দলের প্রতি তাদের ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। এটাও আমার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু আমি কি ন্যায় কাজ করেছি কিংবা দেশের ছাত্র সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছি, না রাজনৈতিক ভুল করেছি– তা বিবেচনা করতে হবে। হয়তো দু'টোই ঠিক। অনেকেই বলেন– আমি যদি আমার ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত না করতাম, তাহলে ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত ঢাকাকেন্দ্রিক আন্দোলন আমার দলের ছাত্ররাই মোকাবেলা করতে পারতো। এবং ওইসব ছাত্ররাই আমার দলের ক্যাডারে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু এখানেও আমি দলের চেয়ে দেশকে এবং দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখেছি। আর তাই দেশ উপকৃত হয়েছে– জনগণের মঙ্গল হয়েছে। কিন্তু আমার দল দুর্বল থেকে গেছে। কিন্তু তার জন্য আমি অনুতপ্ত নই। আমি দেশের উপকার করতে পেরেছি– সেটাই আমার আত্মতৃপ্তি।

সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য মন্ত্রিসভার প্রয়োজন হয়। তার জন্যও আমি সব সময় যোগ্য লোক বাছাই করেছি। কে আমার দলের নিবেদিত নেতা বা কর্মী– সে দিকে আমি খেয়াল করিনি। আমি দেখেছি কে দক্ষতার সাথে মন্ত্রণালয় চালাতে পারবেন। যিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তাকে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছে। এসব কারণে আমাকে স্বৈরাচারও বলা হয়। কিন্তু কোনো অযোগ্য লোকের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে তার ওপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভালো মানুষ আমি হতে চাইনি। এটাও হয়তো আমার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণের জন্য আমি সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছি। দলীয় লোকদের হাতে সে দায়িত্ব দিয়ে আমি তাদের কাছে

www.pathagar.com

ভালো হবার বা তাদের অনুগত রাখার কথা চিন্তা করিনি। আমি ভেবেছি– যারা সত্যিকারভাবে আমার দল করবে তারা দেশ ও জনগণের উত্তম সেবার কথাটাই বড় করে দেখবে। ফলে সুবিধা-সন্ধানীরা আমার দল থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা আদায় করতে পারেনি। তাই যখন সুযোগ পেয়েছে তখন অন্য ক্ষমতাসীন দলে ভিড়ে গেছে। বর্তমান সরকারি দলেই প্রায় অর্ধশত মন্ত্রী-এমপি আছেন যারা এক সময় আমার দলেরও মন্ত্রী-এমপি ছিলেন। কিন্তু তারা আট বছর আমার দলে থেকে ব্যক্তিগতভাবে যা অর্জন করতে পারেননি অথচ বারো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাজ করতে হয়েছে– তারা চার বছরে ঢের বেশি সম্পদ অর্জন করেছেন– বেশি আরাম-আয়েশ ভোগ করছেন। আমি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন ভোর ৬টার মধ্যে প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলো দেখে নিতাম। কোথাও কোনো সমস্যার কথা দেখলে ছ'টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে ফোন করে কারণ জানতে চাইতাম কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলতাম। এ ধরনের যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে কেউ যদি সুখে প্রাতঃনিদ্রা সম্পন্ন করতে পারেন– তাহলে কি তিনি আর আমার সাথে থাকতে চাইবেন!

যাহোক, এটাও বড় কথা নয়। আমি দেশবাসীর শান্তি এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার দলের নেতা-কর্মীরা তা চায়নি। কারণ আমার বিরুদ্ধে ঢাকাকেন্দ্রিক আন্দোলন হলেও সারাদেশ ছিলো স্বাভাবিক। সে পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া আমার দলের নেতা-কর্মীরা মেনে নিতে পারেননি। এখানেও আমি দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখেছি। যদিও আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ায় কার্যত দেশ ও জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাহোক, আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ায় আমার দলের নেতা-কর্মী এমনকি সমর্থকদের ওপরও অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন ও অত্যাচার চলেছে। ফলে তারা কেউ নিরাপদ অবস্থানে চলে গেছেন, আবার কেউ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। নেতারা নিরাপদে বা মুক্তভাবে নির্বাচন করতে পারেননি– কর্মীরা মাঠে নামতে পারেনি। দেশে যদি গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর না থাকে, তাহলে রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ তো সম্ভব নয়। আমার দল অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার হয়েছে বলেও সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি। এইটুকু গণতান্ত্রিক আচরণ যদি আমি উপভোগ করতে পারতাম যে, প্রথমত ক্ষমতা ছেড়ে দেবার পর নির্বাচনে সকল দলের মতো আমার দল সমান সুযোগ ভোগ করেছে, দ্বিতীয়ত নির্বাচনে বিজয়ী হবার পরও আমি সংসদে যেতে পেরেছি, তৃতীয়ত দলকে সুসংগঠিত করার সুযোগ পেয়েছি, চতুর্থত পরবর্তী নির্বাচনের আগেও মুক্তি পেয়ে রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে পেরেছি, পঞ্চমত আবার সরকারি রোষানলে পড়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষিত হইনি– তাহলে কি আমার সংগঠনের অবস্থা দুর্বল থাকতে পারতো?

এটাও সত্য যে, ক্ষমতাসীন অবস্থায় দল গঠন করেছি– সেখানে সুবিধাভোগীদের আগমন ঘটেছে। আবার সরকারি দল করার পরও আমার দলের

www.pathagar.com

নেতা-কর্মীরা বাড়তি সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। সুতরাং তারা ব্যক্তিস্বার্থের লোভে অন্যত্র চলে গেছে। সে সাথে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কাউকে দল থেকে বের করে দিলেও তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ইন্ধনে ও সহযোগিতায় জাতীয় পার্টি নামে একটি সাইনবোর্ড দাঁড় করিয়ে আমার দলের ভাঙন হিসেবে প্রচার করেছে। কাউকে বের করে দেয়ার পরই দেখা গেছে, মিডিয়াতে জাতীয় পার্টির ভাঙনের খবর। জাতীয় পার্টি থেকে বের করে দেয়ার পর যাদের কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব থাকে না, গণভিত্তির গন্ধও থাকে না– তাদের নামেও মিডিয়ায় জাতীয় পার্টির একটি ব্র্যাকেট বানানো হয়। রাজশাহীর একজন নেতাকে বহিষ্কার করার পর একটি পত্রিকায় দেখলাম তার নামে জাতীয় পার্টির বিরাট খবর। অবশেষে তিনি অন্য দলে যোগ দেয়ায় সে জাতীয় পার্টি আর দেখা যায়নি। অন্য দুই দলের ক্ষেত্রে সে রকম দেখা যায় না। যেমন– কামাল হোসেন বা বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দল করলেও সেটাকে আওয়ামী লীগের ভাঙন বলা হয় না। বদরুদ্দোজা চৌধুরী-মেজর মান্নান বিএনপি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল করলেও সেটাকে বিএনপিতে ভাঙন বলার সাহস থাকে না। কেনো সাহস পাওয়া যায় না– তা কাদের সিদ্দিকী বা মেজর মান্নান সাহেবরা টের পেয়েছেন।

যাহোক, এ আলোচনা আর বাড়াতে চাই না। সকল ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও জাতীয় পার্টি টিকে আছে এবং এই টিকে থাকার মধ্য দিয়ে পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থক। তাঁরা লোভ-লালসার হাতছানিতে সাড়া দেন না। জাতীয় পার্টির আদর্শের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। আজ জাতীয় পার্টিতে রয়েছেন পরীক্ষিত নেতা-কর্মী। মেদ-ভুঁড়িতে মোটাসোটা দেহ নয়, জাতীয় পার্টি এখন সুস্থ সবল দেহের একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দল। সাংগঠনিক বিশালত্বের দৃষ্টিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় পার্টি অন্য দুই বড় দলের সমকক্ষ না হলেও সারা দেশের লাখো লাখো ত্যাগী নেতা-কর্মীতে আমার দল সমৃদ্ধ হয়েছে। আমরা শুধু ক্ষমতায় যাবার জন্যই রাজনীতি করি না। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে। আমাদের আছে সংস্কার প্রস্তাব। আজ বা কালই ক্ষমতায় যেতে হবে– এমন কোনো কথা নেই। ক্ষমতায় যেতে পারলে কী করবো সেই কর্মসূচি নিয়েই আমরা অগ্রসর হতে চাই। জনগণ যদি তা গ্রহণ করে– তাহলেই আমাদের সাংগঠনিক ভিত আপনাতেই মজবুত হবে।

পরিশেষে কলামিস্ট হারুনুর রশীদ সাহেবকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাবো যে, তিনি হয়তো আমাকে আপন মনে করেই কিংবা জনগণের একজন আপনজন ভেবেই তার বিবেচনায় আমার সংগঠনের দুর্বল দিকটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনাও আমার বিবেচনায় থাকবে। সে সাথে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। অবশ্যই তার

www.pathagar.com

পরামর্শ আমি বিবেচনা করবো। আমার রাজনীতি নিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো আলোচনার আহ্বান রইলো।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পদ্ধতি এবং আমার কিছু প্রস্তাব

একজন সার্বক্ষণিক রাজনীতিক হিসেবে কখন যে সময়গুলো ব্যয় করে ফেলি নিজেও তা টের পাই না। অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিন্তু আমি নিয়মিত কোনো লেখক নই বলে সময়মতো অনেক কিছুই লিখতে পারি না। আজ আমরা স্বাধীনতার ৩৫টি বছর পাড়ি দিয়ে এলাম। আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরব ও বড় অর্জনের দিনটি হলো ১৬ ডিসেম্বর। অর্থাৎ বিজয়ের দিন। এই মহান দিনটিকে সামনে রেখে অনেক হিসাব-নিকাশের কথা মনে পড়ে। আমাদের সবকিছুতেই কোথায় যেনো কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। এমনকি চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মুহূর্তটিতেও। সেই মুহূর্তের আলোকচিত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে দেখতে না পাওয়ায় বিজয়ের আনন্দের মধ্যে একটু যেনো ধাক্কা লাগে। মনে হয় এমন যদি হতো যে, দু'টো চেয়ারের পাশে আরো একটি চেয়ার আছে সেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধা বসে আছেন- তাহলে মনটা কানায় কানায় পূর্ণ থাকতো। যা হোক, যা হয়নি তা নিয়ে ভেবে তো লাভ হবে না। যা পেয়েছি তা নিয়েই অনাদিকাল আমাদের তুষ্ট থাকতে হবে।

আজ এই আলোচনায় আমার বিষয় বিজয় দিবস নয়। বিজয় দিবসের আলোকে নিজেদের অর্জন নিয়ে যোগ-বিয়োগের কথা ভাবতে গিয়েই কিছু কথা মনে পড়ে গেলো। আমি বহুবার বলেছি– মহান ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যখন থাকে না তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমরা মূলত সেই ক্রান্তিকালের মধ্যে পড়ে আছি। উত্তরণের পথ বড় বন্ধুর। পদে পদে প্রতিবন্ধকতা। জানি না কবে প্রকৃত মুক্তির স্বাদ আমরা পাবো। আজ একটি বিজয় দিবসের প্রাক্কালে একজন রাজনীতিক হিসেবে নিজেদের প্রাপ্তির হিসাবটাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মূলত রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়ই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরে যদি খতিয়ান মিলিয়ে দেখি তাহলে সেই রাজনীতির দশা কত করুণ পর্যায়ে দেখতে পাবো! রাজনীতিকরা যেখানে

www.pathagar.com

আত্মত্যাগ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে মানুষের সামনে প্রতীয়মান হবেন– সেখানে তারা আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন! এক সময় ছিলো যখন একজন রাজনীতিক গর্ব করে বলতেন 'আমি রাজনীতি করি'। এখন অনেকে 'আমি কোনো রাজনীতি করি না' বলে গর্ব করেন। অথচ বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে রাজনীতিকশূন্য একটি দেশ কল্পনাও করা যায় না। কেনো আমাদের ক্ষেত্রে এমন হলো– এর জন্য দায়ী কারা? অবশ্য দায়ী আমরা নিজেরাই। এখনো দেশ ও জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করার মতো রাজনীতিক আছেন, এখনো সততা-ন্যায়নিষ্ঠা উদাহরণের মতো রাজনীতিক আছেন। কিন্তু রাজনীতিকের ক্ষতি করেছে রাজনীতিকরাই। আমাদের সংবিধানেই তো রাজনীতিকদের প্রতি অবিশ্বাস, অসততা, ন্যায়-নীতি-জ্ঞানহীনতার ধারা সংযোজিত করা হয়েছে। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কেমনভাবে কুঠারের আঘাত করেছি, তা কি ভেবে দেখেছি কখনো!

আমাদের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার বয়স প্রায় ১৪ বছর হয়ে গেছে। তাই এ নিয়ে এখন আর বিতর্কের তেমন কোনো অবকাশ নেই। তবে বলার এখনো অনেক কিছু আছে। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি ক্ষমতায় থাকেন তাহলে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না, কারচুপি হবে, সন্ত্রাস হবে, ভোট চুরি হবে– ইত্যাদি কারণে নির্বাচনের সময় রাজনীতিকদের ক্ষমতায় না রেখে নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচিত সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি এটাই উত্তম ব্যবস্থা হয়ে থাকে তা হলে কথাটা দাঁড়ালো কী। যারা নির্বাচন করার সময় নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না, তারা নীতিহীন। এরা ক্ষমতায় থাকলে ভোট চুরি বা ডাকাতি করে গণরায়কে উপেক্ষা করে ক্ষমতায় আসবেন। সুতরাং তারা তো ক্ষমতায় গিয়েই সাধু-ফেরেস্তা হয়ে যাবেন না। কোনো অসৎ তো ক্ষেত্রবিশেষে অসৎ নয়। যে অসৎ সবসময়ই সে অসৎ। সুতরাং যে রাজনীতিকদের প্রতি অবিশ্বাস থাকবে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে লাভ কি? নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি সততার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে, তাহলে তারা তো সততার সাথে দেশও চালাতে পারে। সুতরাং দেশ পরিচালনায় তারাই হতে পারে উত্তম। আমাদের রাজনীতিকরা নিজেদের ললাটে নিজেদের জন্যই এই অগৌরবের তিলকটা এঁকে রেখেছেন এবং তাকে দালিলিক মর্যাদা দিয়েছেন। তাই একটি বিজয় দিবসকে সামনে রেখে যখন নিজেদের অর্জনের হিসাবটা করি তখন এসব ঘাটতির কথা মনে ভেসে ওঠে।

তবে হ্যাঁ, সুষ্ঠু-সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ আমাদের বের করতে হবে। এ কথা ধ্রুব সত্য, নিরপেক্ষ নির্বাচন এ পর্যন্ত আমরা পাইনি। নিজেদের অমর্যাদার বিষয়টি উপেক্ষা করেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও এই ব্যবস্থা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যেতে পারেনি। বিতর্ক তো খুব সাধারণ কথা– আমি আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি,

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত তিনটি নির্বাচনের কোনোটাতেই নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারেনি। জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয় না বিধায় এই ব্যবস্থায় ইচ্ছামাফিক কাজ করার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা এবং নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েই আজ এখানে কিছু আলোচনা করতে চাই।

আমার শাসনামলে বিরোধী দলসমূহ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। সে আন্দোলনের ইস্যু ছিলো একটাই– আমাকে পদত্যাগ করতে হবে। দেশ পরিচালনায় কোনো ধরনের ব্যর্থতা ইস্যু নয়। সন্ত্রাস-দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা কিংবা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ– এসবও কোনো ইস্যু ছিলো না। ক্ষমতা ছাড়তে হবে– ব্যস, ইস্যু এই একটাই। বলা হলো আমাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্বাচন করতে হবে। আমি রাজি হলাম। কিন্তু কীভাবে? ইচ্ছা করলেই যেমন ক্ষমতা গ্রহণ করা যায় না– আবার ইচ্ছা করলেই ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া যায় না। এর জন্য কিছু পদ্ধতি আছে। আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন– কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবো– ইত্যাদি বিষয় ঠিক করে নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি ক্ষমতা ছাড়তে পারি, সে ক্ষেত্রে তখনকার সংবিধান অনুসারে যিনি উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তিনি অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। তখন একটি সংসদও ছিলো। মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে ওই সংসদ ভেঙে দিয়ে অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে পারতেন। এটা ছিলো সাংবিধানিক ব্যবস্থা। কিন্তু তা তো হতে পারবে না। কারণ তাহলে জাতীয় পার্টির রাজনীতিকরা ক্ষমতায় থাকেন। বিরোধী দল তা মানে না। সে জন্যই একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হলো বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। তিনি হলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমাদের আস্থা এবং শ্রদ্ধা অপরিসীম। সেই বিচারালয়ের প্রধানকে দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত করায় আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম। সৌভাগ্য যে, আমার শাসনামলে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে আমার দলের প্রতি অনুগত বিবেচনা করা হয়নি। আমার পরবর্তী শাসনামলে দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ করতে গেলেই আইনজীবীরা তাদের বিরুদ্ধে দলীয় আনুগত্যের অভিযোগ আনছেন। তারা কে কখন কোন দলে ছিলেন, কোন দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন ইত্যাদি ইতিহাস খোঁজা হচ্ছে। আইনজীবীরা কোনো কোনো বিচারপতিকে "মাই লর্ড" বলে সম্বোধন করবেন না বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, আমার সময়ে আদালত সম্পর্কে এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। বিরোধী দল আমার আমলের প্রধান বিচারপতিকেই নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে দেশে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করতে পেরেছেন। আমি সংবিধান সংরক্ষণ করেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছি। পূর্বেকার উপ-রাষ্ট্রপতির

www.pathagar.com

পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে শপথ পড়িয়েছি।

আগেই বলেছি– আমাদের সব ভালোর মধ্যেই একটু না একটু খাদ থেকে যায়। এই যে প্রধান বিচারপতিকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ করালাম সেখানেও একটা ত্রুটি থেকে গেলো। আইনের লোক হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনেরই তা সংশোধন করে নেয়া উচিত ছিলো। অথচ তিনি তা অসতর্কভাবে এড়িয়ে যাননি– খুবই সতেচনভাবে একটি অনৈতিক, অসাংবিধানিক কাজ করে গেলেন। এই কাজটি হলো, একই ব্যক্তি একটি শপথের আওতায় থেকে আবার রাষ্ট্রীয় শপথ গ্রহণ করেছেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক পদ। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি যখন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন– তখন তার অন্তত নৈতিক কর্তব্য ছিলো পূর্বের পদ থেকে পদত্যাগ করা। তাহলেই তার পূর্বের শপথের কার্যকারিতা থাকতো না। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে পরাভূত হয়েছে নৈতিকতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি। একজন মন্ত্রীর যখন দপ্তর বদল করা হয়– তখন তার নতুন করে শপথ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একজন প্রতিমন্ত্রীকে যখন মন্ত্রী করা হয় তখন তাকে মন্ত্রী হিসেবে নতুন করে শপথ নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিমন্ত্রীকে তার পদ থেকে অব্যাহতি, অপসারণ বা পদত্যাগ দেখানো হয়। তখন তার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথের কার্যকারিতা থাকে না। উদাহরণ হিসেবে আরো বলা যেতে পারে যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি ইচ্ছা করেন তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন– তাহলে তিনি ওই পদে বহাল থেকেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিতে পারেন না। অথচ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন এ ধরনের অনিয়মটি করেছেন। তার মনোনয়নকারীরা তাঁকে এই অসাংবিধানিক কাজটি করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে এই অবৈধ সুযোগটি গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি কেনো প্রধান বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ না করার পরও তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পড়ালাম। ওই সময় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আর একটি জটিলতা সৃষ্টি হতো! কারণ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন শর্ত দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন না এবং আবার তাঁকে ওই পদেই ফিরিয়ে আনতে হবে। ফলে তাঁর আবদারের প্রেক্ষিতে দেশের নিয়মনীতি সংবিধান– কোনো কিছুর দিকে ফিরে তাকানো হয়নি। ওই অনৈতিকতার বিরোধিতা করলে বলা হতো– আমি হয়তো ক্ষমতা আগলে রাখার জন্য এসব যুক্তি উপস্থাপন করছি। এভাবে অবৈধ অনৈতিক পন্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়েছে। অতঃপর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে বৈধতা দিতে সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করতে হয়েছে। এমনকি তার চাকরি রক্ষার জন্যও সংবিধানে হাত দিতে হয়েছে। সংবিধানে এসব বিষয়ে সংশোধনী আনা

www.pathagar.com

হলেও এক ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রীয় শপথের আওতায় থেকে আর একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের শপথ গ্রহণ করতে পারবেন– এমন কোনো বৈধতা দেয়া হয়নি। ফলে একটি অবৈধ কাজের দৃষ্টান্ত জীবন্তই থেকে গেছে।

এই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সম্পর্কে কথা আরো আছে। তাঁর নামের সামনে একটি 'বিচারপতি' পদবি থাকলেও অবিচারের প্রতীক হিসেবে তাঁকে ইতিহাসে স্থান নিতে হবে। তিনি কোন অঙ্গীকার নিয়ে এবং কী দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন– তা কি ভুলে গিয়েছিলেন? তাঁর দায়িত্ব ছিলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়া। যে রাজনৈতিক দলটি সদ্য ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে সেই দলের উপর দমন-পীড়ন চালানো এবং সেই দলের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা তো তাঁর দায়িত্ব ছিলো না। বরং যদি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া দলটির উপর কোনো আঘাত আসে– তা প্রতিহত করাই ছিলো তাঁর সরকারের একটি দায়িত্ব। আমাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করানো কিংবা আমার দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা বা হুলিয়া জারি করা তো বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের দায়িত্ব ছিলো না। আমার বা জাতীয় পার্টির সরকারের কোনো মন্ত্রীর যদি কোনো অপরাধ থাকতো তাহলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ছিলো নির্বাচিত সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেনো আমাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করলো? আমি তো ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাইনি। আমার অনেক মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হলো– কারো বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হলো। আমাদের কাউকে জেলে থেকে, কেউবা হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন অবস্থায় নির্বাচন করে জয়লাভ করে আসতে হয়েছে। আমরা রেডিও-টিভিতে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। তাহলে কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ থাকলো কীভাবে?

দেশের রাষ্ট্রপতি কোনো ব্যক্তিবিশেষের পদ নয়। এটি দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের। আমি শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এক ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পড়ালাম– সেটা বৈধ হয়েছে অথচ তাঁর আগে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করলাম, তার কার্যকারিতা থাকলো না। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাতিলকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে আমাকে গ্রেফতার করা হলো। যদি আইনগতভাবে তা করতে হতো– তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আমার বাতিল করা আইন পুনর্বহাল করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। সেই বাতিল আইনে আমার উপ-রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে, আমার যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারাও নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। আমার প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ আত্মগোপন অবস্থায় নির্বাচন করে জয়লাভ করেছেন। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছিলো? সেই ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তো এখন দেশের আইনমন্ত্রী। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দ্বিতীয় দফায় দেশের রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

থাকাকালে সেই আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আবার যোগাযোগমন্ত্রী হয়েছেন। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন রাষ্ট্রীয় পক্ষ হিসেবে আমাকে আটক করে আবার উনি ফিরে গেলেন বিচারকের আসনে। যে বাতিলকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইনে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো তার জন্য আমি যদি সুপ্রিমকোর্টে বিচার প্রার্থনা করতাম তাহলে কি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে সুবিচার পেতাম? আমার আটকাদেশ কি তিনি নিজে অবৈধ ঘোষণা করতে পারতেন? অবশ্য আদালত আমার আটকাদেশ অবৈধই ঘোষণা করেছে। তবে তখন সাহাবুদ্দীন প্রধান বিচারপতির পদে ছিলেন না। তাহলে আমি যে জেল-যন্ত্রণা ভোগ করলাম, আমার দলের লোকরা যে নির্যাতিত এবং নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো তার জন্য একজন কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানকে কি সারা জীবন অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না?

এসব যদিও পুরনো কথা, তবুও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্র চিত্রায়নের জন্য এসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। বিচারপতি হলেই তিনি দুধে ধোয়া তুলসী পাতা হবেন তা নয়। অন্তত সাহাবুদ্দীন সেটাই প্রমাণ করেছেন। আমাদের দেশে অনেক বিচারপতি ছিলেন বা আছেন যারা তাদের নিজ দক্ষতাগুণে, সততা ও নিষ্ঠায় বিচারালয়ের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের আদর্শ সাহাবুদ্দীন সাহেবরা ধরে রাখতে পারেননি। এই ব্যক্তি যে কলঙ্কিত কর্মকাণ্ড দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতায় ব্যবস্থাটি এখন বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। যারা এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন– তারাই এখন এই ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবি তুলেছেন। কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারই জাতীয় পার্টির প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করেনি।

সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এটি বৈধতা পেয়েছে একটি বিতর্কিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ইতিহাসে মাত্র একদিনের এবং একটিমাত্র আইন পাসের সংসদ ছিলো এটি। অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনে যে সংসদ গঠিত হয়েছিলো– সেই সংসদের পাস করা আইনে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই সরকারের কাঠামো সর্বদলীয়ভাবে প্রণীত হয়নি। অর্থাৎ কে হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান– তার রূপরেখাটি এককভাবে বিএনপি প্রণয়ন করেছে। সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হয়েছে মাত্র। কাঠামোটিকে অবশ্য সকল দল মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু এর মধ্যেও এখন দলীয় আনুগত্য খোঁজা হয়। ফরমুলায় মিলাতে বয়স বাড়ানো-কমানো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

যা হোক, বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনে যে শুধু জাতীয় পার্টির প্রতি বৈমাত্রেয় আচরণেই বিতর্কিত হয়েছে তা নয়, আওয়ামী লীগও এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থাৎ বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নির্বাচনেও জাতীয় পার্টির ভাগ্যে একই দশা ঘটলো। অর্থাৎ সব দল যেসব সুযোগ সুবিধা পেলো– আমরা তা পেলাম না। আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো জেলে বসেই নির্বাচন করতে হলো। দেশের জনগণ রেডিও-টিভিতে আমার নির্বাচনী ভাষণ শোনা থেকে বঞ্চিত হলো। টিভিতে ভাষণ প্রচারের সুযোগ লাভের জন্য জাতীয় পার্টিকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। হাইকোর্টের রায় আমাদের পক্ষে গেলো। অথচ সরকার পক্ষ থেকে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হলো। জানতে চাই, কেন করা হয়েছিলো? ওই সরকার কি জাতীয় পার্টির প্রতিপক্ষ ছিলো? সুপ্রিমকোর্ট সেই আপিলের ব্যাপারে নির্বাচনের ৪ দিন আগে সিদ্ধান্ত দিলো যে, আমি টিভিতে নির্বাচনী ভাষণ দিতে পারবো কিনা সে ব্যাপারে এক সপ্তাহ পরে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে যাবো না। কারণ বিষয়টি আদালত সম্পর্কিত। শুধু বলতে পারি, আমি সুবিচার পাইনি। নির্বাচনে আমার দলের যেটুকু মৌলিক অধিকার ছিলো– তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারেনি। তারপর নির্বাচন শেষে বিএনপি তো সরাসরি অভিযোগ করেছে যে, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অনিয়ম, ভোট কারচুপি, ফলাফল উল্টিয়ে দেয়া ইত্যাদি অভিযোগের কোনো অন্ত নেই।

সুতরাং যে কথা বলতে চাচ্ছি– তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই যে সে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে বা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যাবে তা আমরা আর আশা করতে পারি না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর প্রথম মেয়াদে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবির মুখে বলেছিলেন– পাগল আর শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়। এ কথা অনেক সমালোচিত হলেও মিথ্যা নয়। আমাদের মতো দেশ চালাতে পারে এমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ হবেন তা আশা করা যায় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে এতোটা আলোচনা করার কারণ হচ্ছে– আমি বলতে চাই এই ধরনের ব্যবস্থা আমাদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারেনি। অপরদিকে এই ব্যবস্থা রাজনীতিকদের জন্য চরম অবমাননাকর। তারপর এতে যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাও নয়। কেয়ারটেকার সরকারের যারা উপদেষ্টা হন তাদের মধ্যেও পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট ব্যক্তি থেকে যান। যেমন মরহুম ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ কখনোই নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনিও কিন্তু দুইবার উপদেষ্টা হয়েছেন।

আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিরোধী ছিলাম না। এই ব্যবস্থায় ৩টি নির্বাচন আমরা দেখলাম। নির্ভেজাল ফল আমরা পাইনি। গোড়ায় যেখানে গলদ ছিলো সেখানে পরবর্তীতে খুব ভাল ফল যে পাওয়া যাবে না সেটা পূর্বাহ্নেই আঁচ করেছিলাম। যখন দেখেছি আমাদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে– তখনই ভেবেছি এই নিরপেক্ষবেশীরা বেশিদিন স্বচ্ছন্দে টিকতে পারবে না। ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

আমরা বলেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিজ্ঞতা জাতীয় পার্টির জন্য অত্যন্ত তিক্ত। যারা এর উদ্ভাবক এখন তারাই পরিবর্তনের দাবি তুলছে। ওই অবস্থানে বিএনপি থাকলে তাদেরও একই আচরণ করতে হতো। আওয়ামী লীগ ভুল করেছিলো মানুষ চিনতে। তারা বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আসল চেহারা চিনতে পারেনি। চেনা তাদের উচিত ছিলো। যে ব্যক্তি একজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে যে কারো সাথেই বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে। এটা তাদের বোঝা উচিত ছিলো। এভাবে মানুষ চিনতে তারা আরো ভুল করেছে, এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে।

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত মজবুত করার একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যাতে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে, নির্বাচনের ফল যাতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তেমন নির্বাচন ছাড়া দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেও তা নিশ্চিত করা গেলো না। আবার এই ব্যবস্থা বাতিল করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে তার বিরুদ্ধে আরো প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। তাহলে কী করতে পারি আমরা। যা ঘটছে ঘটুক– তা-ই দেখতে থাকবো? গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে ভাটার টানেই তো আমরা হারিয়ে যাবো। তাই নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। দরকার পরিবর্তন। আর পরিবর্তনের জন্য দরকার সংস্কার। সংস্কার দরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায়– সংস্কার প্রয়োজন নির্বাচন পদ্ধতিতেও। কেমন হতে পারে সে সংস্কার।

আমি ব্যক্তিগতভাবে সংস্কারে বিশ্বাসী একজন রাজনীতিক। পুরনো ধ্যান-ধারণার বিপরীতে নতুন কিছু উদ্ভাবনের চিন্তা আমার মাথায় থাকে। এর জন্য আলোচিত-সমালোচিত দুই-ই হয়ে থাকি। উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় সমালোচনার ঝড়ে পড়েছিলাম। যা হোক, সে ঝড়ের পর আবার শান্তির বাতাস বইতে শুরু করেছিলো। দেশবাসী উপজেলার সুফল পেয়েছে। এরপর দেশের জনসংখ্যা সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি। আমার বিশ্বাস, দেশ ও জাতির কল্যাণ ও বৃহত্তর স্বার্থে আজ হোক আর কাল হোক প্রাদেশিক ব্যবস্থা এ দেশে একদিন প্রবর্তন হবেই। তবে এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা এবং নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। বিচারপতি হলেই তিনি নিরপেক্ষ ব্যক্তি হয়ে যাবেন এমনটি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। দেখা যাচ্ছে অনেক বিচারপতি অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তারা কেউ দলীয় মনোনয়নে নির্বাচন করে পরাজিত হন, আবার কেউ সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হন। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে শুধু সুপ্রিমকোর্টের সদ্য অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতিকেই মনোনীত করতে হবে– এই বিধানের পরিবর্তন প্রয়োজন। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে

www.pathagar.com

আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে। তারপর উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যাপারেও প্রধান উপদেষ্টার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যাপারেও সকল দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে। একেবারে নির্ভেজাল নিরপেক্ষ লোক পাওয়া যাবে না– একথা হয়তো সত্য, অন্তত সৎ-নীতিবান-আদর্শবাদী হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের আমরা কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করতে পারি। আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখলে এই সরকারের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শুধু রাষ্ট্রের রুটিনমাফিক কাজ চালানোর দায়িত্ব থাকা উচিত। নির্বাচন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে নির্বাচন কমিশনের হাতে। সে ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রয়োজনীয় নির্বাহী ক্ষমতা থাকতে হবে। ডিসিদের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা বাতিল করার প্রয়োজন আছে। গত ১৪ বছরে তিন সরকারের আমলেই দেখা যাচ্ছে, জেলায় ডিসি নিয়োগে যোগ্যতার চেয়ে দলীয় আনুকূল্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বেশি। নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসার হিসেবে এরা নিজের ভালোবাসার দলের অনুকূলে প্রকৃত ফলাফলের ওপর হস্তক্ষেপ করে। মিডিয়া ক্যুর জায়গাটিই হচ্ছে রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর। আমরা এমনও দেখতে পেয়েছি যে, পঞ্চগড় থেকে নির্বাচনের ফলাফল এসে গেছে নির্বাচন শেষ হবার ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে অথচ রাজধানী ঢাকার ফল প্রকাশে ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এসব ক্ষেত্রে মিডিয়া ক্যু হবার যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা অমূলক নয়– যথার্থভাবেই বাস্তব। তাই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বদলাতে হবে। প্রস্তাবিত স্বাধীন নির্বাচন কমিশনে প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকলে সৎ ও যোগ্য বলে বিবেচিত ডেপুটি সেক্রেটারি পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যেতে পারে। যা হোক এ ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন এবং তাদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে জাতি কিছুটা ইতিবাচক ফল পাবে বলে আশা করা যায়। এ ব্যাপারে নির্বাচনী আইন আরো কঠোর করার প্রয়োজন আছে।

আমি আবারও উল্লেখ করতে চাই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাজনীতিকদের জন্য লজ্জা ও অপমানের বিষয়। এ ব্যবস্থা বাতিল করে শক্তিশালী স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করলেই সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে। সরকারের মেয়াদ পূরণের সময় থেকে নতুন সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের অধীনে সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দলের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় সরকারের মতো একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও গঠন করা যেতে পারে। তথাকথিত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার চেয়ে বিজ্ঞ রাজনীতিকদের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠিত হওয়াই

www.pathagar.com

শ্রেয়। সে ক্ষেত্রে সরকারের উপদেষ্টা বা মন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে না। এ সরকার শুধু রাষ্ট্রের নিয়মিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপের এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের থাকবে না। এতে অন্তত রাজনীতিকদের মর্যাদা সমুন্নত থাকবে।

অবশেষে আমি যেখানে সংস্কারের প্রস্তাব দিতে চাই– সেটা হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এই পদ্ধতিতে মাস্তান, কালো টাকার মালিক, অর্থ ও বিত্তের জোরে রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দলীয় মনোনয়ন কিংবা নির্বাচনে জিতে আসার সুযোগ রয়ে গেছে। সৎ-বিজ্ঞ, ত্যাগী রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনসেবা ও দেশসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সংসদে যারা সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন তাদের মধ্যে কতোভাগ রাজনৈতিক মেধাসম্পন্ন কিংবা আইন প্রণয়ন, বিল, সংবিধান, কার্যপ্রণালীবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখেন– তা দলের নেতৃত্ব বা দেশের বিজ্ঞ মহল সবাই জানেন। কিন্তু প্রতিকারের কোনো পথ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে ক্ষমতায় যেতে হলে আসন নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য প্রথমেই খোঁজা হয় প্রার্থীর অর্থবিত্ত কী পরিমাণ আছে। তারপরের যোগ্যতা বাছাইপর্বে দেখা হয় প্রার্থীর জোর দাপট কেমন আছে। এলাকার মানুষ তাকে ভয় পায় কিনা। ভোট কেন্দ্র দখলে রাখতে পারবে কিনা। এ রকম প্রার্থীর অর্থসম্পদের দিকে আবার তাকানো হয় না। মাস্তানিই তার সম্পদ। অর্থ সে আদায় করে নিতে পারবে। প্রকৃত রাজনীতিবিদরা এই দুই যোগ্যতার কাছে মার খেয়ে যান। অধিকাংশ আসনে কোনো না কোনো দলের উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে অর্থ বা মাস্তানের দাপটে জনগণ জিম্মি হয়ে পড়ে। হয় অর্থের দাপট নতুবা মাস্তানের দাপট জয়ী হয়। সততা-যোগ্যতা হয় পরাস্ত।

নির্বাচনের পরে কী ঘটে? কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনে জয়ী হয়ে এসে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে মাত্র ৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ মিথ্যা দিয়ে শুরু হয় একজন জনপ্রতিনিধির 'পবিত্র' যাত্রা। দায়িত্ব পালনের মেয়াদে সে কী করে? নির্বাচনের খরচটাকে শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগ হিসেবে ধরা হয়। যে টাকা সে খরচ করে তা উঠিয়ে নিয়ে কিছু লাভ এবং আগামী নির্বাচনের খরচ জমা করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে ৫ বছর ধরে। জনগণের অনর্থ যতই হোক না কেনো, জনপ্রতিনিধির অর্থের অভাব হয় না। একজন পিয়নের চাকরি প্রদান থেকে শুরু করে জনসেবা পর্যন্ত যত কর্মকাণ্ড আছে সবকিছুতেই থাকে অর্থের সম্পর্ক। কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ যেখানে– সেখানে লাভসহ মূলধন তোলার প্রবণতা থাকবেই।

তারপর আছে শক্তিমানদের কথা। এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন– তাদের পুঁজি তো ওই সন্ত্রাস। জনপ্রতিনিধি হয়ে

www.pathagar.com

যান গডফাদার। তার ইশারায় গড়ে ওঠে সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা এলাকা শাসন করে। অর্থ-বিত্তশালীরা হয় চাঁদার টার্গেট। দুর্বলের ওপর চলে অত্যাচার। নির্যাতন-নিপীড়ন না চালালে কেউ ভয় করে না। আর ভয় না থাকলে ভোট আসে না। এদের পুষতে হয়। না পুষলে গডফাদার হওয়া যায় না। গডফাদার না হলে নেতার আসন পাওয়া যায় না। এই বাস্তবতার কারণে সন্ত্রাস চলতে থাকে। চাপে পড়ে কিছু সময়ের জন্য হয়তো সন্ত্রাস চাপা থাকে কিন্তু নির্মূল হয় না।

অর্থ আর পেশীশক্তির ফাঁক-ফোকর দিয়ে হয়তো কিছু রাজনীতিক ও অভিজ্ঞ নেতা নির্বাচনে জিতে আসেন। তাদের কারণেই হয়তো সরকার চলতে পারে। কিন্তু তারপরও সংসদে যা আলোচনা হয়– তা শুনলে তো মাথা হেঁট হয়ে আসে। মুখে রুমাল বা শাড়ির আঁচল চেপে ধরতে হয়। কারণ ওই একটাই– যোগ্য, আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধির বড় অভাব দেখা যায় সংসদে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যই নির্বাচন পদ্ধতিতে সংস্কার প্রয়োজন। তা না হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো কিছু করতে পারবেই না– এমনকি এর পাশাপাশি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনও প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল এনে দিতে পারবে না। সে কারণেই এই দুই-এর সাথে নির্বাচন পদ্ধতিরও সংস্কার করতে হবে। কেমন হতে পারে সে সংস্কার।

সংসদীয় সরকার পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থাই হচ্ছে দলীয় শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনের মূল কথা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও দেখা যায় অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন থাকে না। যেমন ১৯৯১ সালের সংসদে ক্ষমতাসীন সরকার মোট কাস্টিং ভোটের মাত্র ৩০ দশমিক ৮১ ভাগ পেয়ে আসন আধিক্যের কারণে জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠন করতে পেরেছিলো। শেষ পর্যন্ত জামায়াতের সেই সমর্থন সরকারের প্রতি থাকেনি। তখন আওয়ামী লীগের জোট প্রায় ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়েও বিরোধী দলের আসনে গেলো। এক পর্যায়ে ৩০ ভাগ ভোটারের রায় পাওয়া সরকার ৭০ ভাগ ভোটারের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর তীব্র আন্দোলনের মুখেও তার মেয়াদ পূর্ণ করেই ক্ষমতা ছেড়েছে। একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। তারা মোট ভোটারের ৩৭ দশমিক ৪৪ শতাংশের রায় নিয়ে এককভাবে দেশ শাসন করেছে। তবে হ্যাঁ, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার গঠনে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রচলিত ব্যবস্থাই যে সর্বোত্তম– তাতো মেনে নিতে পারি না। এটা তো বাইবেল নয় যে, পরিবর্তন বা সংস্কার করা যাবে না। নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমেই সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব।

পদ্ধতি যখন দলীয় শাসন ব্যবস্থা- সে ক্ষেত্রে নির্বাচনও শুধু দলের ভিত্তিতে হতে পারে। অর্থাৎ ভোটারগণ দলকে ভোট দেবেন। সরাসরি প্রার্থীকে নয়। প্রত্যেক দল প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সংসদীয় আসনের সদস্য পাবে। তবে সদস্য পাবার ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের কাস্টিং

www.pathagar.com

ভোটের মধ্যে ন্যূনতম ভোট পাবার সীমা থাকবে। প্রত্যেক দল নির্বাচনে তাদের প্রার্থী প্যানেল তৈরি করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেবে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব ইশতেহার ঘোষণার মতো প্রার্থী তালিকা তৈরি করে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করবে। তারপর তিনশ' আসনেই দলগুলো নিজস্ব প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যে দল বেশি ভোট পাবে স্বাভাবিকভাবেই সে দল বেশি সংসদ সদস্য লাভ করবে। সে ক্ষেত্রে দলগুলো কেবল তাদের প্যানেল থেকে ক্রমিক অনুসারে অথবা দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রার্থী মনোনীত করবে। যদি কোনো দল কাস্টিং ভোটের ৫০ ভাগ পেয়ে যায়– তাহলে তারা ১৫০ আসন পাবে। আবার যদি কোনো দল মোট কাস্টিং ভোটের ১ শতাংশ লাভ করে তাহলে ৩ জন সংসদ সদস্য পাবে। ওই দল তাদের প্যানেল থেকে এই ৩ জন প্রার্থীকে মনোনীত করে দেবে। তারাই হবেন উক্ত দলের সংসদ সদস্য। অবশ্য সংসদীয় আসনের ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কারণ অনেকে স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে উক্ত আসনের মোট কাস্টিং ভোটের ৫০ শতাংশের চেয়ে অন্তত এক ভোট বেশি পেলেই স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো যোগ্য প্রার্থী প্যানেল তৈরি করে নির্বাচনী প্রচারে নামতে পারবে। যে দল ভালো প্রার্থীর প্যানেল তৈরি করবে জনগণ সেই দলের দিকেই ঝুঁকবে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে কোনো রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের প্যানেল তৈরি করতে কোনো সন্ত্রাসী, বিতর্কিত, অরাজনৈতিক বা অযোগ্য মূর্খ প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করতে যাবে না। নির্বাচনী খরচ চালানোর জন্য অর্থশালীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে দলই সমালোচনার মধ্যে পড়বে। একজন সন্ত্রাসীকে প্যানেলে রাখলে গোটা দেশের নির্বাচনে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে। আর কোনো দলের ৩০০ জন প্রার্থীর প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হলেই প্যানেলভুক্ত যে কোনো প্রার্থীর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকবে না। কারণ প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে যে দল যে ক'জন সংসদ সদস্য পাবে প্যানেলের মধ্য থেকে আবার সবচেয়ে যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থীদেরই সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনীত করবে। ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট করে দেবে, কোন এলাকা থেকে কোন দল সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে উপ-নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। কোনো দলের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত দলের প্যানেল থেকেই দল শূন্য আসনে প্রার্থী মনোনীত করবে।

কোনো দেশে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় কিনা সে দৃষ্টান্ত খুঁজতে চাই না। আমরা এই মডেল অনুসারে নির্বাচনের কথা ভাবতে পারি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বিশ্বের কোনো দেশে নেই। আমাদের দেশে এটা প্রবর্তন করেছি। নতুন নির্বাচন পদ্ধতিও আমরা প্রবর্তন করতে পারি। আমি জাতীয় নির্বাচনে যে সংস্কারের কথা উল্লেখ করলাম– এই পদ্ধতিতে বিশ্বের অন্য কোনো

www.pathagar.com

দেশে নির্বাচন হয় কিনা জানি না, তবে আংশিকভাবে আমাদের দেশে হতে যাচ্ছে এবং অতীতেও হয়েছে। তা হলো সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন। সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় না। বিগত আমলে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সরকারি দল মহিলা সদস্য পেয়েছে। তারা দলের মনোনয়নে সংসদ সদস্য হয়েছেন। এবার থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দল আনুপাতিক হারে মহিলা সদস্য পাবে। জনগণ সরাসরি মহিলা সদস্য নির্বাচিত করতে পারেনি বলে তারা কোনো অভিযোগ বা প্রতিবাদ জানাতে যায়নি। দল যাকে মনোনীত করে দিয়েছে জনগণ তাকেই মেনে নিয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি– একই সংসদে দুই পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা করবেন। এখানে পুরুষ আর মহিলার মধ্যে একটা বৈষম্য থাকছে। অথচ নাগরিক হিসেবে সবার সমান অধিকার। যদি পুরুষকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হয়– তাহলে সংরক্ষিত ব্যবস্থা বাতিল করে সকল মহিলাকেও সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। আবার দলের মনোনয়নে একজন মহিলা যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন এবং তাতে যদি তার মর্যাদায় কোনো ঘাটতি না থাকে তাহলে একজন পুরুষ কেনো ওই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে পারবেন না। দেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এর মধ্যে বৈষম্য থাকা উচিত নয়। সংবিধানেও যেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে– সেখানে উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচন পদ্ধতি থাকবে কেনো? সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হলে দলকেই সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইতিপূর্বে আমি বলেছিলাম– সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হলে এমন নির্বাচনী আইন প্রণয়ন করতে হবে যে, দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে মনোনীত প্রার্থীর একটা নির্দিষ্ট কোটা নারীর জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে। তবে সেটাই উপযুক্ত পন্থা নয়। কারণ একদল যেখানে মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে– অন্য দলের সেখানে হয়তো পুরুষ প্রার্থী থাকবে। সে ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থী জয়ী নাও হতে পারেন। তবে আমি যে নতুন নির্বাচন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলাম– সেখানে আনুপাতিক হারে মহিলা সদস্য নির্বাচিত করা সহজ ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক দলের প্রার্থী প্যানেলে সুনির্দিষ্ট কোটায় মহিলা প্রার্থীর নাম রাখার বিধান রাখা যেতে পারে। তাছাড়া সংখ্যালঘুসহ সকল পেশার প্রতিনিধিত্বের জন্য তাদের কোটা অন্তর্ভুক্ত করে প্যানেল তৈরির নিয়ম তৈরি করা যেতে পারে। যে দল প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে যত সংসদ সদস্য পাবে তার মধ্যে নারী এবং সংখ্যালঘু সংসদ সদস্য মনোনীত করারও বিধান রাখতে হবে। এই ব্যবস্থাতেই আমরা সংসদে নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারি। দেশের বিজ্ঞ মহল নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, এই পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা কম হবে। এতে দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তির চেয়ে যে দল বড় সেটাও প্রতিষ্ঠা পাবে। দলের প্রতি নেতাকর্মীদের আনুগত্য সুদৃঢ় হবে।

www.pathagar.com

দলের জন্য কাজ করেই নেতাকর্মীদের প্রার্থী-প্যানেলে আসার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। সংসদে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে অবস্থান নেবার কারো কোনো পথ থাকবে না। দল কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সদস্যের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করলে তাকে সংসদ সদস্য পদ হারাতে হবে। সে ক্ষেত্রে দল তার প্যানেল থেকে নতুন সদস্য মনোনীত করতে পারবে। এর ফলে সংসদ সদস্য কেনা বা বিক্রি হবার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

এখানে আরো একটি বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই। সংসদ হলো আইন প্রণয়নের জায়গা। এটা দেশ ও জনগণের জন্য কথা বলার জায়গা। আইন সভার সদস্য আর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিনিধি এক বিষয় নয়। সংসদকে সবার ঊর্ধ্বে রেখে স্থানীয় প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপজেলা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। আইন সভার সদস্য সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। এমনকি তার কাছে জবাবদিহি করারও বিধান রাখা যেতে পারে। আইন সভার সদস্যের রিলিফের চাল-গম বরাদ্দ করার কাজে ব্যস্ত থাকা সমীচীন নয়। এটা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির হাতে থাকাই উচিত। সংসদ সদস্যরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই– বর্তমানে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার মতো যেসব রাজনৈতিক দল আছে তার নেতৃত্বের মধ্যে সম্ভবত বয়সে আমিই প্রবীণ। তবে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা আগলে রাখার পক্ষপাতী আমি নই। সে কারণেই দেশ ও জাতিকে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করি। সমস্যা সৃষ্টি হলেই সমাধানের পথ খোঁজা হয়। আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এটা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব এসেছে। আমি একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে নিজেও এই দাবি জানিয়েছি। আমি উপলব্ধি করেছি– বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হচ্ছে তাতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিতর্কহীনভাবে নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। দিন দিন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে দেখা যায় বিরোধী দলের আসনের উপ-নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে সরকারি দল বিজয়ী হয়– ইত্যাদি সমস্যার কথা উপলব্ধি করে একটা সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। দেশের বিজ্ঞ মহল, সকল রাজনৈতিক দল এটা ভেবে দেখতে পারে। আমি মনে করি, আমার প্রস্তাবের কথা সবাই বিবেচনা করে এ ব্যাপারে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। এতে নির্বাচনে কালো টাকার ছড়াছড়ি বন্ধ হবে, পেশীশক্তির দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটবে। লাভবান হবেন সত্যিকারের সৎ, অভিজ্ঞ ও ত্যাগী রাজনীতিবিদরা। লাভবান হবেন যারা দলের জন্য কাজ করেন– এমন নিবেদিত নেতাকর্মীরা।

www.pathagar.com

একটি বিজয় দিবসকে সামনে রেখে আমার নতুন চিন্তার রূপায়ণ ঘটাতেই এই আলোচনার অবতারণা করলাম। বিজয় দিবস মানে আমাদের নতুন যাত্রা শুরু হবার দিন। এই দিন কখনো পুরাতন হবে না। এই দিনকে সামনে নিয়ে আমরা আশায় বুক বেঁধে উঠি। আমার নতুন সংস্কার প্রস্তাবটিও এসেছে বিজয় দিবসের মুক্তি চেতনার আলোকে। সকল মহল যদি এই প্রস্তাবকে মুক্ত মনে গ্রহণ করে তাহলে হয়তো আশার আলোই দেখতে পাবো।

www.pathagar.com

হাসিনা-খালেদা সমঝোতা আমিও দেখতে চাই

লন্ডন থেকে প্রেরিত 'দৈববাণী' নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার হাতে নেই। যে যার পেশায় কাজ করবে– তাতে অন্য পেশার মানুষের হাত বাড়ানোও ঠিক নয়। সে কাজে হয়তো দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যাবে না। আমি রাজনীতি করি– আমার রাজনীতি নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। লন্ডন প্রবাসী আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী পেশায় একজন কলামিস্ট। তিনি প্রবাস থেকে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। দৈববাণীর মতো তিনি জ্ঞান-উপদেশ-সতর্কবাণী-হুশিয়ারি দিয়ে থাকেন, রাজনৈতিক পর্যালোচনা-সমালোচনা করেন। সেসব নিয়ে আমার কোনো কথা নেই। তার লেখার একটি প্রবণতা হলো– কারণে অকারণে আমার প্রসঙ্গ টেনে এনে অবাস্তব-অপ্রাসঙ্গিক-কল্পনাপ্রসূত কাহিনী লিখে আমাকে হেয় করা। গালিগালাজ তো সেই সাথে আছেই। তিনি সম্প্রতি দৈনিক যুগান্তরে 'আমি চাই হাসিনা-খালেদা সমঝোতা' শিরোনামে একটি সিরিজ নিবন্ধ লিখেছেন। কক্সবাজার সফরকালে তার সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তিটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেখানে তার অভ্যাসমতো ঠিকই আমার সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলেছেন। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে ৪ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে। ওই প্রসঙ্গে তিনি আরো লিখবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। ভেবেছি পুরো লেখাটি পড়েই তার বক্তব্যের কিছু জবাব দেবো। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যে সময় পাবো কিনা, সে আশংকা আছে। আজ শুক্রবার কিছুটা সময় পেলাম বলে লেখাটা শুরু করলাম।

প্রথমেই বলে রাখি– গাফ্‌ফার সাহেব যে হাসিনা-খালেদার সমঝোতা প্রত্যাশা করছেন, তার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। আমিও চাই সমঝোতা তাদের মধ্যে হোক– তাতে দেশবাসী একটা দিক থেকে হয়তো রক্ষা পাবে। জনগণ অন্তত রাজনীতির নামে হিংসা-হানাহানি-কাদা ছোড়াছুড়ি, পাল্লা দিয়ে দলীয় সন্ত্রাস দেখবে না। সন্ত্রাস-দুর্নীতি-লুটপাট এসব সমঝোতার ভিত্তিতেই পারবে! জনগণ রাজনৈতিক অঙ্গনে দুই দলের দ্বন্দ্ব সংঘাত জিঘাংসা দেখে দিশেহারা হয়ে উঠবে না। তাই হাসিনা-খালেদার সমঝোতা হওয়াই উচিত। সমঝোতা হলে কী হতে পারে, সে প্রসঙ্গে পরে আসি। তার আগে গাফ্‌ফার চৌধুরীকে একটা আশার কথা শোনাতে পারি যে, তিনি কোনো পাগলের প্রলাপ বকেননি। তার আশা অবশ্যই পূরণ হবে! দ্বিতীয় কিস্তি লেখার শুরুতেই তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন, গত সপ্তাহে যুগান্তরে 'আমি চাই হাসিনা-খালেদার সমঝোতা' শীর্ষক লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের কাছ থেকে কিছু প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। আমার ভাগ্য ভালো, কেউ আমার লেখাটিকে পাগলের প্রলাপ আখ্যা দেননি।" আমার কথা হলো– পাঠকরা সত্যিই সচেতন, তাই গাফ্ফার চৌধুরীকে পাগল বলেননি। কারণ তার কথা সত্য হবার সম্ভাবনা আছে। হাসিনা-খালেদার সমঝোতা আগেও একবার হয়েছিলো। সেই সমঝোতায় যে ডিম্বটি প্রসব হয়েছে, তার নাম 'তিন জোটের রূপরেখা'। যে রূপরেখার কোনো শর্ত গত ১৪ বছরে দুই দলের সরকার পূরণ করতে পারেনি। একমাত্র প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের বদলে সংসদীয় পদ্ধতি কায়েম হয়েছে। তবে তাতে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেনি। প্রেসিডেন্টের শাসন নামবদল হয়ে প্রধানমন্ত্রীর শাসন কায়েম হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আলোর জগৎ থেকে অন্ধকারেই ডুবে গেছে। আবারো হাসিনা-খালেদা সমঝোতা হতে পারে, তবে তা এক দল ক্ষমতায় আর অন্য দল বিরোধী আসনে থেকে নয়। দুই দলকেই ক্ষমতার বাইরে থাকতে হবে। আর সে সুযোগ অচিরেই আসবে হয়তো। কারণ দেশবাসী এই দুই দলকেই ক্ষমতার আসনে দেখেছে। সুতরাং এখন সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ। গাফ্ফার চৌধুরী যে সমঝোতা চান, সে সমঝোতা যখন আবার বাস্তবে দেখা যাবে, তার আগেই দেশ ও জাতি হয়তো ব্যর্থতা-অদক্ষতা-অযোগ্যতা-সন্ত্রাস-দুর্নীতি-দুঃশাসন-লুটপাট-অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। সেই পরিবেশে যদি সমঝোতা আসে, তা আসুক– আমিও সেটা প্রত্যাশা করি। এবং আমার ধারণা, সেই প্রত্যাশা পূরণ হবেই। গাফ্ফার সাহেবরা সে সমঝোতা দেখতে পাবেন।

আব্দুল গাফ্ফার সাহেব হাসিনা-খালেদার সমঝোতার যুক্তি দেখাতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। যথারীতি তার মুখের বুলি অনুসারে আমাকে 'স্বৈরাচার' আখ্যা এবং একটি গালি দিয়ে লিখেছেন যে, 'নিজের দশ বছরের অবৈধ আসনে তিনি যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন, নিজের খেয়ালখুশিমতো দেশের সেক্যুলার সংবিধানের মর্যাদা ও চরিত্র ধ্বংস করেছেন তাতে তার তো আর্জেন্টিনার সামরিক ডিক্টেটরের মতো দেশদ্রোহিতার দায়ে বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত ছিলো। তার বদলে তাকে নিয়ে গণতন্ত্র উদ্ধারের জোট গঠন? এই প্রস্তাব বিশ্বের যে কোনো দেশের গণমনে ঘৃণার উদ্রেক করবে। বাংলাদেশের মানুষের মনেও কি তা করবে না? দুই ডাক্তার তাকে নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র লালসায় জোট গঠন করে দেখুন। হিরো সাজতে গিয়ে তারা কীভাবে জিরো হন, সেই পরিণতিটা শুধু ঘটার অপেক্ষা।' এ প্রসঙ্গ নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে চাই যে, গাফ্ফারের ভাগ্যটা আসলেই ভালো। তিনি যা-ই লিখে দেন, তা-ই ছাপা হয়ে যায়– তা প্রলাপ বকুনি হলেও। আমি তার গালিগালাজের কোনো জবাব দেবো না। কারণ গালির জবাবে গালিই দিতে হয়, যা আমার নীতি ও আদর্শবিরোধী কাজ। তিনি আমাকে স্বৈরাচার বলেছেন– বলুন, তাতে আমার কোনো দুঃখ-ক্ষোভ নেই। কারণ আমি স্বৈরাচার উপাধি

www.pathagar.com

পেলেও উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, সংস্কার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দেশ ও জাতিকে যা দিতে পেরেছি– কোনো গণতান্ত্রিক সরকার তা দিতে পারেনি। আমি যেভাবে দেশ পরিচালনা করেছি– তাকে যদি স্বৈরাচারী শাসন বলা হয় এবং সেই শাসন যদি জাতির ভাগ্যে না জুটতো, তাহলে দেশ আজ মানুষের বাসযোগ্য থাকতো না। আমি দেশ ও জাতির জন্য যা করেছি, তার ব্যাখ্যা গাফ্ফারের লেখার জবাবে দিতে চাই না। কারণ দেশের সেই সুফল তিনি ভোগ করতে পারেননি– প্রবাসে পরগাছার মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছেন তিনি। আমার শাসনামলের সুফল দেশের জনগণ ভোগ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

তিনি লিখেছেন, আমি নাকি সেক্যুলার সংবিধানের মর্যাদা ও চরিত্র ধ্বংস করেছি। ভদ্রলোকের মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হয়েছে কিনা জানি না। তার তো না জানার কথা নয় যে, অসংশোধিত সংবিধানে যে চারটি স্তম্ভ ছিলো তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার স্তম্ভটি ভেঙে দিয়ে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' সংযোজন করেছিলেন আমার পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান। নিশ্চয়ই তিনি এ কাজটি করে খারাপ কিছু করেননি। এ দেশের ৮০ ভাগ মানুষের মনের আশা-ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সংবিধানে। সংবিধানের সেক্যুলার চরিত্র যদি নষ্ট হয়ে থাকে তা ঘটেছে জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে। তাহলে গাফ্ফার কি বলতে চান জিয়াউর রহমানও রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করেছেন? এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা বা ধর্মহীনতা তারা মেনে নিতে পারে না। সে জন্যই ওই সংশোধনীর প্রয়োজন হয়েছিলো। আমি সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করেই কি সেক্যুলার চরিত্র ধ্বংস করেছি? ধর্মের মর্যাদা দেয়া কিংবা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া যদি দেশদ্রোহিতা হয় এবং তার জন্য যদি আমার বিচার বা শাস্তি পেতে হয়, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে ইসলামী দুনিয়ায় দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছি– এটা আমার রাষ্ট্রনায়ক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে মনে করি। এটা যদি খারাপ কাজ হয় এবং জনগণ যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে আমার পরে সেক্যুলার রাজনীতির প্রবক্তারা ক্ষমতায় এসে এটা বদলালেন না কেন? সুতরাং বিচার যদি করতেই হয় তাহলে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে গাফ্ফারদেরই বিচার হওয়া উচিত।

আব্দুল গাফ্ফার লিখেছেন– আমাকে নিয়ে গণতন্ত্র উদ্ধারের জোট করলে তা নাকি বিশ্বের যে কোনো দেশের গণমনে ঘৃণার উদ্রেক করবে। পাঠক গাফ্ফারের হাসিনা-খালেদা সমঝোতার প্রস্তাব পাগলের প্রলাপ বলে আখ্যা না দিলেও এই কথাটিকে নিশ্চয়ই পাগলের প্রলাপ বকুনি ভেবেছেন। গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রশ্ন এলো কেন– সে বিষয়টাই আগে বুঝতে হবে। গণতন্ত্র যখন থাকে না তখনই তা উদ্ধারের প্রশ্ন আসে। তাহলে গাফ্ফার নিশ্চয়ই স্বীকার করেন– দেশে এখন গণতন্ত্র নেই। এখন আমি তো ক্ষমতায় নেই। তাহলে দেশের

www.pathagar.com

গণতন্ত্র হত্যা করলো কারা? গাফ্‌ফারের ভাষ্যমতে আমি যদি গণতন্ত্র হত্যা করে থাকি এবং তার জন্য আমার যদি বিচার বা শাস্তি পেতে হয়, তাহলে আমার পরে যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে বা করছে– তাদের কি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করতে হবে? কথা এখানে আরো আছে– গণতন্ত্রকে যদি উদ্ধার করতে হয় তাহলে তার আগে খুঁজতে হবে এই গণতন্ত্র আমরা হারালাম কখন? কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখলেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে না, আবার যার চোখ আছে তাকে অন্ধ বললেই তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায় না। গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসীন সরকারের ব্যর্থতার কারণে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণেই আমি ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলাম। রাজনীতিকদের মাধ্যমে তখন সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়নি বলেই ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক শাসনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আমাকে দেশ চালাতে হয়েছে। তারপর দেশে আমিই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনেছি। যখন নিজে দল গঠন করিনি, তখন নির্বাচন দিয়ে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি ব্যারাকে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। কেন সেদিন রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের পথে ফিরে এলো না? আপনারা তো একজন কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতির পদে এনে নির্বাচনের পর আবার তাকে স্বপদে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি তার চাকরির স্বার্থে সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করেছেন। আমিও তো দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। সে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি আবার স্বপদে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। তখন আপনারা গণতন্ত্রের পথে এলেন না কেন? সেই পর্যায়ে আমাকে বাধ্য হয়ে রাজনীতিকদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয়েছে। যারা আমার দলে এসেছিলেন তাদের প্রায় সবাই ছিলেন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ। তারাও কোনো না কোনো সময়ে জনপ্রতিনিধি ছিলেন– রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমি দেশ পরিচালনা করেছি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ-চিন্তাচেতনা জনগণ যদি ভোগ করে থাকে তাহলে তা শুধু আমার আমলেই ভোগ করেছে। আমার শাসনামলে দলীয়করণের কোনো অভিযোগ আসেনি। আমার শাসনামলে কোনো দলীয় ক্যাডার টেন্ডারবাজি করতে যায়নি। 'টেন্ডারবাজি' শব্দটির উদ্ভবই হয়েছে আমার শাসনামলের পর। দলীয় এলাকা বিবেচনায় আমার আমলে দেশের কোনো অঞ্চল উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়নি। গোপালগঞ্জের বিলাঞ্চলের মানুষ পিচঢালা রাস্তায় গাড়ি চালাতে দেখেছে আমার আমলে। ফেনী জেলার মর্যাদা পেয়ে উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে আমার আমলে। বগুড়ার প্রত্যন্ত উপজেলাতে পাকা রাস্তায় বাস-গাড়ি চলতে শুরু করে আমার শাসনামলে। জনগণ সুষম উন্নয়নের সুবিধা পেয়েছে আমার আমলে। এটাই কি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চরিত্র নয়? কিন্তু এখন কী দেখা যাচ্ছে? যা দেখা যাচ্ছে তা দেখেই তো মনে করতে হচ্ছে– গণতন্ত্র উদ্ধার করতে হবে। সুতরাং গণতন্ত্র কখন ছিলো আর কখন হারালাম– সে প্রশ্নের সমাধান আজ জনগণের কাছে স্পষ্ট। তাই সত্যিকার

www.pathagar.com

অর্থের গণতন্ত্র যদি উদ্ধার করতে হয় তাহলে আমাকেই লাগবে। তার জন্য আমার কোনো বিশেষ 'ডাক্তার' কবিরাজের দরকার হবে না, জনগণই পথের দিশা বের করবে। জনগণকে সাথে নিয়ে আমার চলার পথে গণতন্ত্রমনা যে কেউ সাথী হতে পারে।

গাফ্ফারের ভাষ্যমতে আমি নাকি স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ শাসন করেছি। একক নেতৃত্বে দেশ শাসনকে যদি স্বৈরাচারী শাসন বলা হয়, তাহলে গত ১৪ বছরে কীভাবে দেশ পরিচালিত হয়েছে– তার ব্যাখ্যা কি দেয়ার প্রয়োজন আছে? তবে আমার আমলে এলাকা এলাকা ভাগ করে কোনো সন্ত্রাসী বা তাদের গডফাদারদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ছিলো না। এ ধরনের বহু নেতৃত্বের শাসন আমি কখনো কায়েম হতে দেইনি। সে দিক বিবেচনায় আমি স্বৈরাচার। ক্যাডার রাজত্ব আমি কায়েম করতে দেইনি। এই 'সামন্ত রাজারা' এতোই স্বাধীনভাবে চলতে শুরু করেছে যে, তাদের দমনে র‍্যাব-চিতা-কোবরা বাহিনীর অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছে। আমি শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক করে স্বৈরাচার হয়েছি। আর আমার পরে এলাকাভিত্তিক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বলে সেটা হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসন! স্বৈরাচার প্রসঙ্গে আমি আর বেশি অগ্রসর হতে চাই না। কারণ দেশবাসী গত ১৪ বছরে স্বৈরাচারের প্রকৃত সংজ্ঞা জেনে গেছে।

আব্দুল গাফ্ফার এবার আর একটি বিষয় আবিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এরশাদের আমলে চট্টগ্রামে হাসিনাকে প্রত্যক্ষ টার্গেট করে পুলিশের দ্বারা গুলিবর্ষণ করা হয়নি? এই ঘটনাটি কি এরশাদের অগোচরে ঘটেছিলো বলে আপনারা মনে করেন? তাহলে গুলিবর্ষণের আদেশদাতা পুলিশ অফিসারকে এরশাদ শাস্তি না দিয়ে চাকরিতে রেখে পদোন্নতি দিয়েছিলেন কীভাবে?' এসব কথা গাফ্ফার তার এক আওয়ামী লীগের বন্ধুকে নাকি বলেছিলেন– লেখায় সেটা উল্লেখ করেছেন। শেখ হাসিনা আমার শাসনামলে কেবল চট্টগ্রামেই জনসভা করেননি, তিনি সারা দেশে শত সহস্র জনসভা করেছেন। তার মধ্যে চট্টগ্রামের লালদীঘির জনসভার এলাকায় জঙ্গি কর্মীদের তৎপরতার কারণে পুলিশ কঠোর ভূমিকা নিয়েছিলো। সেটা ছিলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সেখানে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার টার্গেট থাকবে এবং তা রাষ্ট্রপ্রধানের জ্ঞাতসারে হবে– এ জাতীয় বাজে কথা একজন বিজ্ঞের মুখে মানায় না। কোনো বেকুবও বিশ্বাস করবে না যে, যারা সরকারে থাকেন তারা একজন বিরোধী নেতা বা নেত্রীকে হত্যা করে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাবে। এই ঘটনার পর ঢাকার মিছিলে খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়ে থাকলে তিনি যথার্থই কাজ করেছেন। যারা আমার শাসনের বিরুদ্ধে খালেদা-হাসিনার ঐক্য বা সমঝোতা প্রত্যাশা করতেন, তারা হয়তো ওই ধরনের একটি ঘটনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তারপর আমার শাসনামল গেছে। যারা সমঝোতা করেছিলেন সেই তিন জোটই পালাক্রমে এবং মিলেমিশে ক্ষমতায় এসেছে। আমার আমলের পুলিশকেই তারা উত্তরাধিকার

www.pathagar.com

সূত্রে পেয়েছে। ক্ষমতায় এসে ওই পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয়নি কেন যে তোমরা কার নির্দেশে চট্টগ্রামে গুলিবর্ষণ করেছিলে? ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা হলো, আইভি রহমানের মতো নেত্রীসহ অনেকেই প্রাণ হারালো। সেখানেও পুলিশ উপস্থিত ছিলো। তাহলে কি বলতে হবে– শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য পুলিশই গ্রেনেড ছুড়েছে এবং তা সরকারের অগোচরে হয়নি? কোনো সরকার এসব কাজ করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে যায় না।

যা হোক, এখন দেশের যা অবস্থা তাতে গাফ্ফার সাহেবরা মনে করছেন– হাসিনা-খালেদার মধ্যে সমঝোতা হওয়া দরকার। লিখেছেন যে, 'হাসিনা-খালেদা' সমঝোতা ছাড়া এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিকল্প কী? আসলেও এই দু'জনের মধ্যে সমঝোতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সমঝোতা না হবার কোনো কারণও নেই। দুই পক্ষেরই একই চরিত্র একই মেজাজ মর্জি। একই পদ্ধতিতেই রাষ্ট্র শাসন। দুই পক্ষের উপরই জনগণ অতিষ্ঠ। দুই পক্ষের আমলেই দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে– আন্তর্জাতিকভাবেও দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হবার কলঙ্ক অর্জন করেছে। দুই পক্ষই রাষ্ট্র পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দুই পক্ষের আমলেই দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সব দিক বিবেচনাতে দুই পক্ষেরই যমজ ভাই-এর মতো চেহারা-চরিত্র একই। ব্যবধান শুধু এক এক জায়গায়। এক পক্ষের সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু বলে চিহ্নিত জামায়াত আছে– অন্য পক্ষের সাথে তারা নেই। তবে এক্ষেত্রে একবারে যে অমিল আছে তাও নয়। এক পক্ষের সাথে আছে মাতৃভূমি ও জাতির সাথে বেইমানি করা শক্তি– আর এক পক্ষের সাথে ছিলো দলের সাথে বেইমানি করা একটি লোভী অংশ। এরা আবার জামায়াতকে যে একেবারে সহ্য করতে পারে না তাও নয়– প্রয়োজনে এদের পাশে বসাতে পারে– আবার প্রয়োজনে এদের কাছে বাধা দিতেও পারে। সুতরাং সমঝোতা হতে কোনো দিক থেকে বাধা নেই। বাধা শুধু এক জায়গায়, সেটা হচ্ছে ক্ষমতা। একখণ্ড জমি নিয়ে যদি দুই ভাই মারা-মারি করে তাহলে সমঝোতার ভিত্তিতে জমি খণ্ড ভাগ করে নিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। তেমনিভাবে ক্ষমতা দুই পক্ষ ভাগ করে নিলেই সমঝোতা হয়ে যায়। আর সমঝোতা এখন যে নেই– তাইবা বলি কী করে। এক পক্ষ আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতি লুটপাটের অভিযোগ করছে কিন্তু আদালতে কোনো মামলা হয় না। কেউ গ্রেফতারও হয় না। দুর্নীতির জন্য কাউকে জেলে যেতেও হয় না। দোষ শুধু দেশের। দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। হাসিনা-খালেদা সমঝোতা হোক তা আমিও চাই– হবেও হয়তো। কিন্তু হলে কী হতে পারে? যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে যে সব বিষয় উভয় পক্ষের মধ্যে মিল রয়েছে সেসব বিষয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে তৎপরতা চলতে থাকবে! লুট-পাট কিংবা সম্পদের পাহাড় গড়ার ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি ঈর্ষায় জ্বলবে না। যদি ক্ষমতার বাইরে থাকে তাহলে একযোগে ভাংচুর হরতাল জ্বালাও পোড়াও-এর

www.pathagar.com

মতো ধ্বংসের রাজনীতি করতে পারবে। তবে সমঝোতায় দেশ ও জাতির কপালে যা-ই জুটুক না কোনো দুই দলের ঝগড়া-ফ্যাসাদ দেখা যাবে না, এটাই বা কম লাভ কিসের। আব্দুল গাফ্‌ফার ভাবছেন- তার সাধের আওয়ামী লীগ তো একেবারে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে– তার চেয়ে বরং কষ্ট-ক্লেশ না করে বিএনপির সাথে সমঝোতা করে হলেও কিছুটা ভাগ গ্রহণ করুক। তবে একটি কথা মনে রাখা উচিত– জাতি কিন্তু দেশটাকে দুই দলের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে রাখেনি। (৮-৪-০৫)

www.pathagar.com

বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতির পরিকল্পনা

ভূমিকা : বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থানে অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধনের মতো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এটা সত্য যে, বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম এবং বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে মানুষের মাথাপিছু আয় খুবই কম। দেশে শিক্ষিত, দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মক্ষম জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে জনশক্তির বিরাট অংশ সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর এবং কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আর নেই। অপরদিকে বর্তমানে শিল্পখাতেও কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো দেশ সম্পূর্ণভাবে কৃষির ওপর নির্ভর করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। কৃষির পাশাপাশি প্রয়োজন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন। সত্যি কথা বলতে কি– আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত শিল্পের উন্নয়ন তো দূরের কথা বরং ক্রমেই বিপর্যয় ঘটছে। প্রতিবেশী দেশ থেকে অবাধে অবৈধভাবে শিল্পপণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করার ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে অথবা বন্ধ হবার পথে রয়েছে। এমন অবস্থা ঘটছে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে। সরকার ক্রমাগতভাবে দাবি করে যাচ্ছে যে, প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। অথচ দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির কারণে অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানি তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বৈদেশিক এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ের বিনিয়োগ এখন ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে। ফলে কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা– শিল্প বিপর্যয়ের কারণে শ্রমিক-কর্মচারীরা আরো বেকার হয়ে যাচ্ছে। দেশের মেধা কর্মের সন্ধানে বিদেশে চলে যাচ্ছে। উৎপাদনশীল খাতে শ্রম বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে বিপুলসংখ্যক জনশক্তি অনুৎপাদনশীল খাতে তাদের শ্রম বিনিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। এ হতাশা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। হতাশাগ্রস্ত যুবকরা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ– সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, চোরাচালানের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। দুর্নীতি এখন জাতীয় জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সত্তর এবং আশির দশকে অর্থনীতিবিদরা বলতেন– মোট

www.pathagar.com

উন্নয়ন এবং বাজেটের ৪০ ভাগ অপচয় হয় বাকি ৬০ ভাগ যথাযথভাবে উন্নয়ন কাজে ব্যয় হয়। কিন্তু এখন তারা বলছেন, সত্তর ও আশির দশকে উন্নয়ন বাজেটের অপচয় এবং যথাযথ ব্যবহারের ওই হার বর্তমানে উল্টে গেছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপচয়ের হার ৬০ ভাগেরও উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স তিন দশক পেরিয়ে গেছে। অনেক আশা নিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। অজস্র প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের যে স্বপ্ন ছিলো দেশবাসীর, তা শুধু ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। স্বপ্ন ছিলো– আমরা পাবো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো আসেনি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে আমরা এখন সবচেয়ে নাজুক অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছি।

আশির দশকে আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলাম। সেটা ছিলো উপজেলা পদ্ধতির প্রবর্তন। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে উপজেলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামীণ জনজীবনে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক নবযুগের সূচনা হয়। উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জনপ্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন শুরু হয়। এর ফলে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পরবর্তী সময় এক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের সেই উপজেলা ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া হয়। গ্রামপ্রধান আমাদের এই দেশে সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে গ্রামের উন্নয়নের ওপর। কিন্তু উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করার ফলে শুধু উন্নয়নই স্থবির হয়ে পড়েনি এর পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি, সামাজিক অগ্রগতি, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ধস নেমে আসে। তখন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো।

উপজেলা প্রবর্তনের মাধ্যমে একেবারে নিম্ন পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং এ পদ্ধতির সুবিধাদি বাস্তবতার আলোকে আমি ব্যাপকভিত্তিক প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা বিবেচনা করি। এটা হচ্ছে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। দেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং উন্নয়ন সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাসহ সুচারু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দেশকে ৮টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। দেশের বর্তমান অপর ৬টি বিভাগকে প্রদেশে রূপান্তর এবং রংপুর-দিনাজপুর নিয়ে একটি প্রদেশ এবং বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা নিয়ে আরো একটি প্রদেশ গঠন করা যায়। ঢাকা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, প্রতিবেশী ভারতের রাজধানী দিল্লিকে এককভাবে একটি প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং সেখানে পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক সরকার বলবৎ আছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজধানী সে তুলনায় আয়তনে ছোট এবং

www.pathagar.com

লোকসংখ্যাও দিল্লির চেয়ে অনেক কম। সে বিবেচনায় ঢাকাকে শুধু কেন্দ্রীয় রাজধানী হিসেবেই বহাল রাখা যায়। সেক্ষেত্রে ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানী বিভাগের একটি কেন্দ্রস্থল নির্ধারণ করে সেখানে স্থানান্তর করা যায়। ভৌগোলিক অবস্থান এবং গুরুত্ব অনুসারে ময়মনসিংহ ঢাকা প্রদেশের রাজধানী হতে পারে। অর্থাৎ দেশকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করা হলে অঞ্চল হিসেবে পাওয়া যায়– ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং রংপুর-দিনাজপুর ও নোয়াখালী-কুমিল্লা। প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে প্রাথমিক যৌক্তিকতা কী আছে তা দেখার জন্য আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সরকার পদ্ধতিও অবলোকন করা যেতে পারে। বাংলাদেশসহ ৭টি দেশ নিয়ে যে সার্ক গঠিত হয়েছে তার মধ্যে ৪টি দেশেই প্রাদেশিক ব্যবস্থা রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকায় প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও একই শাসন ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে সার্কের মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৪ কোটি ৩৪ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে দেশের লোকসংখ্যা ২৬ কোটি ৫৪ লাখে উন্নীত হবে। সুতরাং অতীতের বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করে অগ্রসর হলে আগামী দিনে এ দেশবাসীকে অন্ধকারে নিপতিত হতে হবে। এক বিশাল জনসংখ্যার দেশকে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে সেই বিবেচনাতেই আমাদের শাসন পদ্ধতি রচনা করতে হবে। যেখানে আমাদের দেশের একটি বিভাগের জনসংখ্যার চেয়েও কম জনসংখ্যার দেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে, সেখানে আমাদের দেশে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির আলোকে এখন আমাদের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করতে হবে। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, দ্রুত উন্নয়ন এবং নতুন শতকে অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশকেও অগ্রসর হতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে এটা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য আইনের শাসন নিশ্চিত করা এবং সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে গোটা দেশে উন্নয়নের ভারসাম্যও নিশ্চিত হবে। এতে বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কাঠামো হবে নিম্নরূপ–

ফেডারেল সরকার : প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কাঠামো কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে আমি একটি প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন

www.pathagar.com

করছি। এটি একটি কাঠামো মাত্র। এখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। দেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন এবং উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য সংবিধানে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের দেশে সংবিধান সংশোধন নতুন কোনো ঘটনা নয়। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত মোট ১৪ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে আবারও সংবিধানের সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দিলে আশা করি দলমত নির্বিশেষে সর্বসম্মতভাবে আমরা তা করতে পারবো। আমরা যদি সকল দল এ ব্যাপারে একমত হতে পারি– তাহলে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে এবং যেসব দেশে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের কাঠামো অনুসরণ করে একটি সর্বসম্মত প্রাদেশিক সরকারের কাঠামো গঠন করতে পারবো।

প্রস্তাবিত দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হবে ফেডারেল সরকার। প্রেসিডেন্ট থাকবেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং বর্তমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হবেন সরকার প্রধান। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে ৩০০ আসনবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ। প্রধানমন্ত্রী হবেন মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। জাতীয় নির্বাচনে যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে সে দলই সরকার গঠন করবে। পদত্যাগ অথবা আস্থা ভোটে পরাজিত না হলে সরকারের মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। সে ক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদ যথারীতি দেশের জন্য আইন প্রণয়ন এবং বার্ষিক বাজেট পাস করবে। সংবিধান অনুসারেই সংসদ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আয়তনে ছোট হবে এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শিক্ষা এবং জ্বালানির মতো জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। স্থানীয় প্রশাসন এবং উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কেন্দ্রীয় সরকার নৈতিক ও আর্থিকভাবে প্রাদেশিক সরকারকে সহযোগিতা করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত উন্নয়ন তহবিল থাকবে। স্থানীয় এবং বৈদেশিক উৎস থেকে এ তহবিল গঠিত হবে। প্রাদেশিক সরকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল সরকার প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে গভর্নর নিয়োগ করবে। অবশ্য স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসন থাকবে, যাতে প্রাদেশিক প্রশাসন স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে। দেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী বড় ধরনের কোনো নিরাপত্তার হুমকি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বড় ধরনের অমান্যের মতো ব্যতিক্রম কোনো ঘটনার ক্ষেত্র ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের কার্যকলাপের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না।

www.pathagar.com

ফেডারেল রাজধানী থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ঢাকা হবে বাংলাদেশের ফেডারেল রাজধানী। কেন্দ্রীয় রাজধানীকে কেন্দ্রীয় রাজধানী অঞ্চল ঘোষণা করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার একজন গভর্নরের তত্ত্বাবধানে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি প্রশাসন পরিচালনা করবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের রাজধানী দিল্লির উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। কয়েক বছর আগে রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করার আগে দিল্লি ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ইউনিয়ন অঞ্চল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগকৃত একজন গভর্নর কর্তৃক দিল্লির প্রশাসন পরিচালিত হতো। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাকে অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে রাজধানী অঞ্চলের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজধানীতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব সচিবালয় অবস্থিত থাকবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ের আয়তন ছোট হবে। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্যই ফেডারেল রাজধানীতে অবস্থিত থাকবে।

প্রাদেশিক সরকার : প্রাদেশিক সরকার হবে কেন্দ্রীয় সরকারের ফেডারেটিং ইউনিট। সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্নর প্রাদেশিক সরকার নিয়োগ করবেন। প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। প্রত্যেক থানা ও উপজেলাকে প্রাদেশিক পরিষদের এক একটি আসন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪৮০টি উপজেলা রয়েছে। থানা এবং উপজেলা মিলে এর সংখ্যা ৫০৮। অর্থাৎ সব থানাই উপজেলা নয়। যেমন রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে ২২টি থানা রয়েছে। ২২টি থানায় জাতীয় সংসদের সংসদীয় আসনের সংখ্যা ৮টি। সুতরাং রাজধানী ঢাকায় ৮টি সংসদীয় আসন থাকলে প্রাদেশিক আসন হবে ২২টি। এ ক্ষেত্রে প্রদেশের আয়তন অনুসারে প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢাকা প্রদেশে যদি ৯০টি থানা ও উপজেলা থাকে তাহলে প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৯০টি। আবার সিলেট প্রদেশে যদি ৩৬টি উপজেলা ও থানা থাকে তাহলে এই প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের আসন থাকবে ৩৬টি। যেমন ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবং সেখানে আসন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে সিকিমের আয়তন সবচেয়ে ছোট এবং সেখানে প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যাও সবচেয়ে কম। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের বিজয়ী পার্টি বা কোয়ালিশন প্রাদেশিক সরকার গঠন করবে। প্রাদেশিক সরকারের প্রধান থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের মুখ্যমন্ত্রী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সাহায্য নিয়ে প্রদেশের প্রশাসন এবং অন্যান্য বিষয়াদি পরিচালনা করবেন। স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হবে। এই আইন অবশ্যই সাংবিধানিক এবং কেন্দ্রীয় আইনকানুনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে

www.pathagar.com

কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা উভয় কক্ষের সম্মতিতে অথবা সুপ্রিমকোর্টের মাধ্যমে সমাধান করে নিতে হবে। প্রদেশের উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে যতোদূর সম্ভব ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অর্পণ করবে। প্রদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রদান করা হবে। অবশ্য এ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত হতে হবে এবং তা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পরিপন্থী হতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের যে কোনো অংশে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার অধিকার রাখবে।

জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকবে। সরকারের বিদ্যমান সকল বিভাগ, উন্নয়ন সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ বিভক্ত করা হবে এবং প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হবে। প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাদেশিক পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। অবশ্য ক্যাডার কর্মকর্তা, বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের দায়িত্ব ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে। প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার এদের নিয়োগদান করবে। প্রত্যেক প্রদেশে হাইকোর্ট থাকবে। হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের অধীনে থাকবে। প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে যদি আলাদা করা হয় তাহলে বিচার ব্যবস্থার নিম্নকক্ষ হাইকোর্টের অধীনে থাকবে অথবা যদি বর্তমান অবস্থা বলবৎ থাকে তাহলে তার প্রশাসন প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে প্রত্যেক জেলাকে উপজেলার সাথে উন্নয়ন ইউনিটে রূপান্তরিত করা হবে। জেলা এবং উপজেলাকে সকল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে– যাতে করে স্থানীয় জনগণকে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের আওতায় আনা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে প্রাদেশিক সরকারকে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং দাতাদের কাছ থেকে উন্নয়ন সহযোগিতা নেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

বর্তমান বিভাগীয় সদর দপ্তরকে প্রাদেশিক রাজধানী ঘোষণা করা হবে। এছাড়া বিভাগ বাদে যেখানে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে– সেখানে সুবিধামত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রাদেশিক রাজধানী করা হবে। ঢাকা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী থাকবে বলে ঢাকা প্রদেশের রাজধানী এই প্রদেশের অপর গুরুত্বপূর্ণ শহর ময়মনসিংহে করা যায়। প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রাদেশিক সচিবালয় স্থাপন করা হবে এবং সচিবালয়ের আয়তন সম্ভাব্য ছোট করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মতো প্রাদেশিক সরকারের মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। যদি ফেডারেল সরকার পদত্যাগ করে অথবা সংসদে ফেডারেল সরকার আস্থা ভোটে হেরে যায় অথবা কোনো কারণে যদি কেন্দ্রীয় সরকার ৫

www.pathagar.com

বছরের মেয়াদকাল অতিক্রম করতে না পারে তাহলে প্রাদেশিক সরকার বহাল থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কারণে মেয়াদকাল পূর্ণ করতে না পারলে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের মেয়াদকাল পরবর্তী ৫ বছর হতে পারবে না। অর্থাৎ ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় বাকি থাকবে- মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর প্রতিষ্ঠিত সরকার সেই বাকি সময় ক্ষমতায় থাকবে। ৫ বছরের মেয়াদ শেষে একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় সর্বময় ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই থাকবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক সরকারের নির্বাহী কর্মকাণ্ড একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা যেতে পারে। যদি কোনো প্রাদেশিক সরকার পূর্ণ মেয়াদের দুই-তৃতীয়াংশ সময়ের পরে পদত্যাগ করে অথবা কোনো কারণে যদি প্রাদেশিক সরকার মেয়াদকাল পূর্ণ করতে সক্ষম না হয় তাহলে উক্ত প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত করে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের সময় পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। আর যদি কোনো প্রাদেশিক সরকার পূর্ণ মেয়াদের দুই-তৃতীয়াংশ সময়ের আগে পদত্যাগ করে কিংবা কোনো কারণে প্রাদেশিক সরকারের পতন ঘটে, তাহলে প্রাদেশিক গভর্নরের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কমিশনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ওই প্রদেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকার মেয়াদের অবশিষ্ট সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে।

ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সম্পর্ক : সকল প্রাদেশিক সরকার সময়ে সময়ে প্রবর্তিত নীতি ও আইন অনুযায়ী অথবা সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে ফেডারেল সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

প্রশাসন চালানো এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই প্রাদেশিক সরকারের কর্মকাণ্ড তদারক করবে। সংবিধান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কাজের পালা পরিধি নির্ধারণ করে দেবে (সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। যেসব দেশে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা বলবৎ আছে– সেসব দেশের সংবিধান অনুসরণ করা যেতে পারে)।

জাতীয় ও প্রাদেশিক বাজেট, শুল্ক আদায়, প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন তহবিল প্রদান, প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিমণ্ডলে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়াদি সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সংবিধান মোতাবেক সমাধান করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থার সুবিধাদি : বাংলাদেশ মূলত প্রায় সমজাতীয় জাতিসত্তার জনঅধ্যুষিত দেশ। মোট জনসংখ্যার ৯৯ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। জনসংখ্যার ৮৫ ভাগই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের দেশ। এখানে সংবিধান-প্রদত্ত বিধানের ফলস্বরূপ একই ভাষা ও ধর্মের বেশিরভাগ নাগরিক যে সুফল ভোগ করবে- বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের সংখ্যালঘু নাগরিকরাও সমানভাবে সেই সুফল ভোগ করবে। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে কোনোভাবেই আঞ্চলিকতা সৃষ্টি হওয়া কিংবা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কোনো ধরনের আশংকা থাকবে না। বরং প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সারা দেশে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এতে করে জাতীয়, প্রাদেশিক ও তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিরা দেশব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করতে পারবেন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। স্থানীয় উন্নয়ন তদারকি করা কিংবা উন্নয়নের ক্ষেত্র বাছাই করার জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সমন্বয়ে উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি সরকারের সর্বস্তরের কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবে। যে দল অথবা দলসমূহের কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় থাকবে তারা পরবর্তী নির্বাচনে আবার বিজয়ী হবার জন্য তাদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখা কিংবা জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধির জন্য প্রদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাবে। এর ফলে স্থানীয় উন্নয়ন আরো জোরদার হবে, দুর্নীতি দূর হবে এবং উন্নয়ন তহবিলের অপচয় কমে আসবে। অবশ্য সরকারি কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে জনগণ খুব কাছে থেকে সরকারের কর্মকাণ্ড অবলোকন করতে পারবে। এতে করে প্রাদেশিক সরকারের দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা আরো জোরদার হবে। প্রাদেশিক রাজধানী হবে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। এর ফলে জনগণ কেন্দ্রীয় রাজধানীর বদলে প্রাদেশিক রাজধানীর দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীতে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ কমে আসবে। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে কেন্দ্রীয় রাজধানী বাদে দেশে আরো ৮টি গুরুত্বপূর্ণ বড় শহর গড়ে উঠবে। এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশে নতুন শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। এখানে দল-মত নির্বিশেষে সকলের একান্ত আন্তরিকতা ও ঐকমত্য সৃষ্টি হলে অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন হয় সংবিধানের পরিবর্তন। এই সংবিধান পরিবর্তনের জন্যই সবার আগে প্রয়োজন সকল দলের ঐকমত্যে পৌঁছা। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের

www.pathagar.com

কোনো বিকল্প নেই। এ দেশে আমিই প্রথম প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছি বলে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সকল কৃতিত্বই যে আমার অনুকূলে চলে আসবে– তা নয়। দেশ ও জাতি উপকৃত হবে সেটাই হবে বড় কথা।

প্রথমে আমি যখন এই প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছিলাম– তখন রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠনের কথা চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে করছি যে, প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম প্রদেশের ভৌগোলিক আয়তন সুবিধাজনক হয়নি। সেক্ষেত্রে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে চট্টগ্রাম প্রদেশ এবং বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী নিয়ে কুমিল্লা প্রদেশ গঠন করা হলে ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চলের জনগণের জন্য সুবিধাজনক প্রদেশ গঠিত হতে পারে। আলোচনা-পর্যালোচনা করে এই ধরনের আরো পরিবর্তন-সংশোধন-সংযোজন আমরা করে নিতে পারি।

কোনো সংস্কার খুব সহজে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। আমি যখন মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করেছি কিংবা থানাকে উপজেলা করেছি, সেই সংস্কারও প্রথমে অনেকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। অর্থনৈতিক অবস্থা-পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষ এখন তো সেই প্রশাসনিক সংস্কারকে যুগান্তকারী বলে বর্ণনা করছেন। আমি মনে করি, প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে রাষ্ট্র পরিচালনা–অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি-উন্নয়ন এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সুফল বয়ে আনবে। আমার প্রস্তাবনার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ঘাটতি থাকতে পারে। আলোচনার মধ্য থেকেই আমরা তা সংশোধন করে নিতে পারবো বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গ কথা : ১৯৯৮ সালের কথা। তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ব্যর্থতাও দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলতে শুরু করেছে। জনগণ আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। সে সময় আমি একটি বিষয় উপলব্ধি করলাম যে, সরকারের পর সরকার বদল হবে অথচ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না– এভাবে আর কতদিন চলবে। বোতলের পর বোতল পরিবর্তন হয় কিন্তু তার ভেতরের মদ যদি থেকেই যায় তাহলে সে পরিবর্তনে লাভ কী। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনায় পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই উপলব্ধি থেকে ওই সময় এক জনসভায় বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করেছিলাম। আমার মনে হলো– মানুষ আমার প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করেছে। তারপর বিষয়টিকে নিয়ে আরো ভাবলাম। এই প্রস্তাবের বিষয়টি পত্র-পত্রিকায়ও ফলাও করে প্রচার হয়েছে। কোনো মহল থেকে আমার এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কোনো বক্তব্য এলো না। শেষ পর্যন্ত ২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাবটিকে প্রধান অঙ্গীকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নির্বাচনে আমরা সরকারে

www.pathagar.com

যেতে না পারায় প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিটিকে পার্টির প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থার একটি প্রাথমিক কাঠামো আমি তৈরি করি। এই খসড়া কাঠামোটি একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে দলীয় কর্মীদের মাঝে প্রচার করা হয়। এরপর ২০০৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর আমি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমার প্রশাসনিক সংস্কারমূলক প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করি। এ প্রসঙ্গে অতীতের একটি ঘটনাও এখানে বলতে চাই। ক্ষমতায় থাকাকালে আমার একটি সংস্কার প্রস্তাব ছিলো উপজেলা প্রবর্তন। সে সময় আমি প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপনের পর কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সমালোচনার মুখে পড়িনি। আমার বিশ্বাস– দেশের সকল রাজনৈতিক দল প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছে। তবে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন পরিকল্পনার ওপর ঢাকায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিক নির্মল সেন এই প্রস্তাবের কিছু সমালোচনা করে দৈনিক যুগান্তরে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। আমি তার জবাবে একটি নিবন্ধ লিখেছি, যা দৈনিক যুগান্তরেই প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এ যুগের গোয়েবল্‌স গাফ্‌ফারনামা

আমি পেশাদার কোনো লেখক বা কলামিস্ট নই। একজন সার্বক্ষণিক রাজনীতিক মাত্র। কবিতা লেখায় কিছুটা শখ আছে– তাই সময় পেলে লিখি। কিন্তু এখানেও একটি মহলের আপত্তি আছে। আমি লিখলে সেটা নাকি অন্যের লেখা আমার নামে ছাপা হয়। অন্তত বৃটেন প্রবাসী আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী সাহেবরা তাই মনে করেন। যে কেউ কবিতা লিখতে পারেন, তাতে কোনো দোষ নেই। আমি লিখলেই সেটা অন্যের লেখা হয়। নিবন্ধ-প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস নেই, আবার সময়ও থাকে না। তবে একজন রাজনীতিবিদকে বক্তৃতা-বিবৃতি বা পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে হয়। তাই মাঝে মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে লেখা দেয়ার জন্য অনুরোধ আসে। আমি তাদের বলি– আমি তো লেখক নই। তারা বলেন, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনার বক্তব্য লিখে দিলেও সেটা পাঠক উপভোগ করতে পারবেন। সেভাবেই দু'একটি পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা দিয়েছি এবং গুরুত্বের সাথে ছাপাও হয়েছে। এর মাঝে কয়েকজন কলামিস্টের লেখার কিছু জবাবও দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়– হবে, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ কিংবা আজেবাজে সমালোচনা হলে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও অধিকার তো আমার থাকতে পারে। এসব প্রসঙ্গে লিখতে গেলে সেখানেও সমালোচনা হয়। আব্দুল গাফ্‌ফার সাহেব বলেন– এসব নাকি আমি লিখি না, অন্যে লিখে দেয়। কি আর বলবো। অনেকেই বলেন– আব্দুল গাফ্‌ফার মিথ্যা কথা লেখেন। আমিও কিছু প্রমাণ পেয়ে লিখেছিলাম– তিনি মিথ্যা কথা সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখতে পারেন। গাফ্‌ফার সাহেব লিখেছেন– কোথায় মিথ্যা বলেছি দেখিয়ে দিন। এখানেই তাকে দেখিয়ে দিতে চাই যে– তিনি একটি ডাহা মিথ্যা বলেছেন যে, আমার লেখাকে অন্যের লেখা বলে প্রচার করেছেন।

আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক লেখা-লেখি হয়েছে। তার মধ্যে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ছিলো। তবে কয়েকজন কলামিস্ট এ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন বা বক্তব্য লিখেছেন তাতে আমার উপর অবিচার করা এবং মিথ্যা অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। আমি এ সব প্রসঙ্গের একটি জবাব দিয়েছিলাম এবং তা গত ২৬ জুন তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে ছাপা হয়। সেই লেখাটি নিয়ে আব্দুল গাফ্‌ফার

www.pathagar.com

চৌধুরী দৈনিক ভোরের কাগজে দুই কিস্তির ফিরিস্তি লিখেছেন। তার লেখা সিরিজটি আমি পড়েছি বেশ দেরিতে। আমার পাঠের তালিকায় ভোরের কাগজ নেই। সব পত্রিকা দেখা বা পড়ার সময় পাই না। আবার কয়েকটি পত্রিকা আছে সেগুলোর খবরাখবর প্রায় একই ধরনের। একটি পড়লেই সবক'টি নাড়ির স্পন্দন পাওয়া যায়। গাফ্ফার সাহেবের লেখার দ্বিতীয় কিস্তিটি প্রকাশের প্রায় সপ্তাহখানেক পর একজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে তিনি আমার বিরুদ্ধে লেখা এই সিরিজটির কথা জানালেন। অনুমান করতে পারি এই ব্যক্তি কী লিখতে পারেন আমার সম্পর্কে। কারণ আমার সম্পর্কে যে গুরুমন্ত্র তিনি রচনা করে রেখেছেন সেটাই বারবার জপ করে যাচ্ছেন। তথাপিও কৌতূহলী হয়ে পত্রিকা অফিস থেকে কপি দুটি সংগ্রহ করলাম। এখানেও তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আমার প্রতি গালিগালাজ-নিন্দা-কুৎসা-মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের খই ফুটিয়েছেন। রাগ ঝেড়েছেন আমার এবং ইনকিলাবের ওপর। আমি কেনো লিখলাম– ইনকিলাব কেনো ছাপলো। আব্দুল গাফ্ফার যে ভাষায় লিখেছেন অতো উন্নত ভাষা আমার জানা নেই এবং ওই ভাষা ব্যবহারে আমার রুচিতে ও আত্মমর্যাদায় বাধে। তবে কিছু জবাব তো না দিলেও চলে না।

আব্দুল গাফ্ফার কোন মিশন নিয়ে কাজ করেন তা এ দেশের রাজনীতি মহলে অজানা নেই। এদের একটা মিশন হয়তো ব্যর্থ হয়েছে বলে গায়ে ভারি জ্বালা ধরেছে। তিনি ভোরের কাগজে ২ জুলাই এবং ১৬ জুলাই তারিখে 'দাড়িওয়ালা খচ্চরের পিঠে বিশ্ববেহায়া' শিরোনামের কুৎসা-কুরুচিপূর্ণ বয়ান প্রচারের ফিরিস্তিতে যে সব বক্তব্য লিখেছেন, তার কিছু জবাব না দিলেই নয়। তবে এখানেই শেষ। আমাকে প্রবাদের কথাই ধরে নিতে হবে– 'কুকুরের কাজ কুকুর করবে, সে পায়ে কামড় দেবে আর পাগলা কুকুর হলে তো কামড়ানোর জন্য সবসময়ই পাগল থাকবে। তাই বলে কুকুরকে কামড়ানো তো মানুষের জন্য শোভনীয় হবে না।' আব্দুল গাফ্ফার লন্ডনে বসে আমার বিরুদ্ধে লিখে দু'একশো পাউন্ড আয় রোজগার করে খেয়ে পরে বেঁচে থাকুন– তাতে আমার আর কোনো আপত্তি থাকবে না। তবে তার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে– ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধে লেখার ক্ষেত্রে অন্তত ভদ্রতাটুকু বজায় রাখার চেষ্টা করবেন– যদি ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ থাকে।

আমি এবার আব্দুল গাফ্ফারের অপপ্রচারমূলক বক্তব্যের প্রসঙ্গে আসতে চাই। তার কুৎসাপূর্ণ বক্তব্যের জবাব দিতে সত্যিই রুচিতে বাধছে এবং ওসব প্রসঙ্গে বেশি দূর যেতেও চাই না। তিনি লিখেছেন, 'বিদিশাকে তালাক দেওয়ায় এবং নানারকম মামলা মোকদ্দমা করে তাকে জোট সরকারের পুলিশের নির্মম নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেওয়ায় দেশব্যাপী মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং এরশাদ ও জোট সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেছে।' আমি আগেই বলেছি– এই আব্দুল গাফ্ফার একজন মিথ্যাচারী কলামিস্ট। এই বক্তব্যের মধ্যেও মিথ্যার বেসাতি করেছেন। প্রথমত বিদিশাকে তালাক দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো

www.pathagar.com

বিকল্প পথ খোলা ছিলো না। তারপর বাধ্য হয়েই আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে গেলে সে আমার শিশু সন্তান এরিককে ছয়তলা থেকে নিচে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছিলো। পুলিশের বুদ্ধিমত্তায় এরিক তখন প্রাণে রক্ষা রেয়েছে। পুলিশ দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে তাকে বুঝিয়ে থানায় নিয়ে এসেছে। সেখানে সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সে অসুস্থতার ভান করেছে– অথচ তার কোনো অসুখ ছিলো না। আমার জানামতে পুলিশ তার ওপর কোনো অত্যাচার করেনি। অসুস্থতার ভান করেই সে আইনের সহানুভূতি পেয়েছে। পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে থাকার সুযোগ পেয়েছে। তার অসুস্থতার অভিনয়কে সত্যি মনে করে কয়েকটি নারী সংগঠন তার পক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলনও করেছে। নারী নেত্রীরা অনেক জ্বালাময়ী কথাও বলেছেন। ওই সব নারী নেত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে কলামিস্ট আ ক ম রুহুল আমিন লিখেছিলেন যে, 'আর যা-ই হোক বিদিশা একজন সাধারণ সাবলীল মেয়ে বা মহিলা নন। তার জীবনের যে চিত্রগুলো আমাদের কাছে এসেছে তাতে তাকে বিকারগ্রস্ত দেহপসারিণী, ব্যভিচারিণী এবং বহু পুরুষ-সঙ্গমপ্রিয় একজন নষ্ট কুলটা মহিলা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। তারপরেও সে একজন মানুষ। তাই বলে অনুকরণীয় মানুষ এবং তাকে বা তার সকল ঘটনাকে এ দেশের সকল নারীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সিগমা হুদা যা বলেছেন, এটা কি সঠিক? যদি এটা তিনি সঠিক মনে করেন এবং তিনি যদি মনে করেন বিদিশা তার অনুকরণীয় কোনো বিষয় তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ কী মনে করবো? বিদিশার জীবন থেকে তিনি কেনো শিক্ষা গ্রহণ করবেন? নাকি সিগমা হুদা বিদিশার মতো ছিলেন? নাকি ভবিষ্যতে হবেন?' বিদিশাকে নিয়ে এ ধরনের বক্তব্য আরো এসেছে। সব কথা এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টে বলা হয়েছে– সে সম্পূর্ণ সুস্থ। এরপর বিদিশার পক্ষে যারা একটু সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। বিদিশাকে তালাক দেয়ায় বা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করায় দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়নি, কোথাও নিন্দার ঝড় ওঠেনি। ঝড় উঠেছে তাদের মনে, যারা তাকে গুপ্তচর হিসেবে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিলো। আমি স্বীকার করি– বিদিশাকে বিয়ে করা আমার ভুল ছিলো। স্বামী পরিত্যক্তা বা ডিভোর্সি একজন মহিলার প্রতি আমি সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছিলাম। গাফ্ফার চৌধুরীর ভাষা অনুসারে আমি যদি লাম্পট্যই করতাম তাহলে তো তাকে বিয়ে করতাম না। বিয়ে করে তাকে আমি একটি সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তার স্বভাব বদলাতে পারেনি। বিদিশা তো প্রথমে তার বাবার সহকর্মী বন্ধুকেই বিয়ে করেছিলো। সেই সংসার টেকেনি। এরপর অসম বয়সে আমি তাকে বিয়ে করেছি। এখন সে আমার তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে। গাফ্ফার চৌধুরীও নাকি তার বাবার বন্ধু। বিদিশার প্রতি তারও সহানুভূতি জাগতে পারে। দেশের মানুষের সহানুভূতি তিনি কোথায় দেখেছেন? বিদিশার মতো মহিলাকে বিয়ে করে যে ভুল

www.pathagar.com

আমি করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত আমার হয়েছে। তাকে তালাক দিয়ে আমি রাহুমুক্ত হয়েছি। আমি প্রাণে রক্ষা পেয়েছি এবং আমার পার্টিতে স্বস্তি ফিরে এসেছে। নেতাকর্মীরা উল্লসিত হয়েছে। বিভিন্ন দল থেকে নেতাকর্মীরা এখন জাতীয় পার্টিতে যোগদান করছে। আমার পার্টিতে প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে। বিদিশা বিতাড়িত হওয়ায় এটা কি ক্ষোভ বা নিন্দার বহিঃপ্রকাশ? গাফ্ফার চৌধুরীকে আমি আবার বলতে চাই দেশে এসে দেখে যান– এদেশের জনগণ আমার প্রতি ক্ষুব্ধ না তুষ্ট।

বিদিশা গ্রেফতার হওয়ায় আব্দুল গাফ্ফার সাহেবরা এটাকে অমানুষিক নারী নির্যাতন বলে বর্ণনা করেছেন। তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নিন্দার ভাষাও খুঁজে পান না! তাদের হৃদয় বিগলিত হয়েছে, মানবতাবোধ উথলে উঠেছে। কিন্তু সে দিন কোথায় ছিলো এই মানবতা যখন আমার বাচ্চা ছেলে সাদকে সাজানো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিলো? সেটা আওয়ামী পুলিশ দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো বলে বুঝি হালাল মনে হয়েছে। সাদ একটা নাবালক ছেলে। একা বাড়িতে ছিলো। আমি ছিলাম রংপুরে। ওর মা ছিলো ময়মনসিংহে। এই অবস্থায় আওয়ামী সরকারের দুই শতাধিক পুলিশ রাতে আমার বাড়ি ঘেরাও করে শিশু ছেলে সাদকে ধরে নিয়ে আসে। ছেলেটা ভয়ে বাকশূন্য হয়ে পড়েছিলো। সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলাম বলে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সাজানো মামলায় আমার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। থানা হাজতের ফ্লোরে তাকে ফেলে রাখা হয়েছিলো। আইনের কাছে মিথ্যা মামলা টেকেনি বলে সাদ মুক্তি পেয়েছিলো। সেদিন তো এই শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আব্দুল গাফ্ফারের কলমে নিন্দার কোনো ভাষা ফুটে ওঠেনি। তখন কি গাফ্ফার সাহেবরা মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন? শিশুর প্রতি কোনো মমতা নেই অথচ নারীর প্রতি ভালোবাসার সাগর বইয়ে দিচ্ছেন গাফ্ফার সাহেবরা। আর নারীঘটিত সব দোষ হলো গিয়ে আমার!

গাফ্ফার সাহেব লিখেছেন যে, আমার নাকি সব কিছুই ভেজাল। আমার কবিতা, লেখা এমনকি আমার সন্তানও। এমন কথাও লিখেছেন যে বিদিশার গর্ভজাত সন্তান এরিকের পিতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আমার বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হয়েছে। গাফ্ফার সাহেব এখানে আমার পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চান। বিদিশাকে তো ওনার বন্ধু-কন্যা বলে পরিচয় দেন। তিনি তার বন্ধু-কন্যার গর্ভের সন্তান নিয়ে যদি প্রশ্ন করতে চান, তাহলে অর্থটা কী দাঁড়ায় তা পাঠকরাই বিবেচনা করুন। গাফ্ফার চৌধুরীরও একজন বাপ ছিলো। তার পিতৃত্ব নিয়ে যদি প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে কেমন লাগবে। তাছাড়া ওনার নিজেরও সন্তান আছে। সপরিবারে থাকেন লন্ডনে। সেখানে সমাজ ব্যবস্থা কী রকম, তা কম-বেশী সবাই জানেন। ওখানে একটা কথা প্রচলন আছে যে, তিন ডব্লিউতে কোনো বিশ্বাস নেই– work, weather এবং women। ওয়ার্ক এই আছে এই নেই, ওয়েদার কখন কী রকম থাকবে কোনো ঠিক নেই। আর ওমেন কখন

www.pathagar.com

কার তাও ঠিক থাকে না। সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছেন গাফ্ফার। তার ও সন্তানসন্ততি আছে বা থাকতে পারে। এখন তাদের পিতৃত্ব প্রমাণ করতে গাফ্ফার চৌধুরীকেই যদি ডিএনএ টেস্ট করে নিতে বলা হয়, তাহলে সেটা কি ভদ্রলোকের খুব খারাপ লাগবে?

গাফ্ফার সাহেব লিখেছেন, 'আমি পৌনে ১০ বছর বন্দুক হাতে দেশটাকে শাসন করেছি, সংবিধানের অমর্যাদা করেছি, ইতিহাসে প্রবেশ করেছি। তাই ইতিহাস আমার বিচার করবেই।' স্বীকার করি যে, ইতিহাসে আমি প্রবেশ করেছি। ইতিহাস আমাকে বিচার করুক সে প্রত্যাশা আমিও করি। আমি চাই ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন। কিন্তু আপত্তিটা তখনই আসে যখন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। আমার ব্যাপারে সে কাজটিই করছেন গাফ্ফার সাহেবরা। তিনি এই দেশের মানুষের সংস্পর্শে নেই। দেশের সাধারণ মানুষের ভাষা-সুর, তাদের মনের কথা, সুখ-দুঃখ সম্পর্কে খবর রাখেন না। আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে দেশের কিছু পত্রিকা তিনি লন্ডনে বসে পড়তে পারেন। পত্রিকার খবর নিয়ে তিনি পর্যালোচনা করেন। কিছু গাল-গল্প লিখে পাঠান। পত্রিকায় তা ছাপা হয়। একটি পত্রিকা দেশের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে পারে না এবং সম্ভবও নয়। তার বন্ধুরা টেলিফোনে দেশের সামগ্রিক চিত্র জানাতে পারেন না –প্রায় লেখাতেই দেখা যায় এক বন্ধু তাকে টেলিফোনে জানান। আপনি দেশে অন্তত বেড়াতে এসে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যান, সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলুন– শুনুন তাদের অভিমত। জেনে যান এ দেশের সাধারণ মানুষ আমাকে নিয়ে তাদের মনে কী ইতিহাস রচনা করে রেখেছে। আপনারা আমার ইতিহাসের উপর কালি ছিটাচ্ছেন। অভদ্রোচিত ভাষায় আমাকে গালাগালি করছেন। লম্পট-বিশ্ববেহায়াসহ কত না ভাষায় গালি দিচ্ছেন। এদেশের কোনো নারী কি আমার বিরুদ্ধে লাম্পট্যের অভিযোগ করেছে? নারী সমাজ কি আপনার কাছে অভিযোগ করে এসেছে যে আমি তাদের সাথে লাম্পট্য করেছি? আপনার মনে হলো আর লিখে দিচ্ছেন যে আমি লম্পট। আর আমি আপনার কথায় লম্পট হয়ে গেলাম? আমার যদি মনে হয় আপনি এদেশ থেকে চুরি করে গণপিটুনির ভয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন– তাতে কি আব্দুল গাফ্ফার চোর হয়ে যাবেন? আমাকে লম্পট বলে প্রকারান্তরে আপনি নারীদেরই অপমান করছেন। কারণ একজন পুরুষ নারীর সাথেই লাম্পট্য করতে পারে। নারী কি এতই সহজলভ্য বিষয় যে, তাদের সাথে ইচ্ছা করলেই লাম্পট্য করা যাবে এবং তারা মুখ বুজে সহ্য করবে? আমার লেখায় গাফ্ফার চৌধুরীকে দ্বিমুখী চরিত্রের লোক বলেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন আমি নাকি নিজের চরিত্র খুঁজেছি তার মধ্যে। এটা যদি হয় তাহলে একথাও বুঝতে হবে তার নিজের লম্পট-চরিত্রের চিত্র এঁকেছেন আমার নামে। গাফ্ফার চৌধুরী জানেন না বা জানলেও চেপে যাবেন যে, এদেশের নারী সমাজের কল্যাণে আমি যতো কাজ করেছি আর কোনো সরকার তা করতে পারেনি। আর তার জন্যই আমি যখন জেলে ছিলাম তখন এ দেশের লাখো লাখো নারী আমার মুক্তির জন্য

www.pathagar.com

নফল নামাজ পড়েছে, রোজা রেখেছে। মায়ের বোনের মমতা নিয়ে আল্লাহর কাছে আমার মুক্তি প্রার্থনা করেছে। গাফ্ফার চৌধুরী এসবের কী জানবেন। তিনি একজন পক্ষপাতদুষ্ট বিচার বিবেকহীন মানুষ। এই একচোখা মানুষটিকে আমি জানাতে চাই যে, বাংলাদেশের মাটিতে বন্দুকের জোরে শাসন করা যায় না। ইতিহাস তা বলেও না। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় গিয়েও মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এ মাটিতে কেউ টিকতে পারেনি- ইতিহাস তার সাক্ষী। আমি ক্ষমতা গ্রহণ করেছি নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের অনুরোধে। সেটা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি না হলেও একমাত্র উদাহরণ নয়। আমার আগেও এভাবে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। কথায় আছে জন্ম হোক যত্র-তত্র কর্ম হোক বড়। আমি কর্মকেই বড় করেছি। কর্মই আমার সোনালী ইতিহাস গড়ে দিয়েছে। আমার আগে জিয়াউর রহমান নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতায় আসেননি। কিন্তু তিনিই এদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন। তার আগে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার বহুমতের গণতন্ত্রের গলাটিপে হত্যা করে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করেছিলো। কোন কর্মটা শ্রেষ্ঠ সে বিচারের রায় আব্দুল গাফ্ফার দিতে পারবেন না- কারণ তিনি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। রায় দেবে এদেশের জনগণ। আর সেই রায় পাওয়া গেছে বলেই গণতান্ত্রিকভাবে জিয়াউর রহমানের দল একাধিকবার ক্ষমতায় এসেছে। দেশ পরিচালনায় নেতৃত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা কী আছে সেটা পরের কথা। জনগণ একাধিকবার তাদের পক্ষেই রায় দিয়েছে। আমি গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করিনি সত্য- কিন্তু আমার শাসনামলে দেশের মানুষ সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি-উন্নতি-অগ্রগতি যুগান্তকারী সংস্কার পেয়েছে বলেই ৯ বছর দেশ পরিচালনা করতে পেরেছি। গণতান্ত্রিক পরিবেশে বলতে যা বোঝায় জনগণ তা আমার আমলেই অনুভব করেছে। গত ১৪ বছরের অবস্থা আমার আমলে ছিল না। বন্দুকের জোরে দেশ পরিচালনা করা যায় না। জোর করে ক্ষমতাও নেয়া যায় না। যে কেউ ইচ্ছা করলেই কি জোর করে ক্ষমতা নিতে পারে? পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সময়ের দাবিতে অনিয়মতান্ত্রিকভাবেও ক্ষমতার রদবদল হতে পারে। তারপর সেটা সংবিধানসম্মত করারও বিধান আছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ কী করেছে? দেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম করেছে আপামর জনতা। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে দু'একটি রাজনৈতিক দল বাদে সকল রাজনৈতিক দল। কিন্তু স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার গঠিত না হয়ে শুধু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করলো কেন? সেটা কি জোর করে ক্ষমতা দখল হয় না? জাতীয় সরকার সংবিধান প্রণয়ন করলে সেটাই হতো সকল দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান। কিন্তু সংবিধান প্রণয়ন করেছে এককভাবে আওয়ামী লীগ। আর সে কারণেই বারবার সংবিধানে সংশোধনী আনতে হয়েছে। আমি ৯ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে ২ বার সংবিধান সংশোধন করেছি। এতেই যদি সংবিধানকে অমর্যাদা করা হয়- তাহলে বাকি ১১ বার যারা সংবিধান সংশোধন করেছেন- তারা কি সংবিধানকে মর্যাদাবান করেছেন? যারা সংবিধান প্রণয়ন

www.pathagar.com

করেছেন তারাই তো প্রথমে সংবিধানের উপর বড় ছুরি চালিয়েছেন। দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের মতো কালো অধ্যায় আর কী ছিলো? সেটা সংবিধানে সংযোজন করেছে কারা? অতএব জনাব আব্দুল গাফ্ফার নিজেদের গায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন। দেশ পরিচালনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন-সমৃদ্ধির রাজনীতির কাছে গাফ্ফার চৌধুরীরা হার মানেন বলেই আমার ব্যক্তি চরিত্রের ওপর কালি ছিটাতে থাকেন। আমাকে হেয় করার জন্য ফন্দি-ফিকির করতে থাকেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। আমি রাজনীতি করি জনগণের জন্য, জনগণ আমার পক্ষে আছে। অপপ্রচার করে ফায়দা লুটতে পারবেন না। আমি এদেশের জনগণেরই প্রতিনিধি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেলে ছিলাম। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। কিন্তু জনগণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। জেলে বসে দুইবার ৫টি করে আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছি। বিশ্বের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন না ক'জন রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রনায়ক এই ইতিহাস গড়তে পেরেছে। ইতিহাসের বিচারের কথা বলেন গাফ্ফার সাহেব। বিচারের কী বোঝেন আপনি? যদি বুঝতেন তাহলে জনগণের বিচার সবার আগে পর্যালোচনা করতেন। জনগণের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ এবং তার নামে কুৎসা প্রচার করে জনগণকেই আপনি অপমান করছেন। রাষ্ট্র এবং সরকার এক বিষয় নয়– এটা সত্য। কিন্তু আপনি বিদেশে বসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন। সে জন্যই বলেছি আব্দুল গাফ্ফারা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজ করেন। আমি দেশের জনগণের কাছে ছিলাম এবং আছি, থাকবোও। আর গাফ্ফার চৌধুরীকে প্রবাসী জীবনই কাটাতে হবে। বিদিশার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উনি লিখেছেন– দেশবাসীর সহানুভূতি নাকি সব তার দিকে আর মানুষ নাকি আমাকে নিন্দা জানাচ্ছে– কিন্তু এ সবকিছু পরিমাপ করার বিষয়টি তো জনমত। ফিরে তাকান সেই জনমতের দিকে।

সম্প্রতি সুনামগঞ্জে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে আমার প্রার্থী ছিলো। অর্থাৎ আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। সামনে খুব বেশি সময় নেই। আমাদের খুব ভালো প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাই দলে একজন নতুন যোগদানকারীকে সেখানে মনোনয়ন দিয়েছিলাম। আমি একদিন সেখানে গিয়ে জনগণের সামনে আমার প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। তাতেই তিনি ভোট পেয়েছেন প্রায় ২১ হাজার। গত সাধারণ নির্বাচনে এই আসনে জাতীয় পার্টি ভোট পেয়েছিলো ১৭ হাজার। উপনির্বাচনে সব দলের ভোট কমেছে কিন্তু আমার ভোট বেড়েছে। অথচ এই সময় বিদিশাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো। গাফ্ফার সাহেবদের ভাষায় বিদিশার প্রতি নাকি দেশবাসীর হৃদয় বিগলিত হয়েছে– আর আমার প্রতি নাকি ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। তার কথা যদি সত্য হয় তাহলে সব দলের ভোট যেখানে কমেছে, সেখানে আমার ভোট বাড়লো কীভাবে? জানি না আমার ব্যাপারে গাফ্ফার সাহেবদের মিথ্যার বেসাতি থামবে কবে। এই ভদ্রলোককে যারা

www.pathagar.com

চেনেন-জানেন তাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, টাকার বিনিময়ে ওনাকে দিয়ে যা কিছু লেখানো সম্ভব। এবং কাজটি তিনি শৈল্পিকভাবেই সম্পন্ন করতে পারেন। এটাও জানি না যে, এখানে ওনার প্রযোজক কারা। আব্দুল গাফ্ফার আমাকে নিয়ে লিখতে গেলেই 'বিশ্ববেহায়া' বলেন। শিল্পী কামরুল হাসানের উদ্ধৃতি দেন। দুঃখের বিষয় হলো এই শিল্পী আজ বেঁচে নেই। বিশ্ববেহায়া চিত্রটি এঁকেই তিনি মৃত্যুর কোলো ঢলে পড়েন। বেঁচে থাকলে হয়তো বলতে পারতেন– চিত্রটি তিনি কাকে উদ্দেশ করে এঁকেছিলেন। যদি আমাকে উদ্দেশ করেই এঁকে থাকেন তাহলে আমার পরবর্তী শাসনামল দেখে যে চিত্র তাকে আঁকতে হতো, তা দেখে লন্ডনী বিশ্ববেহায়াদেরও কেঁপে উঠতে হতো। শিল্পী কামরুল হাসান যখন অসুস্থ তখন আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন যে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আমার প্রতি প্রকাশ করেছিলেন – তিনি বেঁচে থাকলে তা এখানে উল্লেখ করতাম। এখন সেকথা বললে কেউ কেউ হয়তো আমাকে গাফ্ফার চৌধুরীর সাথে তুলনা করবেন। কারণ তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অপ্রকাশিত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন।

আব্দুল গাফ্ফার আমাকে নিয়ে যতোটুকু রাজনৈতিক সমালোচনা করেছেন, আমি শতবার তার জবাব দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি লিখেছেন, 'এরশাদ তো এখনো বেঁচে আছেন। রেজাশাহ, মার্কোস, ফ্রাঙ্কো তো মারা যাওয়ার পরও ক্রমাগত মানুষের ধিক্কার ও নিন্দা কুড়াচ্ছেন। এরশাদ বাংলাদেশের ইতিহাসে যে নষ্টামি করেছেন তার আলোচনা থেকে বেরুবেন কী করে? মিথ্যা সাফাই গেয়ে কতোজনের মুখ বন্ধ করবেন?' না, আমিও বলি গাফ্ফার সাহেবদের মুখ বন্ধ করা যায় না– করতেও চাই না। কাকের মুখ সোনা দিয়ে বাঁধিয়েও কুৎসিত কা-কা রব বন্ধ করা যায় না, কুখাদ্য ভক্ষণ থেকে বিরত করা যায় না। গাফ্ফার কাকের দল বাংলাদেশে ভালো কিছু দেখতে চাইবে না– দেখবেও না। ওরা বিষ্ঠায় ঠোকর দেবেই। দেশ পরিচালনায় ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। তবে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের শাসনামলের ইতিহাসে এযাবৎকাল সময়ের মধ্যে আমার শাসনামলই ছিলো শ্রেষ্ঠ। ইতিবাচক সকল ক্ষেত্রে রচনা করেছি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। তার বর্ণনা এখানে নিস্প্রয়োজন। গাফ্ফার সাহেবদের ভালো লাগবে না, তবে দেশের মানুষ তা জানে এবং বিশ্বাস করে। সাধারণ মানুষের কথায় কান পেতে রাখুন– সত্যি কথা অবশ্যই শুনতে পাবেন। আগের লেখায় আমি সুশাসন দেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলাম বলে গাফ্ফার সাহেব লিখেছেন– 'আস্তে কন সাহেব ঘোড়ায় হাসবে'। আমি বলি গাফ্ফার সাহেব শোনেন– আমার সুশাসনের কথা শুনে দেশের মানুষ সায় দেবে। কোনো ঘোড়া হাসবে না– তবে বিদেশে আশ্রয় নেয়া গাধা কাঁদতে পারে। কারণ মালিকের অবস্থা ভালো হলে গাধাকে একটু বেশি বোঝা বইতে হয়। ভালো কিছু নিয়ে কি বিরূপ সমালোচনা করা যায়? যারা রেজা-মার্কোসের সাথে আমার তুলনা করেন– তারা এদেশের জনগণকেই

www.pathagar.com

অপমান করেন। রেজা-মার্কোস-ফ্রাঙ্কোরা দেশের মানুষের নিন্দা কুড়াচ্ছে, কিন্তু আমার কর্মের জন্য আমি প্রশংসিত হয়েছি। আমার শাসনামলের উন্নয়ন সমৃদ্ধি সংস্কার দেশের মানুষ এখানো উপভোগ করে। আর তার জন্যই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছি।

গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন আমি নাকি আল্লাহ খোদাকে জড়িয়ে মিথ্যা বলেছি। আমি নাকি প্রত্যেক শুক্রবার নামাজ পড়তে গিয়ে বলতাম আগের রাতে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মসজিদে নামাজ পড়তে এসেছি। এই অভিযোগের জবাব দেয়াটা প্রয়োজন মনে করছি। কারণ গাফ্ফার সাহেব এখানেও সত্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। বিকৃত সত্য মিথ্যারই নামান্তর। প্রকৃত সত্য হচ্ছে– ক্ষমতায় থাকাকালে শুক্রবার কোন্ মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করবো তা আগেই নির্ধারিত থাকতো। ফলে সেখানে আগে থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। স্থানীয় লোকজনও জানতো যে আমি তাদের মসজিদে নামাজ পড়তে যাবো। এহেন অবস্থায় প্রত্যেকবার আগের রাতে স্বপ্নাদেশ পেয়ে নামাজ পড়তে এসেছি– এ ধরনের কথা বলাটা কোনো রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব কি না, তা বিবেচনা করে কথা বলা উচিত। নামাজ পড়তে যাওয়ার স্বপ্নের কথা একবার আমি বলেছিলাম সত্য– তবে তা একাধিকবার নয়। যা বলেছিলাম তা ওভাবেও নয় এবং যেটা বলেছিলাম সেটা সত্যই বলেছিলাম। আমি একজন কর্মঠ রাষ্ট্রপতি ছিলাম। রাত ১টার আগে কোনো দিন বিছানায় যেতে পারতাম না। শুতে যাবার আগে দেখে নিতাম পরের দিনের কর্মসূচি। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। নানা কাজে খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। সোফায় ঘুম-ঘুম অবস্থায় বসে দেখলাম– পরের দিন কোনো এক মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যাওয়া ছাড়া আর তেমন কোনো কর্মসূচি নেই। নামাজ পড়তে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর স্বপ্নেও দেখি একটি মসজিদে নামাজ পড়ছি। এভাবে কোনো কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লে ক্লান্তির কারণে তা আবার স্বপ্নে দেখা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে এবং এখনও আমার ক্ষেত্রে ওই ধরনের ঘটনা ঘটে। সেদিন আমি নামাজ পড়তে গিয়ে বলেছিলাম– আজ এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসবো তা গত রাতে আমি স্বপ্নেও দেখেছি। এই কথাটিকে বিকৃত করে গোয়েবল্সের উত্তরসূরিরা প্রচার করে বেড়াতে থাকে যে, আমি নাকি প্রত্যেক শুক্রবার বলতাম– স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মসজিদে নামাজ পড়তে এসেছি। আল্লাহ-খোদার দোহাই দিয়ে বিকৃতকারীরা এভাবেই মিথ্য প্রচার করে যাচ্ছে। উল্লিখিত নিবন্ধের দুই সিরিজে আব্দুল গাফ্ফার অনেকবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। হয় তিনি সচেতনভাবে কল্পনায় তথ্য বানিয়েছেন, অথবা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা কথা লিখেছেন। এখানে তার কয়েকটা উল্লেখ করতে চাই। এক. যেমন তিনি লিখেছেন– আমি বিদিশার নামে একগাদা মামলা দিয়ে ওমরাহ করার নামে সৌদি আরবে পালিয়েছি। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার সৌদি আরব যাওয়া ছিলো পূর্বনির্ধারিত। প্রতি ৬ মাস অন্তর মেডিকেল

www.pathagar.com

চেকআপের জন্য সৌদি আরবের কিং ফয়সাল হাসপাতালে যাই। সৌদিতে গেলে একজন মুসলমান হিসেবে ওমরাহ পালন করা ফরজ বলেই মনে করি। তাই প্রত্যেকবার সেখান থেকে ওমরাহ করে আসি। অথচ এ সম্পর্কে তিনি মিথ্যা কথা লিখেছেন। দুই. তিনি লিখেছেন–পুলিশ বিদিশার উপর হামলে পড়েছে। তাকে টানা-হ্যাঁচড়া করেছে, অত্যাচার করেছে। একথাটাও মিথ্যা। তিন. আব্দুল গাফ্ফার আরো লিখেছেন– আমি নিজে বাঁচার জন্য বিদিশাকে হায়েনার মুখে ঠেলে দিয়েছি এবং আমি নাকি সরকারের ব্ল্যাকমেইলিং-এর শিকার হয়েছি। আমি নিজে বিদিশার হাত থেকে বাঁচার জন্য তাকে তালাক দিয়েছি– এটা সত্য। তবে সেটা একান্তই ব্যক্তিগত। তাকে আমি হায়েনার মুখে ঠেলে দিইনি। সরকারের ব্ল্যাকমেইলিং-এরও শিকার হইনি। বিদিশা আমাকে তিলে তিলে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। সংসার জীবনের সেই কালো অধ্যায়গুলো আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না। আমি তাকে তালাক দিয়ে বেঁচে গেছি বলেই যারা আমাকে মারার ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের মধ্যে গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। বিদিশা প্রসঙ্গকে যারা রাজনৈতিক আখ্যা দিচ্ছেন, তারা চরমভাবে মিথ্যাচার করছেন। চার. আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে তার দুরবস্থা দেখে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা দেয়ার প্রসঙ্গটিকে আব্দুল গাফ্ফার মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন– কবি আবু বকর নাকি প্রতিবাদ করেছেন যে, এটা ডাহা মিথ্যা কথ্যা। কিন্তু আমি বলছি– এই কথাটি ধ্রুব সত্য। আমার কথার প্রমাণ আমি হাজারবার দিতে পারবো। কারণ টাকাটা আমি নগদে দেইনি। এই টাকাটা আমার একাউন্ট থেকে প্রতি মাসে বিদিশার বাবার একাউন্টে পাঠানো হতো। যদি জানতে চান তাহলে গাফ্ফার সাহেবকে জানাতে পারবো– কোন ব্যাংকের কোন একাউন্টে মাসের কতো তারিখে আমার কোন একাউন্ট থেকে আবু বকর সাহেব এই টাকা পেতেন এবং কবে তা উত্তোলন করতেন। আমি কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করলে তা আবার প্রচার করাটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তাকে অন্তত তার মেয়ের সাথে মিলাতে পারিনি। তার সাথে আমার কী সম্পর্ক ছিলো তা ওনি আর আমি জানি। কিন্তু সেই ব্যক্তি আমার নামে কটূক্তি করায় আমি আহত হয়েছি। সে কারণেই বলেছিলাম যার জন্য আমি এতোটা করেছি এবং যিনি তার মেয়ে সম্পর্কে জানেন তিনি কিভাবে এধরনের কথা বলেন। সত্য প্রকাশ করে তাকে আমি হেয় করতে চায়নি। তার কটূক্তি আমাকে কথাটা প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে। পাঁচ. আব্দুল গাফ্ফার লিখেছেন– 'এরশাদ সাহেব দশ বছর যাবৎ ক্ষমতায় বসে দেশের অর্জিত কতো মিলিয়ন পাউন্ড ও ডলার বিদেশের একাউন্টে পাঠিয়েছেন সে সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?' আমি নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে বলতে চাই। কোনো বিদেশী ব্যাংকে মিলিয়ন-বিলিয়ন তো দূরের কথা, একটি পয়সাও যদি দেখাতে পারেন তাহলে আমি রাজনীতিই ছেড়ে দেবো। আর যদি প্রমাণ দিতে না পারেন তাহলে আপনি কী করবেন সেটা লেখার মাধ্যমে জানাবেন। এবং প্রমাণ করতে হবে

www.pathagar.com

আপনাকেই, যেহেতু অভিযোগটা আপনি উত্থাপন করেছেন। ছয়. বিসিসিআই ব্যাংকের সাথে আমার সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করেছেন আব্দুল গাফ্ফার। এখানেও তিনি মিথ্যাচার করেছেন। আমার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য বিশ্বখ্যাত তদন্ত সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্সকে পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছিলো। কিন্তু অভিযোগের কোনো প্রমাণ মেলেনি। অথচ গাফ্ফার সাহেবরা ক্রমাগতভাবে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। সাত. গাফ্ফার সাহেব আর একটি প্রশ্ন করেছেন যে– মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার ভূমিকা কী ছিলো। উত্তর হলো– আমি বন্দি ছিলাম। একজন বন্দি যুদ্ধে কী ভূমিকা রাখতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি এটা ঠিক। সে দুঃখ আমি বহুবার ব্যক্ত করেছি। কিন্তু যখন সুযোগ পেয়েছি তখন মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আমিই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি। সে কথা এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা স্মরণ করেন। সে সব দেখার ব্যাপারে আব্দুল গাফ্ফাররা তো অন্ধ। আর শোনাতে গেলে সাজবেন কানা। আর বোঝার জন্য মনের দিক থেকে পঙ্গু। তাই এই বিকলাঙ্গকে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা নেই সত্য, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমার অসীম অবদান রয়েছে– যা দেশবাসী জানে। জেনারেল ওসমানীর নির্দেশেই যে আমি পাকিস্তান থেকে পালানোর চেষ্টা করিনি– সে কথা ওসমানী সাহেব নিজেই বলে গেছেন। আমি নাকি জেনারেল শফিউল্লার কৃপায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ঢোকার সুযোগ পেয়েছি। এ কথাকে নির্মল মিথ্যা বলে বর্ণনা করবো না পাগলের প্রলাপ বলবো– বুঝতে পারছি না। এই জ্ঞানপাপীর জানা উচিত– সেনাবিভাগ এমন একটি জায়গা যেখানে কারো সুপারিশে ঢোকার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সে সময়ে পাকিস্তান থেকে আমরা যারা সেনা সদস্য দেশে ফিরেছিলাম, তাদের মধ্যে যাদের চাকরির বয়স ছিলো তাদের সবাইকেই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবার পর শেখ সাহেবই আমাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠিয়েছিলেন।

আব্দুল গাফ্ফার আরো একটি মজার কথা লিখেছেন যে, 'এরশাদ সাহেব কী করেছেন? সেনাপ্রধান হিসেবে দেশের সংবিধান ও নির্বাচিত সরকারকে রক্ষার জন্য যে শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন সেই শপথ ভেঙে, ষড়যন্ত্র করে বন্দুকের সাহায্যে বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন।' গাফ্ফার সাহেব এতো কিছু জানেন আর এটা জানবেন না যে, সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিতে শপথবাক্য পাঠ করতে হয় না– এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না। আসলে উনি মিথ্যাচারকে সত্যের মতো করে উপস্থাপন করার জন্য একটি মিথ্যা যুক্তি উত্থাপন করেছেন। কেন ক্ষমতা গ্রহণ করেছি– সে কথা পূর্বেই বলেছি। পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো এবং আমি তা যথার্থভাবে পালন করেছি। এই দায়িত্ব পালনকে গাফ্ফার সাহেবরা যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলেন, তাহলে এর বিপরীতে দেশকে ধ্বংস করাই কি হচ্ছে দেশপ্রেম? সেই প্রেম

www.pathagar.com

গাফ্ফার সাহেবদের থাকলেও থাকতে পারে, আমার মধ্যে নেই। আমি আবারও বলতে চাই– বিপর্যস্ত দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম বলেই ৯ বছর ক্ষমতায় থাকতে পেরেছি এবং এখনও রাজনীতিতে টিকে আছি।

অনেক কথাই লিখেছেন আব্দুল গাফ্ফার। সব কথার জবাব দেয়ার মতো ধৈর্য এবং সময় আমার হাতে নেই। তারপর পেশাদার লেখকও আমি নই। আবার লিখলেও বলবেন– এসব তো আমি লিখি না। ক্ষমতায় থাকাকালে নাকি গাফ্ফার সাহেবদের ভাষায় মোসাহেব-কবিরা আমাকে কবিতা লিখে দিতেন। যাক, এখন তো ক্ষমতায় নেই, আর মোসাহেব কবিরাও নেই। কিন্তু কবিতা লিখছি। আমি লেখালেখি করি কি না– সে সার্টিফিকেট গাফ্ফার চৌধুরীর মতো কল্পনাশ্রয়ী লেখকের কাছ থেকে নিতে হবে না। তিনি লিখেছেন– আমার লীলাখেলা লিখলে নাকি মহাভারত হয়ে যাবে। লিখুন না, রামায়ণ-মহাভারত যা হয় একটা লিখে ফেলুন। বাল্মীকি বা ব্যাসদেব হয়ে যাবেন। আপনার লেখা পড়ে মানুষ পুণ্য অর্জন করবে। আপনিও সেই সুবাদে পূজিত হবেন। যে হারে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে লিখতে পারেন তাতে রামায়ণ-মহাভারত লেখা তো আপনার জন্য নস্যি। শাস্ত্রে আছে– রাম জন্মের ষাট হাজার বছর আগে রামায়ণ রচিত হয়েছে। বাল্মীকির কল্পনায় কি রকম জোর আছে দেখুন। আপনি কিন্তু তার চেয়ে কয়েক কাঠি উপরে আছেন। আমাকে নিয়ে লিখতে আপনার সত্যের ধারে কাছেও যেতে হয় না। যা খুশি তাই লিখে যাচ্ছেন, যা মনে আসে তাই বলে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতো 'লেখক তবো মনোভূমে যা রচিবে– সেটাই সত্য বলে জানিবে সবাই।'

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ এবং আজকের প্রেক্ষাপট

'তেলের শিশি ভাঙ্গলো বলে খুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যেসব ধেঁড়ে-বুড়ো বাংলা ভেঙ্গে ভাগ করো'– আজ থেকে একশ' বছর আগে এই ছড়াটি লেখা হয়েছিলো। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ছড়া। বাংলার মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং স্বাধিকার অর্জনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিলো যে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে, সেই মূর্ত প্রতীক বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ছড়া লেখকরাই জয়যুক্ত হয়েছেন। ভাঙ্গা বঙ্গ জোড়া লেগেছে। তবে জোড়া লাগার দাগটি মুছে যায়নি। বঙ্গভঙ্গ বাংলার মুসলমানদের জীবনে এমন এক গুরুত্ববহ ঘটনা যা তাদের চরম বিপর্যয় মোকাবেলা করে স্বাবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ঘটনাপ্রবাহ তাদের শিখিয়ে দিয়েছে– জাতীয় জীবনে টিকে থাকতে হলে শক্তি সাহস ঐক্য সংহতি অর্জন করে আত্ম-নির্ভরশীল হতে হবে। ১৯০৫ থেকে ২০০৫। মাঝখানে শতবর্ষের ব্যবধান। প্রায় পুরো একটি শতাব্দীর দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে নতুন আর একটি শতাব্দীর সূচনালগ্ন এখন। অনেক উত্থান-পতন-বিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে। মহাপ্রলয়ের বিশ্বযুদ্ধ দেখতে হয়েছে, বৃটিশ আর পশ্চিমা পাঞ্জাবিদের বিতাড়িত করে দু'বার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে আমাদের। এখন প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করছি আমরা। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বৃটিশ শাসনাধীনের মধ্যেও বঙ্গের মুসলমানেরা আশার আলো দেখেছিলো। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে সিরাজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যই কেবল অস্তমিত হয়নি, এই ভূখণ্ডে সাড়ে ৫শ' বছরের মুসলিম শাসনেরও অবসান ঘটেছে। ১২০০ খৃস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গদেশ জয় করে এখানে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সেই শাসনক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যায় ১৭৫৭ সালে। শুরু হয় পরাধীন জীবন। বৃটিশ শাসনাধীনে মুসলমানরাই নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছে বেশি। বৃটিশরা এই উপমহাদেশের শাসনদণ্ড মুসলমানদের হাত থেকেই কেড়ে নিয়েছে। এই উপমহাদেশের হিন্দুরা বৃটিশদের অধীনে থেকেও তারা অধিকার সচেতন হয়ে নিজেদের ভিত মজবুত করতে থাকে। তারা মুসলিম শাসনাধীন থেকে বৃটিশদের শাসনাধীনে চলে গেছে। ফলে মুসলমানদের মতো যন্ত্রণা তাদের মধ্যে ছিলো না। মুসলমানরা ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রণা এবং নিজেদের গোঁড়ামির কারণে হিন্দুদের চাইতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক

www.pathagar.com

থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে। যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে যখন কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছিলো তখন মুসলমানদের সামনে বঙ্গভঙ্গের মতো যুগান্তকারী ঘটনাটি সমাগত হয়। সেই সময়কার মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। আমি মনে করি বঙ্গদেশের মুসলমানদের সেটাই ছিলো প্রথম সবচেয়ে দূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপ। স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের জোরালো সমর্থক। তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, হিন্দু প্রভাবিত কোলকাতার ওপর নির্ভরশীল থাকলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা কখনোই অগ্রসর হতে পারবে না। আজ শতবর্ষ পরে সেই ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ওই সময়কার প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়। সেই সময়ের বঙ্গভঙ্গ ছিলো বাংলার মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে। তাই বলে বৃটিশরা যে মুসলমানদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো– তা নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়া। তখন ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো, তা রোধ করার জন্য বৃটিশরা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করে। মূল উদ্দেশ্য ছিলো কোলকাতা-কেন্দ্রিক আন্দেলন দুর্বল করা। অবিভক্ত বঙ্গে বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপ দানা বেঁধে উঠতে থাকলে শাসকরা হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির একটা পথ খুঁজছিলো আগে থেকেই। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতেই তারা বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করে। বৃটিশদের উদ্দেশ্য অসৎ হলেও বিষয়টি চলে যায় মুসলমানদের অনুকূলে। শাসকরা যুক্তি দেখান যে, উপমহাদেশের মধ্যে অবিভক্ত বাংলার আয়তন সবচেয়ে বড়। তখন এর আয়তন ছিলো প্রায় ২ লাখ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ছিলো ৭ কোটি ৮৫ লাখ। এতো বড় এবং জনবহুল প্রদেশ শাসন করা কষ্টকর ব্যাপার। অপরদিকে সেই তুলনায় আসাম এতো ছোট ছিলো যে, এটাকে একটি প্রদেশ হিসেবে শাসন করার যুক্তি ছিলো না। একইভাবে বিহার ও উড়িষ্যার আয়তনও বাংলার তুলনায় অনেক ছোট ছিলো। তাই প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তি দিয়ে বৃটিশরা বাংলাকে দুই অংশে বিভক্ত করে। বাংলার পূর্বাঞ্চলের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় একটি নতুন প্রদেশ। বাংলার অবশিষ্ট অংশ এবং বিহার-উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত হয় অপর প্রদেশ। ১৯০৫ সালের ১৫ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। ঢাকা হয় পূর্ববঙ্গের রাজধানী। তখন এই নতুন প্রদেশের আয়তন ছিলো ১ লাখ ছয় হাজার ছশ' পঞ্চাশ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ছিলো তিন কোটি দশ লাখ। অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিলো মুসলমান। এই নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যার র‍্যাম্পফিল্ড ফুলার। যার নামানুসারে ঢাকায় একটি সড়ক রয়েছে।

ভারতে নিযুক্ত বৃটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পালন করেছিলেন। এটা ছিলো তার শাসনামলের সবচেয়ে

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাসে লর্ড কার্জন বড় জায়গাটি দখল করে রেখেছেন এই বঙ্গভঙ্গের সুবাদে। বাংলার মুসলমানেরা বিভিন্ন কারণে সেদিন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তখন মুসলমান নেতারা অনুধাবন করেছিলেন যে, নয়া প্রদেশের শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করা যাবে। নিজেদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার হবে। অবহেলিত পূর্ব বাংলার উন্নয়ন ও অগ্রগতি হবে। শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। সে সময়ে বাংলার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবকিছু ছিলো কোলকাতাকেন্দ্রিক। এবং সেখানে ছিলো হিন্দুদের একচ্ছত্র আধিপত্য। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার বাস করতেন কোলকাতায়। তারা প্রজাদের কল্যাণে মনোযোগী ছিলেন না। প্রজাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে খাজনা আদায় করে কোলকাতায় বিলাসী জীবন যাপন করতেন। যেসব মুসলমান জমিদার ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই একই পন্থা অবলম্বন করতেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান নাগরিকরাই বেশি অবহেলিত থাকতো। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন এবং শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে। এই সময়ে মুসলমানেরা হারানো গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে। তাদের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে শুরু করে। ঢাকাকে কেন্দ্র করে সচিবালয়, পরিষদ ভবন, সরকারি অফিস-আদালত, ব্যবসা কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নতুন আশায় বুক বেঁধে জেগে উঠতে থাকে।

অপরদিকে গর্জে ওঠে কোলকাতাকেন্দ্রিক স্বার্থান্বেষী হিন্দুরা। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে কংগ্রেস ও বাংলার অন্যান্য হিন্দু নেতার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে কোলকাতাকেন্দ্রিক আইনজীবীরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বঙ্গভঙ্গে তাদের পেশাগত আয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে বলে আইনজীবীরা বেশি প্রতিবাদী হন। কারণ তখন বঙ্গবঙ্গের ফলে মামলা-মোকদ্দমায় উচ্চতর বিচারের জন্য সারা বাংলার মানুষকে আর কোলকাতায় যেতে হয় না। তাই উকিল সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে। কোলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী মহলও তাদের সাথী হয়। আমার শাসনামলেও এ রকম এক ঘটনার অবতারণা হয়েছিলো। আমি বিচার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নেয়ার জন্য যখন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজধানীর বাইরে চারটি বিভাগীয় শহরে স্থাপন করেছিলাম– তখন ঢাকার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন– এতে তাদের পেশাগত আয়ের গতি বাধাগ্রস্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমার সে সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে আমি আর অগ্রসর হইনি। সংসদে আইন পাস করে আমার সিদ্ধান্ত হয়তো বহাল রাখতে পারতাম, কিন্তু বিচার বিভাগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি সে পথে যাইনি। যা হোক, বঙ্গভঙ্গের কথাতেই ফিরে আসি। তখন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এতোটা তীব্র আকার ধারণ করেছিলো যে, বৃটিশ সরকার নাস্তানাবুদ

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীরা বঙ্গভঙ্গকে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ বলে বর্ণনা করেন। স্বাধীনতার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র বলে এই পদক্ষেপকে বর্ণনা করা হয়। বাংলার সর্বত্র বৃটিশ পণ্য বর্জনের স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। সে সময়ে এ দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এদিকে এই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে মুসলমানদের ব্যবহার করা হয় বলে হিন্দু নেতারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে বাংলায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখান থেকেই তিক্ততার জন্ম নেয়। বৃটিশদের ওই উদ্দেশ্যটি শেষ পর্যন্ত সফল হয়। বাংলার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে কোলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দুদের আন্দোলনেরই জয় হয়। হিন্দু বিক্ষোভের কাছে বৃটিশ সরকার নতিস্বীকার করে। তখন ভারত শাসন করছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। যার নামানুসারে হার্ডিঞ্জ ব্রিজটি নির্মিত হয়েছে। তার সময়ে বৃটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে আসেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে রাজা বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘোষণা দেন। এ সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের মধ্যে যে আশার আলো জ্বলে উঠেছিলো তা তিরোহিত হয়। তবে এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য বয়ে আনে সুদূরপ্রসারী ফল। তারই প্রতিক্রিয়ায় আজকের বাংলাদেশের অভ্যুদয়। মুসলমানদের মধ্যে জাগ্রত হয় স্বাতন্ত্র্যবোধ। বঙ্গভঙ্গের সুফল ভোগের কথা তারা কখনোই ভুলে যেতে পারেনি। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম– মুসলিম লীগ। বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিলো তা প্রশমিত করতেই ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগ দেয়া হয়। পূর্ববঙ্গবাসীর ক্ষোভ দূর করার জন্য ১৯২১ সালে বৃটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার প্রতীক বঙ্গভঙ্গ সেদিন রদ হলেও পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়েছিলো– তারই ধারাবাহিকতায় বাংলা আর অবিভক্ত থাকতে পারেনি। বৃটিশরা দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে দেয়াল তুলে দিয়েছিলো– সেখান থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব ছিলো না।

বাংলার মানুষ অতীতে শাসনক্ষমতা নিয়ে অতো মাথা ঘামায়নি। একনাগাড়ে সাড়ে ৫শ' বছর মুসলমানরা দেশ শাসন করেছে। কখনো হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি। বৃটিশ যে বিভেদের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিলো– তাতে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য পৃথক পৃথক দেশ গঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। এখন আমরা স্বাধীন দেশের বাসিন্দা। আমাদের ভাষাভাষী আর একটি জনগোষ্ঠী রয়েছে ভারতের অন্তর্গত একটি রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে। উভয় খণ্ডেই হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানে আছে। দুই বাংলাতেই কোনো

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক সংঘাত নেই। তবে শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়ে বাংলাভাষীরা যে দুই অংশে বিভক্ত আছে– এটাই উত্তম।

আজ বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ পরে ইতিহাস মন্থন করতে গিয়ে একটি কথাই বারে বারে মনে হয়– সেদিন যদি বঙ্গভঙ্গ না হতো কিংবা বঙ্গভঙ্গের পরে তা যদি রদ না হতো, তাহলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এখন কেমন থাকতো। যদি বঙ্গভঙ্গ না হতো তাহলে কোলকাতার আধিপত্যে পূর্ববঙ্গ কি সময়মতো জাগ্রত হতে পারতো? নিশ্চয়ই না। আবার যদি বঙ্গভঙ্গ রদ না হতো, তাহলে মুসলমানরা হয়তো তাদের সংগ্রামী চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারতো না। সে সময় পূর্ববঙ্গের মানুষকে খুশি করার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিলো। বঙ্গভঙ্গ শিক্ষা দিয়ে গেছে– প্রশাসনিক সংস্কার কোনো দেশে বা অঞ্চলে দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনে। সংস্কার কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় অবহেলিত সেক্টর। বঙ্গভঙ্গের কারণে যে নতুন প্রদেশ গড়ে উঠেছিলো– তার পরিপ্রেক্ষিতেই ঢাকাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিলো। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল। মাত্র ছয় বছর সময়। এ সময়ের মধ্যে ঢাকার যতোটা উন্নয়ন হয়েছিলো, তার আগে গোটা বৃটিশ শাসনামলে তা হয়নি। সংস্কারের উদাহরণ হিসেবে আমি নিজের গৃহীত পদক্ষেপের কথাও বলতে পারি। আমি ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করেছিলাম। ফলে নতুন জেলাসমূহকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেভাবে সেখানে দ্রুত উন্নতিও হতে থাকে। কিন্তু তখনও আমি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। বৃহত্তর জেলার যে মহলটি ব্যবসায়িক ও পেশাগত সুবিধাহানির আশঙ্কা করেছিলো– তারা মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করাটা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তবে আঞ্চলিক স্বার্থ মুখ্য হয়ে পড়ায় বিরোধিতাকারীরা সোচ্চার হবার সুযোগ পায়নি। তবে তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়েছিলাম বৃটিশ আমলের থানা ব্যবস্থাকে রহিত করে যখন উপজেলা কায়েম করেছিলাম। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মতো তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিলো উপজেলা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তবে জনস্বার্থমূলক সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন টিকে না। উপজেলা চালু করলাম। দেশবাসী সানন্দে উপজেলা ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। এই ব্যবস্থার ফলে ঘুমন্ত বাংলাদেশ জাগ্রত হলো, অবহেলা-অনাদরে পড়ে থাকা ৬৮ হাজার গ্রাম উন্নয়ন সমৃদ্ধির ছোঁয়ায় নতুন সাজে সেজে উঠলো। হাজার বছর ধরে যে মানুষরা বংশপরম্পরায় যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বঞ্চিত হয়েছে কিংবা আধুনিক যুগের সাথে পরিচিত হতে পারেনি, যারা কখনো পাকা রাস্তায় হাঁটতে পারেনি, যারা গাড়ি-ঘোড়া দেখেনি, বিদ্যুৎ কাকে বলে বুঝতো না, সেই মানুষরা উপজেলা প্রবর্তনের ফলে এসব চিনেছে, জেনেছে এবং ভোগ করেছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার পূর্বাঞ্চল যেমন উন্নয়ন-সমৃদ্ধির পথে পা দিয়েছিলো, ঠিক

www.pathagar.com

তেমনি। সেই বঙ্গভঙ্গ স্বার্থান্বেষীদের আন্দোলনের ফলে যেমন রদ হয়েছিলো, যুগান্তকারী উপজেলা ব্যবস্থাও একবার রদ করা হয়েছে। তবে উপজেলার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আবার তা প্রবর্তিত হয়েছে। যদিও তা পূর্ণাঙ্গ রূপ এখনো লাভ করেনি।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পেছনে বৃটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেনো, সেই প্রশাসনিক সংস্কারটি যে এই ভূখণ্ডের মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বার্থের একান্ত অনুকূলে গিয়েছিলো– তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এর ফলে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন হয়তো কিছুটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছিলো। কিন্তু একটি বিরাট অঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠী অধিকার সচেতন হতে পেরেছে। বৃটিশদের বিরুদ্ধে শুধু হিন্দুরাই আন্দোলন করেনি, মুসলমানরা সমান তালেই সংগ্রাম করেছে। বরং বৃটিশদের হাতে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটার কারণে তারাই বেশি সোচ্চার ছিলো স্বাধীনতার পক্ষে। তবে ওই সময়ে বঙ্গভঙ্গ ছিলো বাংলার মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে বৃটিশদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেনো, ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে তাদের যুক্তি ছিলো অকাট্য। তারা দেখিয়েছিলো, প্রায় আট কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলকে একটি প্রদেশের অধীনে সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। গোটা প্রদেশে সুষম উন্নয়নের জন্যও নতুন প্রদেশ গঠন জরুরি ছিলো। শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অবকাঠামোগত সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় সেই বাংলাকে ভাগ করে একটি নতুন প্রদেশ গঠন ছিলো এক যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থের সোপান রচিত হয়েছিলো ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে।

ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে সেই ঢাকা আজ আমাদের স্বাধীন দেশের গর্বের রাজধানী। আজ আমরা এক জাতি– এক ভাষা এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক-বাহকের পরিচয় বহন করে চলেছি। জনগোষ্ঠীর ৯০ ভাগই মুসলমান। অন্য ধর্মের মানুষরা এখানে স্বীয় ধর্ম-কর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে ধর্মীয় সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করছে। সমস্যা যা আছে তা সকল নাগরিক সমানভাবে ভোগ করে। প্রধান সমস্যা প্রশাসনিক। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের দেশের মধ্যে এখন লোকসংখ্যা ১৪ কোটির ওপরে। দেশে দুর্নীতি, অপরাধপ্রবণতা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ অবস্থায় আমাদের দেশের প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে উপলব্ধি থেকেই আমি বাংলাদেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছি। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি– দেশে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে, জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। আজ হোক আর কাল হোক– প্রয়োজনের তাগিদেই প্রাদেশিক ব্যবস্থা একদিন প্রবর্তন করতেই হবে। বিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীর শুরুতে বৃটিশরা উপলব্ধি করেছিলো যে, ৭ কোটি ৮৫ লাখ মানুষের অঞ্চলে একটি প্রদেশের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অথচ তখন এই জনগোষ্ঠী ২ লাখ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বাস করতো। পরাধীনতা ছিলো– কিন্তু মানুষের নিরাপত্তার অভাব ছিলো না। তারপরও জনসংখ্যার বিবেচনায় প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো। সে সময়কার মাত্র ছয় বছরের প্রাদেশিক শাসনের সুযোগের ধারাবাহিকতায় আজ আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হবার গৌরব অর্জন করেছি।

www.pathagar.com

নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গে সমালোচনা নিয়ে কিছু কথা

গত ৩ মে ২০০৫ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের চতুরঙ্গ পাতায় মনজুরে মাওলা সাহেবের লেখা 'একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কারণ তার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো আমার একটি সংস্কার প্রস্তাব। এই নিবন্ধে লেখক সরাসরি আমার নাম উল্লেখ করেননি। তবে আমার প্রস্তাবিত নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার ফর্মুলা নিয়ে কিছু সমালোচনা এবং উল্লিখিত প্রস্তাবের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আবার কিছু বিষয়ে তিনি একমতও হয়েছেন। সকল মহলই অবগত আছে যে, নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার সম্পর্কিত এই প্রস্তাবের উত্থাপক আমি এবং এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখিও হয়েছে।

লেখক তাঁর নিবন্ধে উক্ত প্রস্তাব নিয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা যুক্তিপূর্ণ বটে– তবে ওইসব প্রশ্নের উত্তর আমার প্রস্তাবের মধ্যেই রয়ে গেছে। বোঝা গেছে লেখক নির্বাচন পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার প্রস্তাবটি পড়ে দেখেননি। তিনি ২৮.০৪.২০০৫ তারিখের ভোরের কাগজে প্রকাশিত খবর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধটি লিখেছেন। অর্থাৎ এর আগের দিন ২৭.০৪.২০০৫ তারিখে আমি সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন পদ্ধতির যে সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছি– তার ভিত্তিতেই ওই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিলো। খবরটি ছিলো সংক্ষিপ্ত, সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ ফর্মুলা ওই রিপোর্টের মধ্যে ছিলো না। হয়তো তাই লেখক কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাই তিনি যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সমাধান দেয়া না হলে একটি সময়োপযোগী সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে পাঠক মনেও বিভ্রান্তি থেকে যাবে।

লেখক তার নিবন্ধের শুরুতেই প্রশ্ন রেখেছেন যে, 'বেশিরভাগ ভোটদাতার সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও কোনো দল যদি সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়, তাহলে ওই সরকার গঠনে দেশের ভোটদাতাদের সঠিক মতামত প্রতিফলিত হয়েছে ও গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিপালিত হয়েছে– এমন কথা বলা যাবে কি?' এই প্রশ্নের ধরন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লেখকও হয়তো এর উত্তরে বলতে চান যে– 'না'। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যে আলোচনা করেছেন তাতে মূলত কী বলতে চাওয়া হয়েছে তা কিছুটা অস্পষ্ট। যাক, সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

www.pathagar.com

এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলতে চাই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাতেই বলা আছে– গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় পাওয়া প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিবর্গ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। গণতন্ত্রের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে– সংখ্যাগরিষ্ঠরা কখনো কখনো সংখ্যালঘুদের –ধর্মীয় বা জাতি প্রশ্নে নয়) উপর জুলুমমুখী হয়ে উঠতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের এ ধরনের মানসিকতা গণতান্ত্রিক আদর্শকে ব্যাহত করে। তবে আমরা গত ১৫ বছর ধরে দেখছি উল্টো চিত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেই না, উপরন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের দুঃশাসন সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর পাথর-চাপার মতো চেপে বসেছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৩০ দশমিক ৮১ ভাগ ভোট পেয়ে আসন আধিক্যের কারণে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। শেষ পর্যন্ত সে সমর্থনও সরকারের পক্ষে থাকেনি। এমনকি ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোটের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিবর্গ সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পরও সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটারের সমর্থিত সরকার গণতন্ত্রের নামে দেশ পরিচালনা করেছে। এর পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে এবং ৫ বছর দেশ পরিচালনা করেছে, তারাও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের রায় পাওয়া সরকার ছিলো না। এই সরকার ভোট পেয়েছিলো ৩৭.৪৪ শতাংশ। তারা সরকার গঠন করেছে আমার সমর্থন নিয়ে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শতাংশের হিসাবে ভোট কম পেলেও আসন আধিক্যের কারণে সরকার গঠন করতে সক্ষম হতে পারে। তবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় এটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার নির্বাচনে এই অবস্থা সৃষ্টির অবকাশ নেই। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ রায় নিয়েও সরকার গঠিত হতে পারে এবং হচ্ছেও। আমার প্রস্তাবনায় বলেছি– সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে প্রচলিত ব্যবস্থাই যে সর্বোত্তম– তা মেনে নিতে পারি না। আর এই ব্যবস্থা কোনো ধর্মীয় বিধান নয় যে, এটা পরিবর্তন বা সংস্কার করা যাবে না। আমি যে সব কারণে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছি তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে– রাষ্ট্র ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আমাদের এখন আধুনিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। এটা মহাভারতের যুগ নয় যে– যারা পাশা খেলে জিতবে তারাই রাজ্য শাসন করবে, আর যারা হেরে যাবে তারা বনবাসে যাবে!

আমার নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের ফর্মুলায় বলেছি– সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি যখন দলীয় শাসন ব্যবস্থা– সে ক্ষেত্রে নির্বাচনও শুধু দলের ভিত্তিতে হতে পারে। অর্থাৎ ভোটারগণ দলকে ভোট দেবেন– সরাসরি প্রার্থীকে নয়। প্রত্যেক দল প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সংসদীয় আসনের সদস্য পাবে। এটাই হচ্ছে প্রস্তাবনার মূল কথা। বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রস্তাবনায় রয়েছে। প্রস্তাবের সব কিছু উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়– জনকণ্ঠ হয়তো ততোখানি জায়গা দিতে পারবে না। লেখক যেসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, প্রস্তাবনা থেকেই তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো। এ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে

www.pathagar.com

লেখক কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন যে, 'এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, যিনি নব্বই দশকের গোড়ার দিকে গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরে অসাধুতার কারণে দণ্ডিত হয়েছিলেন ও কারাবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করার প্রস্তাব করেছেন।' এই অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ নিয়েও দু'চার কথা না লিখে পারছি না। আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেবার পর দেশ ও জাতি কতখানি লাভবান হয়েছে সে হিসাব এখন জনগণই করছে। গত ১৫ বছরে দেশের হাল কী হয়েছে– তা তো দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ঢাকাকেন্দ্রিক ওই আন্দোলনে যদি কোনো সরকারের ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হতে হয়, তাহলে '৯০ পরবর্তী তিন সরকারেরই ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ বহুবার সৃষ্টি হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে তাতে- জনতার মঞ্চ বসেনি, রাজকর্মচারীরা রাজপথে নেমে আসেননি। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনামলের দেশের দুরবস্থার কথা আর নাইবা বললাম এখানে। তারপর কারাবাস মানেই যদি অসাধুতার কারণ হয়, তাহলে দেশের যেসব বরেণ্য রাজনৈতিক নেতা কারাবাস করেছেন– সেটাকে কোন কারণ বলে ধরে নিতে হবে? আমার শাসনামল তো দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন খেতাবে ভূষিত হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক আমলে দেশ যাদের কারণে দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা হয়েছে– তারা কারা? সাধারণ মানুষ? আমলা– না রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যাদের? ৯ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করে যখন '৯০ সালে ক্ষমতা ছেড়ে দিলাম তখন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পিছনে ছিলো মালয়েশিয়া। তারপর ১৫ বছরে সেই মালয়েশিয়া কোথায় এগিয়ে গেছে আর বাংলাদেশ কতো পেছনে চলে গেছে– সে হিসাব করলে কি মাথা হেঁট হয়ে আসে না? কেনো এমন হলো– কারণ মালয়েশিয়া ধরে রেখেছে মাহাথির মোহাম্মদের মতো নেতৃত্বকে। কিন্তু বাংলাদেশে আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর আমার বিকল্প নেতৃত্ব আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যা-ই হোক মূল প্রসঙ্গ নির্বাচন পদ্ধতি– সেখানেই ফিরে আসি।

আমার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রস্তাব অনুসারে ৫০.৫ শতাংশের অধিক ভোট পেলেই কেবল কোনো দল সরকার গঠন করতে পারবে। তিনি আরো বলেছেন যে, 'গত কয়েকটি সাধারণ নির্বাচনে এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলই মোট ভোটের ৫০ শতাংশ ভোট পায়নি। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে এবং এমনটি থাকাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। তাহলে কোনো দলের পক্ষেই সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত মোট ভোটের শতাংশ হিসাবে সর্বাধিক ভোট যে দলটি পাবে সে দলটিকে সরকার গঠনের জন্য অন্য দলকে সঙ্গে নিতে হবে।' লেখকের এই মন্তব্য সম্পর্কে বলতে চাই– যদি সেটাই করতে হয় তাহলে অসুবিধাটা কোথায়। যদি একটি দল ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১২০টি আসন লাভ করে সরকার গঠনের জন্য অপর এক বা একাধিক দলকে সাথে নিয়ে ন্যূনতম ১৫১ আসনের কোয়ালিশন গঠন করে, তাহলে সেখানে তো সংখ্যাগরিষ্ঠের

www.pathagar.com

শাসনই নিশ্চিত হবে। আমার প্রস্তাব অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোয়ালিশন– যাই গঠিত হোক না কেনো, সংখ্যালঘিষ্ঠ রায়ের সরকার অবশ্যই গঠিত হবে না। নির্বাচনে কোনো দল ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে না বা কখনো পায়নি– তা তো ঠিক নয়। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭৩ দশমিক ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে যেমন গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত বা স্থায়িত্ব লাভ করেনি– আবার '৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতের সমর্থন নিয়ে এবং '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করায় রাষ্ট্র চালাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বরং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের চেয়ে কোয়ালিশনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠিত হওয়া আমাদের মতো দেশের জন্য অধিক মঙ্গলজনক। এতে বড় দলের স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের সুযোগ থাকে না। ছোট বা অন্য দলের প্রতি সমীহ করে চলার মানসিকতা গড়ে ওঠে– যা গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত।

লেখক তার লেখায় আর যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেগুলো হচ্ছে: এক. যদি ভোটদাতারা কোনো প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে শুধু রাজনৈতিক দলকে ভোট দেন, তাহলে নির্বাচনে কোনো প্রার্থী থাকবেন কি? দুই. যদি কোনো প্রার্থী না থাকেন তাহলে ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থাকবে কি? তিন. ধরা যাক থাকবে না। এমনি পরিস্থিতিতে বিজয়ী রাজনৈতিক দল যে সব জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবে, সে সব জায়গার মধ্য থেকে কোনো একটি বিশেষ জায়গার কোনো ব্যক্তিকে যদি সংসদ সদস্য মনোনীত না করে, তাহলে সংসদে ওই বিশেষ জায়গায় প্রতিনিধিত্ব কে করবেন? চার. যদি জনগণের অপছন্দের কোনো লোককে সংসদ সদস্য মনোনীত করা হয়, তাহলে যে সমস্যা দেখা দেবে তা কি করে সমাধান করা হবে? পাঁচ. যদি কেউ নির্দলীয়ভাবে প্রার্থী হতে চান, তার কী হবে? বলা হয়েছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবে নির্দলীয় প্রার্থীদের বিষয়টি একেবারেই বিবেচনা করা হয়নি'। ছয়. তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যদি আগের সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদের প্রাধান্যই থাকে, তাহলে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেনো?

আমি আগেই বলেছি লেখক যদি আমার প্রস্তাব পুরোপুরি দেখতেন তাহলে তিনি এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতেন না। আমার প্রস্তাবনায় বলেছি, এক. প্রত্যেক দল নির্বাচনের আগে তাদের প্রার্থী প্যানেল তৈরি করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেবে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব ইশতেহার ঘোষণার মতো প্রার্থী তালিকা তৈরি করে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করবে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সাধ্য অনুসারে প্রার্থী প্যানেল করবে। দুই. দেশে বিদ্যমান তিনশ' আসনেই দলগুলো নিজস্ব প্রতীক নিয়ে নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তালিকার সাথে প্রত্যেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা থাকবে। একই প্রার্থী একাধিক তালিকায় –মনোনয়নপত্রসহ) থাকলে তার প্রার্থিতা বাতিল হবে। তিন. প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে দলটি কতোটি আসন লাভ

www.pathagar.com

করবে এবং কোনো নির্বাচনী এলাকায় ওই দলটির সদস্য প্রতিনিধিত্ব করবেন। সে ক্ষেত্রে দলের প্রাপ্ত ভোটাধিক্য প্রথম বিবেচনা হিসেবে গণ্য করা হবে। দল নির্ধারণ করবে তার কোন প্রার্থী কোন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করবে। চার. জনগণ দলের প্রতি ম্যান্ডেট দেবে, দল নির্ধারণ করবে কাকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হবে। যেমন বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটারগণ শুধু একজন সংসদ সদস্য প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রী নির্বাচনে ভোটারদের কোনো হাত নেই। দেখা গেছে যিনি নির্বাচনে জামানত হারিয়েছেন– দল তাকেই আবার মন্ত্রী নিয়োগ করেছে। এসব নিয়ে জনগণ বা ভোটারগণ মাথা ঘামাতে যায় না। তারা তাদের পছন্দের দলের মনোনীত একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করেই সকল দায়িত্ব দলের উপর ন্যস্ত করে। দল যাকে মনোনীত করে, ভোটারের কাছে তিনি পছন্দের নাও হতে পারেন– হয়তো দলের কারণেই তাদের ভোট দেয়া হয়। এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায়– কোনো দলের একজন সংসদ সদস্য পরবর্তীতে মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হয়তো জামানত হারিয়ে বসেন। অর্থাৎ ব্যবস্থা যখন দলীয় শাসন, তখন দলের প্রতি ম্যান্ডেট দেয়াটাই বড় কথা। আমার প্রস্তাবের ফর্মুলার মতোই তো বর্তমানে মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন বা হবেন। এখানে দলের মনোনীত মহিলা প্রার্থী যদি সাধারণ ভোটারদের অপছন্দের প্রার্থী হয়ও, তাতে তো কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। পাঁচ. নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার প্রস্তাবে নির্দলীয় প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাও বলা হয়েছে। আমার প্রস্তাবে বলেছি, সংসদীয় আসনের ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কারণ অনেকে স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে উক্ত আসনের মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের চেয়ে অন্তত এক ভোট বেশি পেলেই স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন। এই প্রস্তাবের কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের প্রতিফলন ঘটানো। ছয়. তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে আমার প্রস্তাবে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাজনীতিকদের জন্য লজ্জা ও অপমানের বিষয়। এই ব্যবস্থা বাতিল করে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলের আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে। এই সরকার শুধু রুটিন দায়িত্ব পালন করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব থাকবে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের হাতে। বিষয়টি আরো কিছুটা স্পষ্ট করার জন্য আমার প্রস্তাবনায় এক নজরে নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছি– তা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

১. জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩০০। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে আমি প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছি। আমার প্রস্তাব অনুসারে দেশে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। সেহেতু জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা

www.pathagar.com

৩০০ থাকলেই যথার্থ হবে। ২. প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সামর্থ্য অনুসারে প্রার্থী মনোনীত করে নির্বাচন কমিশনে তালিকা পেশ করবে। ৩. তালিকার সাথে প্রত্যেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা থাকবে। ৪. একই প্রার্থী একাধিক দলের তালিকায় থাকলে তার প্রার্থিতা বাতিল হবে। ৫. প্রত্যেক দল নির্ধারিত কোটা অনুসারে প্রার্থী তালিকা তৈরি করবে। ৬. প্রার্থী তালিকার কোটা হবে (ক) সাধারণ ৫০%, (খ) মহিলা ৩০%, (গ) সংখ্যালঘু ১০%, (ঘ) পেশাজীবী ১০%। ৭. সাধারণ প্রার্থী কোটায় যে কোনো প্রার্থী থাকতে পারবেন। পেশাজীবী কোটায় থাকবেন শিক্ষক-আইনজীবী-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-শ্রমিক নেতৃত্ব। ৮. প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে কোন দল কোন কোটায় কত আসন লাভ করবে। যে দল সর্বাধিক ভোট পাবে, সে দলই ভগ্নাংশের সুযোগ লাভ করবে। অর্থাৎ কোনো দল কাস্টিং ভোটের ১ শতাংশ ভোট লাভ করলে ৩টি আসন পাবে। ১ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পেলে ৪টি আসন লাভ করবে। অবশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগফলের সুবিধা সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত দল ভোগ করবে। ৯. নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে কোন আসনে কোন দলের প্রার্থী প্রতিনিধিত্ব করবেন। সে ক্ষেত্রে দলের প্রাপ্ত ভোটাধিক্য প্রথম বিবেচনা হিসেবে গণ্য করা হবে। ১০. কোনো দলের প্রতিনিধি মৃত্যুবরণ কিংবা পদত্যাগ করলে অথবা দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সংসদ প্রতিনিধি পদ হারালে ওই আসনে কোনো উপ-নির্বাচন হবে না। সংশ্লিষ্ট দল তাদের প্রার্থী তালিকা থেকে নতুন প্রতিনিধির মনোনয়ন দেবে। নির্বাচন কমিশন তাকেই সংসদ প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করবে। ১১. স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোনো দলীয় ভিত্তিতে হবে না। যেমন– ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। এখানে সরাসরি প্রার্থীরাই নির্বাচন করবেন। ১২. যে কোনো নির্বাচনে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকার বলে দায়িত্ব পালন করবে এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

আমি নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের যে ফর্মুলা উত্থাপন করেছি, এই ফর্মুলায় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, গ্রিস, ফিনল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড এবং ইসরাইল। প্যালেস্টাইনের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনও এই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমার প্রস্তাবের সাথে এসব দেশের নির্বাচন পদ্ধতির হুবহু মিল থাকতে নাও পারে, তবে দলকে ভোট দিয়ে আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধান রয়েছে। আমাদের উপমহাদেশে এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই। তবে এটা প্রবর্তন করা হলে আরো অনেক দেশ অনুসরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ নির্বাচনী সমস্যা উপমহাদেশের সব দেশেই কম-বেশি রয়েছে। আমি নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের যে ফর্মুলা দিয়েছি তা ১৫ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটি যদি লেখক সংগ্রহ করে

www.pathagar.com

পড়তে পারেন, তাহলে এ ব্যাপারে তার ধারণা স্পষ্ট হবে। তবুও তাকে ধন্যবাদ যে তিনি বিষয়টি চিন্তা করেছেন। এটাই প্রস্তাবনার একটি ইতিবাচক দিক। তাছাড়া তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগ সম্পর্কে আমার প্রস্তাব এবং ডিসিদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থাটি বাতিল করার প্রস্তাবও সমর্থন করেছেন। আশা করি এই নিবন্ধের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান হয়েছে।

www.pathagar.com

নির্বাচন নিয়ে যেভাবে ভাবছি

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই মনে হয় নির্বাচনী ভাবনায় পেয়ে বসেছে। এটাই স্বাভাবিক। সামনে সময় নেই। মাত্র দেড় বছর। আমিও যেমন ভাবছি, অন্যরাও হয়তো তেমন। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মধ্যেই নির্বাচনকে সামনে রেখে এক অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। নেতারা সতেজ হয়ে ওঠেন। কর্মীরাও। পাঁচ বছরের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ বুঝে নেবার পালা সামনে।

নির্বাচন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। কীভাবে এই উপাদানকে ব্যবহার করবো? শান্তির পথে? না, সংঘাতে? সত্যিকারের গণরায়ের প্রতিফলন ঘটবে তো নির্বাচনে? অনেক প্রশ্ন জাগে অনেকের মনে। কীভাবে নির্বাচন হবে? জোটগত? নাকি যার যার তার তার মতো? আমি কী করতে পারি? অনেকেই সে অংক কষেন। সরকারি দল বিরোধী দল উভয়েই। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও। আমি কী করবো– সে হিসাব নিজেও করি। কীভাবে নির্বাচন করবো? জোটগত, না একক? দেখা যাক পর্যালোচকরা কী ভাবেন।

কলামিস্ট আবেদ খান। তিনি আমাকে পছন্দ করেন না। তাঁর লেখায় অন্তত সেটাই মনে হয়। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে নয়। পেশাগত দিক থেকে। যে দিক থেকেই হোক, তিনি আমাকে পছন্দ করুন আর না–ই করুন– আমি সেদিকে দৃষ্টি দিতে চাই না। আমি তাঁকে পছন্দ করি। ভালো লেখক। গুণীজনকে ভালোবাসি। শ্রদ্ধা করি। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমার স্বভাবের প্রধান অংশ। সম্প্রতি তিনি এক নিবন্ধে লিখেছেন– আমার সামনে ইকুয়েশন একাধিক। আমি বলি, না। একাধিক নয়। রাজনীতিতেও অংকের মতো হিসাব আছে। হিসাবে না পড়লে কোনো ইকুয়েশনে কাজ হয় না। জনগণের তো অনেক দেখা হলো। এবার তারাও হিসাব মিলাবে। কলামিস্ট বলেছেন– আমার সামনে সাতটি রাস্তা। যেমন এক, আমি বিএনপির সাথে সমঝোতায় যেতে পারি। দুই, বিএনপি-জামায়াত জোটের সাথে এককভাবে সমঝোতা করতে পারি। তিন, আমি জামায়াতের সাথে এককভাবে সমঝোতা করতে পারি। চার, আমি রব, কাদের সিদ্দিকী, ছোট ছোট ইসলামী দল নিয়ে একটা প্লাটফর্ম করতে পারি। পাঁচ, কামাল, বি. চৌধরী, কাদের সিদ্দিকী এবং আমি একসঙ্গে মিলে একটা জোট গঠন করতে পারি। ছয়, আমি আওয়ামী লীগের সাথে একক সমঝোতায় পৌঁছাতে পারি। সাত, আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির বৃহত্তর জোটের সঙ্গে একত্র

www.pathagar.com

হয়ে আগামী আন্দোলন ও নির্বাচনের রূপরেখায় অংশ নিতে পারি। এর মধ্যে আমি কোনটা বেছে নেবো?

জ্ঞানী-গুণীজনের চিন্তা-ভাবনাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। তাই এই ভাবনাটা আমি জনগণের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছি তারা কী ভাবেন। জনগণের জন্য আমি রাজনীতি করি। তারাও এখন অনেক সচেতন। পোড় খেয়ে শিখেছে। দলের নেতা-কর্মীরাও হিসাব-নিকাশ করেন। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহে আমার দলের জেলা কাউন্সিল ছিলো। তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতাকর্মীরা এসেছিলেন। খুব সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি তারা। এরা সাধারণের মনোভাব জানেন। কলামিস্টের সাতটি ইকুয়েশন তুলে ধরেছিলাম তাদের সামনে। তারা মানলেন না। আমার হিসাবের সাথে তাদের হিসাবও মিলে গেলো। আমার ছিলো একটি পথের হিসাব। সেই হিসাবই ওরা গ্রহণ করলো। সে কথায় পরে আসি।

কেনো গ্রহণ করলাম না সাতটি হিসাবের একটিও। বলতে চাই সে কথা। এক, বিএনপিকে জনগণ এবার নতুন করে দেখলো না। তারা একাধিকবার ক্ষমতায় এসেছে। ভোটের হিসাব যেভাবেই করা হোক না কেনো, তা তাদের টিকে থাকার বড় মানদণ্ড নয়। তাদের সাফল্যের ব্যারোমিটার শুধু নামছেই আর নামছে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক যাত্রায় যে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা ছিলো– তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। যদিও এই দল তিনবার ক্ষমতায় আরোহণ করেছে। কিন্তু জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সফলকাম হতে পারেনি একবারও। অন্য একটি দলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের ফসল তারা ঘরে তুলেছে বারবার। সেই সাথে মাত্র একবার বাদে জামায়াতের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিএনপিই ভোগ করেছে। ১৯৭৯ সালে বিএনপি প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সেবার প্রদত্ত ভোটের ৪১.১৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ২০৭টি আসন লাভ করে। জামায়াত ওই নির্বাচনে [illegible]। মুসলিম লীগ বা অন্য কোনো ইসলামী দলের প্রতীকে তাদের ভোট পড়েনি। তাদের ভোট পড়েছে ধানের শীষে। বিএনপি-জামায়াত আত্মীয়তা ওখান থেকেই। জিয়াউর রহমান সাহেবের কাছ থেকে জামায়াত রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করেছে। তবে বাংলাদেশের মানুষের মনে ওই দল অচ্ছুতের মতো হওয়ায় দহরম-মহরমটা প্রকাশ্যে ঘটেনি। এরপর ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি জাতীয় পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়। ফলে জাতীয় পার্টি মোট প্রদত্ত ভোটের ৪২.৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদের ১৫৩টি আসন লাভ করে। সত্য স্বীকারে আমার কার্পণ্য নেই যে, ওই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করলে জাতীয় পার্টি সরকার গঠনের মতো আসন লাভ হয়তো করতে পারতো না। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী শক্তির ভোট ভাগ হয়ে যেতো। ওই নির্বাচনে জামায়াত ৪.৬০ শতাংশ ভোট লাভ

www.pathagar.com

করে এবং এটাই তাদের শক্তির মাপকাঠি। বাকি নির্বাচনগুলোতে জামায়াত ভোট ধার দিয়েছে আবার ধার নিয়েছে। এই দেয়া-নেয়ার মধ্যে তাদের প্রাপ্ত ভোট বেড়েছে-কমেছে। সর্বশেষ নির্বাচনে বিএনপি ভোট পেয়েছে ৪০.৮৬ শতাংশ। এর মধ্যে জামায়াতের ভোট আছে। আবার জামায়াত ভোট পেয়েছে ৪.২৯ শতাংশ। এর মধ্যেও বিএনপির ভোট আছে। এই ভোট পেয়েই তারা আসন পেয়েছে ১৭টি। অথচ এর আগের নির্বাচনে জামায়াত ৮.৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছিলো মাত্র ৩টি। এই নির্বাচনে জামায়াত আঞ্চলিকভাবে আওয়ামী লীগ ঠেকাও মনোভাবের কারণে বিএনপির বেশ কিছু ভোট পেয়েছে। তবে জামায়াত তাদের শক্তি সামর্থ্য দেখানোর জন্য নিজেদের ভোট নিজেদের ঘরেই নিয়েছে এবং গোলাম আজমকে কারারুদ্ধ করার প্রতিশোধ নিয়েছে। এই মধুর প্রতিশোধের মধ্য দিয়েই বিএনপি-জামায়াত সখ্য আরো মজবুত হয়েছে। তবে ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে বিএনপিরই। এই দুই দলের পরিচালিত সরকারের ব্যর্থতা অতীতের যে কোনো ব্যর্থতার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে বিএনপিকে। এখান থেকে তাদের ভাবমূর্তির উত্তরণ ঘটাতে হলে দলীয় নীতিতে সংস্কার আনতে হবে। জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। একটি আদর্শ ঐক্য গড়ে উঠতে পারে কর্মসূচির ভিত্তিতে। সে ধরনের কর্মসূচি এবং বাস্তবমুখী প্রতিশ্রুতি যদি বিএনপি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারে তাহলে জনগণই নির্ধারণ করে দেবে আমি কী করতে পারি। কিন্তু বিএনপি কতটুকু কী করতে পারবে তা নিয়ে তো যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

দুই, একটি রাজনৈতিক দলের সফলতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি ক্ষমতায় আরোহণ। সেদিক থেকে বিএনপি একটি সৌভাগ্যের রাজনৈতিক দল। নেতিবাচক ভোটের ফসল তারাই ভোগ করেছে বরাবর। তবে সেই সৌভাগ্যকে এবার অপবিত্র করে দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। এক সময় কুলিনরা নিম্নবর্ণের মানুষদের দিয়ে কাজ করাতো, কিন্তু ঘরে উঠতে দিতো না। তাহলে তাদের পবিত্রতা নষ্ট হতো। সে রকমই বিএনপি বিগত ১৯৭৯-১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ঘরে তুলে নেয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াত আঙ্গিনা-বারান্দা মাড়িয়ে বিএনপির ঘরে ঢুকে পড়েছে। ফলে তারা জাতে উঠেছে, কিন্তু ইজ্জত হারিয়েছে বিএনপি। এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি তাদের হৃতগৌরব উদ্ধারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে– সেটাই এখন জনগণের পর্যবেক্ষণের বিষয়। দেশবাসী যা গ্রহণ করবে আমি সেটাকেই মেনে নেবো।

তিন, পূর্বের আলোচনার পর বলাই বাহুল্য যে– যাদের সংস্পর্শে গেলে রাজনৈতিক ইজ্জত নষ্ট হয়, সেই জামায়াতের সাথে আমার কোনো ধরনের সমঝোতা হতে পারে না। তবে আমি কোনো রাজনৈতিক দলকে হেয় চোখে দেখি না। কোনো ব্যক্তির প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। নীতি-আদর্শের সাথে দ্বিমত থাকতে পারে এবং সেটা প্রতিটি দলের নিজস্ব ব্যাপার। জামায়াতের সাথে মেশা আমার রাজনৈতিক আদর্শের ঘোর পরিপন্থী।

www.pathagar.com

চতুর্থত যে বলা হয়েছে, আমি রব-কাদের সিদ্দিকী এবং ছোট ছোট ইসলামী দল নিয়ে একটা প্লাটফর্ম করতে পারি। আমি আগেই বলেছি ঐক্য বা জোট গঠন যদি কর্মসূচির ভিত্তিতে হয়– কেবল সে ক্ষেত্রেই সফলতা আসতে পারে। একই মত ও পথের জনগোষ্ঠীর যেমন বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নয়– তেমনি একই নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচি বা সংস্কারপন্থীদের বিভক্ত থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। সে ক্ষেত্রে কাউকে নিয়ে অভিন্ন প্লাটফর্ম গড়তে হলে সবার আগে অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তবে বিভিন্ন দলের মধ্যে নীতি-আদর্শের পার্থক্য তো কিছুটা থাকেই। সেখানে আমরা কতটা একমত হতে পারি– সেটাই হতে পারে নতুন প্লাটফর্ম গঠনের প্রথম বিবেচ্য বিষয়। নিজস্ব নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে তো আমি কিছু করতে যাবো না। রাজনীতিতে সমমনা দল থাকতে পারে। কিংবা বন্ধু রাজনৈতিক দলও থাকে। যে যার নিজস্ব অস্তিত্ব এবং সত্তা নিয়ে অবস্থান করবে। নির্বাচনে জনগণই তাদের প্রকৃত বন্ধুকে বেছে নেবে। জনতার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। পঞ্চমত ডঃ কামাল এবং বি. চৌধুরীকে নিয়ে আমার জোট গঠনের কথা বলা হয়েছে। তাতে আমার জাতীয় পার্টি যে খুব লাভবান হবে তা নয়। সে বিবেচনায় আমার পূর্বের আলোচনাই এখানে প্রযোজ্য।

ষষ্ঠত বলা হয়েছে, আমি আওয়ামী লীগের সাথে এককভাবে সমঝোতায় যেতে পারি। যা আদৌ সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আমি যে প্রতিদান পেয়েছি, সেটা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যেতে পারে। কিন্তু নীতি ও আদর্শের সাথে আপস করা হলে জনগণ মেনে নেবে না। বিএনপির আদর্শের পতনের প্রেক্ষাপটে সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিয়ে জাতীয় পার্টির সৃষ্টি। সে সঙ্গে আমার সাথে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমন্বয়। এই ধারা বিএনপির সাথে এক হতে পারে না। কারণ তাদের সাথে রয়েছে এমন একটি শক্তি যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, আজ পর্যন্ত তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও করতে চায় না। আবার আওয়ামী লীগের বিপরীত ধারায় রাজনীতি করে তাদের সাথে সমঝোতা করতে গেলে জাতীয় পার্টির রাজনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটি কথা আমি সব সময়ই স্পষ্ট করে বলি যে, আমি আদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। প্রচলিত রাজনীতির বিপরীতে আধুনিক চিন্তা-চেতনার সমন্বয়ে সংস্কারের নীতি নিয়েই আমার চলার পথ। আমার আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কিংবা সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে– সেই চলার পথে কেউ সাথী হতে পারে। আমি কোনো ধরনের স্বার্থের সাথে আপস করে চলতে পারি না।

বিশ্লেষক শেষ ইকুয়েশন হিসেবে বলেছেন– মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির বৃহত্তর জোটের সঙ্গে একত্র হয়ে আমি আন্দোলন ও নির্বাচনের রূপরেখায় অংশ নিতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমার স্পষ্ট কথা যে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির কথা বলে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার বিপক্ষে যে শক্তিটি ছিলো তারা এখনো চিহ্নিত। তাদের সংখ্যা নগণ্য। এরা বদলায়নি। বংশবৃদ্ধিতে কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে– শতাংশের তেমন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তারা ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো। সেই শতাংশে কিছু যোগ-বিয়োগ হয়েছে। তেমন কোনো তারতম্য হয়নি। বাকি গোটা দেশের মানুষই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে রাজনীতির বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই শক্তি ভাগ ভাগ অবস্থায় থাকতে পারে। তাই বলে যারা আওয়ামী পক্ষে নেই, তাদের ঢালাওভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বলা যায় না। জাতীয় পার্টি অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত একটি দল। জাতির বৃহৎ কল্যাণে আমরা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারি। তার জন্য বাকশালের মতো সকল দলের একীভূত হবার তো প্রয়োজন নেই।

সব ইকুয়েশন পেছনে ফেলে রেখে বলতে চাই– জাতীয় পার্টি নিজস্ব ধারাতেই চলবে। আমি কারো সাথে মিশে নিজের অস্তিত্বকে ম্লান করতে যাবো না। আমার রয়েছে সাফল্যের ইতিহাস। ১৯৯০ সালের পর দীর্ঘ ১৪টি বছর কেটে গেলো। এই সময়ে দেশ ও জাতি সকল ক্ষেত্রে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু উপহার পায়নি। ব্যর্থতা যাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের সঙ্গী হয়ে দেশবাসীকে আমি হতাশ করতে পারি না। জনগণের মুক্তির সংগ্রামে পথে নামবো। সে পথ হয়তো অনেক বন্ধুর– তবুও চলতে হবে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে। গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়তো পারবো– হয়তো নয়। কিন্তু সৎ উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি থাকবে না। সময়ের বাঁকে বাঁকে রাজনীতির ধারায়ও হয়তো কিছুটা পরিবর্তন আসে। কিন্তু তা দেশ-জাতির স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থে চলে গেলেই বিপত্তি ঘটায়। জাতীয় পার্টি অবশ্যই সেই বিপত্তির পথে অগ্রসর হবে না।

www.pathagar.com

সংকট নিরসনে আসুন সমঝোতার পথে

একযোগে সারাদেশে বোমা। গোটা জাতি স্তম্ভিত। ঘটনা শুনে আমি নিস্তব্ধ, হতবাক। বাংলাদেশে আর কখনো ঘটেনি এমনটি। বোমাবাজি–রাজনীতির কী ভয়ংকর রূপ! নিকৃষ্ট নগ্ন চেহারা! জাতি যা কখনো দেখেনি। আমার শাসনামলে বিরোধী দল বোমাকে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার বানিয়েছিলো। দু'চার পাঁচশ' বোমা পটকা তারাও একদিনে ফুটিয়েছে। তবে নাশকতামূলকভাবে কেউ বোমা বিস্ফোরণের সুযোগ পায়নি। আন্দোলনের সেই বোমা এখন বুমেরাং হয়ে ফুটছে। বোমাবাজির কুফল এবং যন্ত্রণা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে জাতিকে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। হলো না তা। এখন বোমা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সূক্ষ্ম ও সফল পরিকল্পনামাফিক এখন বোমা ফোটে। একদা বলেছিলাম– কেউ বোমা ফুটাবেন না। আগুন জ্বালাবেন না। দেশের সম্পদ ধ্বংস করবেন না। কেউ শোনেননি আমার কথা। যে বিষফল রোপণ করা হয়েছিলো তার অঙ্কুর এখন বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই বৃক্ষের মূলোৎপাটনের উপায় কী?

দেশজুড়ে যখন নজিরবিহীনভাবে একযোগে বোমাগুলো ফুটছিলো তখন আমি উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক সফরে ছিলাম। ভোরের দিকে রওনা হয়েছি দহগ্রামের উদ্দেশে। দহগ্রাম বাংলাদেশের একটি ছিটমহল। প্রায় ১২ হাজার লোকের বাস সেখানে। দুর্বিষহ জীবন তাদের। ভারতের তিন বিঘা করিডোরের মধ্য দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়। দেশের সমাজজীবন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। সব সময় একটা ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে তাদের সময় কাটে। একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আমিই সেখানে গিয়েছিলাম। একবার নয় দু'বার। দেখেছিলাম তাদের নিদারুন জীবনযাপনের চিত্র। খাবারটা কোনোমতে যোগাতো তারা। অনেকটা গাছের ভেতরের পোকার মতো শুধু খেয়ে বেঁচে থাকা। শিক্ষা-চিকিৎসা কিছুই ছিলো না। মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ রাখা ছিলো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোনো কোণে একটি মানুষও কষ্ট করবে– দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি তা মেনে নিতে পারিনি। তাই ছুটে গিয়েছিলাম দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায়। সেদিন ওদের চোখের ভাষায় বুঝেছিলাম, দেশের একজন রাষ্ট্রপতিকে তারা সেদিন প্রথম দেখেছিলো! বুঝেছিলাম, শিক্ষা বলতে কী বুঝায়

www.pathagar.com

তা ওরা জানে না। হাসপাতালে চিকিৎসার কথা ওরা কখনো শোনেইনি। জানে শুধু জন্ম আর মৃত্যুর কথা। দেশের অবহেলিত সেই সামান্য ক'জন মানুষের জন্য আমি ত্বরিতগতিতে একটি প্রাইমারি স্কুল, একটা হাইস্কুল, একটা হাসপাতাল এবং পাকা রাস্তা করে দিয়েছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে দহগ্রাম আর আঙ্গরপোতার মানুষেরা আধুনিক জীবনের সাথে পরিচিত হয়– মূল ভূখণ্ডের মানুষের নাগরিক অধিকারের মতো সব অধিকার ভোগ করতে থাকে। ওরা অবহেলার জিঞ্জির থেকে মুক্ত হলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমার শুরু হলো বন্দি জীবন। এক-এক করে একনাগাড়ে কেটে গেলো ছয়টি বছর। এখনো ভাবতে পারি না কীভাবে কাটালাম এতোটা বছর। তবে যতোক্ষণ জেগে থাকতাম ভাবতাম দেশের কথা– মানুষের কথা– চেনা মানুষের স্মৃতিকথা। মনে হতো দেশের প্রতিটি মানুষ আমার চেনা– তাদের মুখগুলো আমি কখনো না কখনো দেখেছি। দেশের প্রতিটি অলি-গলি আনাচ-কানাচ আমার পরিচিত ও জানা। মাটি আর মানুষ নিয়ে স্মৃতিমন্থন করতে করতেই সময় কেটে যেতো। কখনো স্বপ্নের মধ্যেও দেশ আর মানুষের ছবিগুলো দেখতাম। তার মধ্যে দহগ্রাম আর আঙ্গরপোতার কথাও মনে পড়তো। তাই জেল থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সেই দহগ্রামে। দেখতে গিয়েছিলাম আমার সেই সাজানো বাগানটি কেমন আছে। তারপর প্রায় আরো পাঁচ বছর কেটে গেছে। আবার মন নেচে উঠলো– দেখে আসি সেই ছিটমহলের মানুষরা কেমন আছে।

১৭ আগস্ট ২০০৫। বেলা তখন পুবের গগনে। আমার গাড়ি ছুটে চলেছে দহগ্রামের দিকে। মনে মনে ভাবছি ওখানকার মানুষের কথা। ভাবছি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে দু'চার কথা তো বলতে হবে। কী বলা যাবে। এখন তো ওদের হাতে দেবার মতো কিছু নেই আমার কাছে। জানি ওরা এখনো খুব বেশি ভালো নেই। আমি সরকার থেকে চলে যাবার পর এই সামান্য ক'জন মানুষের সুযোগ-সুবিধা কমে গেছে। ভাবছিলাম শুনবো ওদের শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন চলছে, জীবন ও জীবিকায় কতোটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে। এমনসব ভাবনার জগতে যখন বিচরণ করছিলাম তখনই ঢাকা থেকে মোবাইলে ফোন এলো– রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে। আঁতকে উঠলাম। তারপর শুনছি আরো অনেক জেলার নাম। পাঁচটা-সাতটা এমনি করে পঞ্চাশটিরও বেশি জেলার নাম শুনলাম, যেখানে একযোগে একই সময়ে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সোয়া এগারোটার দিকে আমি লালমনিরহাট জেলার ওপর দিয়ে চলে এসেছি। আমার গাড়িবহর শহরটি অতিক্রম করে আসার মিনিট দশেক পরেই সেখানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। শুনলাম রংপুর-কুড়িগ্রাম-ঠাকুরগাঁওয়ে বোমা ফুটেছে। আগের দিন ঠাকুরগাঁওয়ে ছিলাম। সামনের দিন নীলফামারী যেতে হবে। সেখানেও বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। খবরের পর খবর আসছে। সারাদেশে বোমা ফুটছে। আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো। চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একি কাণ্ড! দেশ তাহলে কোথায় যাচ্ছে! আমার গাড়ি

www.pathagar.com

তখনও চলছে দহগ্রামের দিকে। সীমান্ত এলাকা তখন প্রায় ছুঁই ছুঁই। মোবাইলে অনেকে আমাকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বললেন। কেউ বললেন সফর বাতিল করতে। আমি ভাবলাম– তা হয় না। তাহলে আতঙ্ক আরো ব্যাপকতা পাবে। পত্রিকায় শিরোনাম হবে– 'বোমাতঙ্কে এরশাদ উত্তরবঙ্গে সফর বাতিল করেছেন।' আমার বিপক্ষে পত্রিকায় খবর বের হলে সে পত্রিকা নাকি বেশি কাটতি হয়। কিছু কিছু পত্রিকার এই প্রবণতাকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ কেউ নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করেন। আমি তা মনে করি না। এটা আমার কাছে ইতিবাচকই মনে হয়। আমার বিরুদ্ধে কিছু খবর যদি পাঠকের মধ্যে বেশি সাড়া জাগায় তাহলে বুঝতে হবে ওই পাঠকরা আমার অতি আপনজন। কারণ প্রিয়জনের খারাপ খবরে তার আপনজনরাই বেশি ব্যাকুল হয়– অতি আগ্রহে সবকিছু জানতে চায়। যাহোক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই দহগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমার গাড়ি বহরের সামনে এগুতে একটু বেশি সময় লাগে। খবর পেলে রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সমবেত হয়। তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি না। গাড়ি থামাই। অপেক্ষমাণ মানুষের সাথে কথা বলি। দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ শোনার পরও সিদ্ধান্ত নিলাম সফরের কোনো কর্মসূচি বাতিল করা যাবে না।

বেলা একটার দিকে দহগ্রাম হাইস্কুল মাঠে পৌঁছে গেলাম। বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন। তথাপিও সেখানে মানুষের ঢল। মনে হলো গোটা ইউনিয়নবাসী সেখানে একত্রিত হয়েছে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। আমার শাসনামলের আগে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিলো একটি ইউনিয়নের তিন ওয়ার্ডের মধ্যে এক ওয়ার্ড। উন্নয়নের স্বার্থে এই ওয়ার্ডকে আমি ইউনিয়নে উন্নীত করেছিলাম। সেখানে সমবেত জনতার উদ্দেশে তখন মন খুলে কথা বলতে পারলাম না। ভেতরে ভেতরে দাহ হচ্ছিলো– কেনো এই বোমাবাজি। তবে দহগ্রামের জনগণের সামনে এই বোমাবাজি নিয়ে কোনো কথা বলিনি। প্রকৃত অবস্থা ভালোভাবে না জেনে একটা ভয়াল পরিস্থিতির কথা প্রচার করলে আতংক ছড়াতে পারে। ওখানে শুনলাম দহগ্রামের হাসপাতালটা ভালোভাবে চলছে না। কেউ খোঁজ-খবর রাখে না। ডাক্তার ঠিকমতো থাকেন না। তিনি সন্ধ্যার আগেই পাটগ্রামে চলে যান। আমি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বললাম। অনুরোধ করলাম যাতে মানুষের চিকিৎসা ব্যাহত না হয়।

দুপুর আড়াইটার দিতে বুড়িমারী সীমান্তের একটি রেস্ট হাউজে এলাম। জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতারা এখানে আমার দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। পৌঁছে দেখি সেখানে লোকে লোকারণ্য। গোটা দেশে এতোকিছু ঘটনা ঘটে গেছে তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ওরা আমার কথা শুনতে চায়। আমি রেস্ট হাউজের দোতলায় দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে কথা বললাম। ওরা চলে যাবার পর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে রইলাম। প্রতি মুহূর্তে খবর পাচ্ছি গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। আগেই বলেছি আমার শাসনামলে বিরোধী দল হরতাল বা অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করতে গেলে একদিনে এর চেয়েও

www.pathagar.com

বেশি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তখন ছিলো সেসব 'বিপ্লবী বোমা', 'গণতন্ত্র বাস্তবায়নের বোমা'। এখন বোমা ফুটলে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। আমার শাসনামলে বোমা ফুটালে 'বিবৃতিজীবীদের' মুখে টুশব্দটি শোনা যেতো না। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস– সেই বোমাবাজির রাজনীতি এখন বুমেরাং হয়ে নিজেদের শরীরেই আঘাত হানছে। তাই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আগুন নিয়ে খেলতে নেই। অন্যের ঘর পোড়াতে আগুন জ্বালালে সে আগুনের লেলিহান শিখা কোনো এক সময় নিজের ঘরও ছাই করে দিতে পারে। তাই আমি সর্বদা ধ্বংসের রাজনীতি পরিত্যাগ করে সকল পক্ষকে সহনশীলতার রাজনীতির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছি। আমি নিজে এই রাজনীতির চর্চা করে আসছি। আমি জানি– আজ হোক আর কাল হোক, আমি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবো কি পারবো না, এ দেশের রাজনীতিকে একদিন আমার প্রদর্শিত পথে আসতেই হবে। কোনো বিশেষ নেতৃত্ব সে ধারা প্রবর্তন করতে পারুক বা না-ই পারুক, এ দেশের জনগণ একদিন সেই সহনশীলতা এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শের রাজনীতি প্রবর্তন করবেই।

সারাদেশে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ। কী নিখুঁত নেটওয়ার্ক! একেবারে অব্যর্থ নিশানা। সারাদেশে এতোগুলো বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পিছনে কম করে হলেও এক হাজার বোমাবাজ দুষ্কৃতকারী জড়িত ছিলো। অথচ কোথা থেকেও বিন্দুমাত্র খবর বের হলো না। গোয়েন্দা বিভাগগুলোর ওপরই প্রথমে ব্যর্থতার দায়ভার চাপে স্বাভাবিকভাবেই। নানা ধরনের চিন্তা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরছে। এর মাঝে আমার প্রেস সচিব সুনীল এসে বললো– "স্যার বোমাবাজির ঘটনার ব্যাপারে মিডিয়াতে আপনার একটা বিবৃতি দেয়া দরকার।" পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিতে আমার তেমন কোনো আগ্রহ থাকে না। জানি এ ঘটনায়ও বিবৃতির ঝড় বয়ে যাবে। কিন্তু লাভ কী হবে? কে শুনবে বিবৃতির কথা, আর মানবেই বা কে? বিবৃতির কথা যাদের শোনার কথা তারা কান পাতবেন না। যতো ভালো কথাই বলা হোক না কেনো, যাদের শোনা উচিত তারা বলবেন– শুনি না, শুনবো না। আবার কাজ যাদের করার কথা তারা কিছু করলে বিপক্ষ থেকে বলা হবে– মানি না, মানবো না। এই হচ্ছে বর্তমান রাজনীতির প্রবণতা। 'শুনি না বা মানি না' রাজনীতির মানসিকতা যতোদিন বদলানো না যাবে, ততোদিন এ দেশে সৃষ্টিশীল আর কিছু আশা করা যায় না। যাহোক এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো, কিংবা এমন একটা ভয়ংকর ঘটনার সূত্রপাত হলো– সেই প্রেক্ষাপটে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে আমার কিছু বক্তব্য তো জাতির সামনে পেশ করতেই হয়। সে মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিলো– এ নারকীয় ঘটনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পূর্বেকার ঘটনার আলোকে আমার মনে হলো– বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বা হচ্ছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকায় উঠেছে। ব্যর্থ এবং অকার্যকর রাষ্ট্র

www.pathagar.com

হিসেবেও বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার যে চক্রান্ত রয়েছে তা সফল করতে এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চলতেই পারে। আমি এ প্রতিক্রিয়াই মিডিয়াতে জানাতে বলেছিলাম। সরকারের প্রতি আহ্বান জানালাম– অবিলম্বে বোমাবাজদের গ্রেফতার করার জন্য। সে সাথে দেশবাসীকেও সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান জানালাম। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে কয়েকজন সাংবাদিকও মোবাইলের মাধ্যমে আমার প্রতিক্রিয়া জেনে নিলেন। তাদের মধ্যে কারো কারো পরামর্শ ছিলো– আমি যেনো সফরের কর্মসূচি বাতিল করে ঢাকায় ফিরে যাই। তাতে সরকার আরো কিছুটা বিব্রত হবে। ঘটনাটা আরো ভয়াবহ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। কিন্তু আমি সে পথে পা বাড়ালাম না। বিকেল সাড়ে ৪টায় পাটগ্রামের জনসভায় অংশগ্রহণ করলাম। লাখো লোকের সমাবেশ ঘটেছিলো ওই জনসভায়। একটা উপজেলা সদরে এতো লোকের সমাবেশ ছিলো এক অকল্পনীয় ব্যাপার। এরপর রাত ৮টার দিকে হাতিবান্ধায় দলীয় কর্মিসভা ও উপজেলা সম্মেলনে যোগ দিলাম। কর্মী সমাবেশ হলেও সেখানে মানুষের ঢল নেমেছিলো। রাত দু'টোয় জেলা শহরের মধ্য দিয়ে যখন আমার বাসভবনে যাচ্ছিলাম তখন মনে হয়েছিলো এ যেনো এক মৃতপুরী। সব কোলাহল থেমে গেছে। আতংকে মানুষ যে যার ঘরে ফিরে গেছে। মাথার মধ্যে তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে– কেনো এই বোমা। কোন অপশক্তি রয়েছে এ ঘটনার অন্তরালে!

পরের দিন পত্রিকায় দেখলাম– যা ভেবেছিলাম তাই। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দল দোষ দিয়েছে সরকারকে। আর সরকারি দল দোষ দিয়েছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে। সচরাচর যা ঘটে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আওয়ামী লীগ বলেছে– সরকার এবং সরকারের অভ্যন্তরে যে মৌলবাদী শক্তি রয়েছে তারাই ঘটিয়েছে এই কাণ্ড। আবার সরকারি দলও বলে দিয়েছে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য আওয়ামী লীগ ফুটিয়েছে এই বোমা। এখন কথা হলো ঘটনা, ঘটার সাথে সাথেই যদি দায়িত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টো রাজনৈতিক দল 'ঘটনার তদন্ত শেষ করে' রায় দিয়ে ফেলে তাহলে তদন্তকারী কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর আর কী কাজ থাকতে পারে! প্রশাসন কার কথা শুনবে। যদি বিরোধী দলের কথা বিশ্বাস করে কাজ করতে চায় তাহলে প্রধান বিরোধী দলের রায় অনুসারে সরকারি দলের লোকদের পাকড়াও করতে হয়। আর যদি সরকারি দলের কথা মানতে হয় তাহলে আওয়ামী লীগারদের বেছে বেছে গ্রেফতার করতে হয়। এভাবেই কোনো ঘটনা ঘটে গেলে প্রধান বিরোধী দল ও সরকারি দল পরস্পরকে দায়ী করতে থাকে। আবার দায়ী করা হয় দলগতভাবে। ফলে প্রকৃত দোষীরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিরোধী দল থেকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চরম ব্যর্থতার কথাও বলা হয়েছে। তবে এ ব্যর্থতা তো নতুন কোনো ঘটনা নয়। এ পর্যন্ত যতো বোমা বা গ্রেনেড হামলা হয়েছে তার কোনোটারই সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি, কোনো কূল-কিনারাও

www.pathagar.com

পাওয়া যায়নি। যারা এখন সরকারের ওপর দোষারোপ করছেন তাদের আমলেও এ ধরনের ভয়াল ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃত দোষীরা আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার মধ্য দিয়ে এ ধরনের পৈশাচিকতার যাত্রা শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান, পল্টনে সিপিবির সমাবেশ, গোপালগঞ্জে খৃস্টানদের গির্জা, ময়মনসিংহ ও সাতক্ষীরায় সিনেমা হল, খুলনায় আহমদিয়া মসজিদ, সিলেটে শাহজালালের (রহঃ) মাজার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশ, হবিগঞ্জে শাহ্ এ এম এস কিবরিয়ার সমাবেশ, সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের সমাবেশ, আখাউড়ায় খড়মপুর মাজার পিশাচদের বোমা বা গ্রেনেড হামলার শিকার হয়েছে। সর্বশেষ সফল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গোটা দেশকে একযোগে বোমা হামলার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। বোমাবাজদের শেষ হামলায় হতাহতের ঘটনা বড় কিছু না হলেও ঘটনাটি সবচেয়ে বড়। এই হামলাকারীদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট না হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিলো না। অর্থাৎ অপশক্তি সারা দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছে। দেশের বর্তমান দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের শাসনামলেই এই বোমা হামলার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– কোনো পক্ষই ইতিপূর্বে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের ধরার চেষ্টা না করে রাজনৈতিক শত্রুদেরই ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে। ফলে দোষীরা থেকেছে নিরাপদে। তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮ আগস্ট তারিখে অর্থাৎ বোমা হামলার পরের দিন নীলফামারীতে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিলো। এই জেলাতেও বোমা হামলা হয়েছে। এদিকে ঢাকা থেকে খবর এসেছে সৌদি আরবের নতুন বাদশা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই আমন্ত্রণ আমার জন্য অনেক সম্মানের এবং অনেক মর্যাদার। তার জন্য ১৯ তারিখেই আমাকে সৌদি আরবে পৌঁছাতে হবে। তা সত্ত্বেও আমি নীলফামারীতে আমার কর্মসূচি বাতিল করলাম না। সেখানে জেলা সম্মেলন শেষ করেই রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশে। পরের দিন সকালে সৌদি আরবের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলাম।

তখনো ১৭ আগস্টের সারাদেশে একযোগে বোমা হামলার হোতাদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তবে সৌদিতে বসে শুনলাম– হামলাকারীদের অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং তারা ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকারও করেছে। প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে যে, জামা'আতুল মুজাহিদিন ও আহলে হাদিস বাংলাদেশ নামের দু'টি সংগঠন বোমা হামলার ঘটনার সাথে জড়িত। তাদের ক্যাডার বাহিনী, যাদের ইসলামী জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে– তারাই এ হামলা পরিচালনা করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে 'ইসলামী জঙ্গি' তৎপরতা আছে বলে যে অপপ্রচার হয়ে আসছিলো, দৃশত তার প্রাথমিক প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া গেলো। এর ফলে ক্ষতি যেটুকু হবার তার প্রাথমিক সোপান রচিত হলো। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান সাহেব অকাতরে স্বীকার করেছেন যে তাদের ভুল ভেঙেছে। তিনি বলেছেন, সরকার অতীতে জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব বুঝতে পারেনি। তবে ১৭ আগস্টের দেশজুড়ে বোমা হামলার পর এই ভুল ভেঙ্গেছে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই– সরকারের ভুল যদি ভেঙে থাকে তাহলে ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করুন। এ পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ এবং নিম্নপর্যায়ের কর্মীমাত্র। এদের যারা পরিচালনা করেছে তাদের আড়ালে রেখে সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব হবে না।

যারা গ্রেফতার হচ্ছে– তারা পুলিশকে কী তথ্য দিয়েছে জানি না– তবে দেশের মাদ্রাসাগুলোতে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঢালাওভাবে মাদ্রাসাকে দোষী করা হচ্ছে। এর কোনো যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না। সাধারণত অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়তে দেয়া হয়। পরিবারে থাকলে হয়তো তাদের লেখাপড়া করা সম্ভব ছিলো না। অন্তত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথাও যদি চিন্তা করা হয়– তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, দেশের মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়– পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রাখছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তারে স্বতন্ত্র নীতিমালা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রছাত্রীদের চল্লিশ ভাগই অমুসলিম এবং তারা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। যা হোক, আমাদের দেশের মাদ্রাসার মধ্যে এমন মাদ্রাসাও আছে যেখানে ছাত্রদের দু'বেলা ঠিকমত খাওয়াও চলে না। অনুদানের অর্থে অধিকাংশ মাদ্রাসা চলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়বে কিংবা বোমা হাতে নিয়ে পরিকল্পনামাফিক বিস্ফোরণ ঘটাবে– এটা আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়। তবে দুষ্টক্ষত সব জায়গাতেই থাকতে পারে। যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক এটা আমি একান্তভাবে কামনা করি। তবে ঢালাওভাবে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের শিক্ষালয়কে দোষী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়।

কিছু কিছু পত্রিকা হামলাকারীদের ইসলামী জঙ্গি বলে প্রচার করেছে। এই দুষ্কৃতকারীদের পরিচয়ের সাথে 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহারে আমার ঘোর আপত্তি আছে। ইসলাম একটি পবিত্র শব্দ। এর সাথে কোনো জঙ্গিবাদের সম্পর্ক থাকতে পারে না। হয়তো যারা এই জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িয়ে পড়েছে তারা ইসলামী বেশভূষায় ছদ্মবেশ ধারণ করে। এরা কোনোভাবে ইসলামের মিত্র নয়। যারা এ কাজটি করছে তাদের সমূলে দমন করতে না পারলে সমাজদেহ থেকে এই বিষ নামানো যাবে না। ইসলাম তো শান্তির ধর্ম। সন্ত্রাস করা, মানুষ খুন করা, বোমাবাজি বা অস্ত্রবাজি করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা তো ইসলামী আদর্শের চরম পরিপন্থী। একযোগে বোমা হামলার সাথে যে লিফলেট

www.pathagar.com

ছড়ানো হয়েছে তাতে ইসলামের সেবার কথা এবং ইসলামী শাসন কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে এ ঘটনার সাথে কোনো ইসলাম-প্রীতি কাজ করে না। বরং ইসলামকে হেয় করার গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করে। অথবা এর পেছনে কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কুটিল তৎপরতা কাজ করছে। তারা কোন বেশে, কোন পরিবেশে আছে তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। শনাক্ত করা হবে কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

একটি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয়ভাবে খুবই অনুভূতিশীল। সার্বিকভাবে তারা ধর্মপ্রাণ। ধর্মের প্রতি কোনো অবজ্ঞা এ দেশের কোনো মানুষ সহ্য করে না। কেউ ধর্মের প্রতি অবহেলাও করে না। এখানে কেউ হয়তো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বা নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। আবার কেউ হয়তো সেভাবে করে না। তবে যে যার ধর্মের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষই মুসলমান। পবিত্র ইসলামকে তারা পরম শ্রদ্ধায় মনের গভীরে লালন করে। বাংলাদেশে ইসলাম বিপন্ন হবার মতো কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যে, তাকে রক্ষার জন্য 'জিহাদে' লিপ্ত হতে হবে। ইসলাম এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। তবে যে কোনো মুসলমান জীবনভর ইসলামের সেবায় কাজ করে যেতে পারেন– ইসলামী আদর্শের শিক্ষা প্রচার করতে পারেন। কেউ ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে তাকে পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে এমন নেতিবাচক পরিবেশের কোনোটাই এখানে সৃষ্টি হয়নি। তাহলে কেনো ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে এ ধরনের তৎপরতা চলবে। এটা কোনোভাবেই ইসলামের আদর্শ অনুসারীদের কাজ হতে পারে না। ইসলামের মতো পবিত্র আদর্শ বোমা মেরে বা আতঙ্ক ছড়িয়ে প্রতিষ্ঠার মতো বিষয় নয়। এটা স্পষ্ট যে, এসব নৈরাজ্যকর ঘটনা ঘটানোর পেছনে কোনো ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের ভাবধারা কাজ করে না। আসল উদ্দেশ্যের ফাঁদটি আবিষ্কার করতে হবে এবং ধরতে হবে সেই ফাঁদের শিকারীদের। তারা কারা– আশা করি সরকার ইচ্ছা করলে বা চেষ্টা করলে তাদের হাত বাড়িয়েই ধরে ফেলতে পারবে।

যে দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম– সেখানে ইসলামের জন্য গোপন সংগঠন করতে হবে কেনো? ইসলামের নামে যারা সংগঠন করবেন– তাদের সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে কেনো? ধর্মের নামে যারা কাজ করবে মানুষ তো তাদের মাথায় করে রাখবে। বলা হচ্ছে, ইসলামী জঙ্গিরা গোপন তৎপরতা চালাচ্ছে। ইসলামে তো গোপনীয়তার কিছু নেই। সারাবিশ্বের মানুষের জন্য তা উন্মুক্ত। ১৭ আগস্টের ঘটনার সাথে যে দু'টি সংগঠনের সম্পৃক্ততার কথা জানা গেছে– প্রকাশ্যে তাদের কেনো তৎপরতা দেখা যায়নি। এদের কোনো সভা সমাবেশ হয় না, কোনো সম্মেলন-মজলিশ অনুষ্ঠিত হবার খবরও দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

একটি বিষয় সরকারকে গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে যে, যারা এ নাশকতা চালিয়েছে সেসব জঙ্গিরা অবশ্যই গোপনীয়ভাবে অত্যন্ত সুসংগঠিত। তবে এ ধরনের গোপন জঙ্গি সংগঠন কিন্তু গোপনীয়তার বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। যারা এটা ঘটিয়েছে অবশ্যই এদের গণসংগঠন আছে এবং তারা সাধারণ মানুষের সাথে মিশে কাজ করে। তাদের চেনা যায় না– ধরাও যায় না। সরকারকে বলতে চাই– চেষ্টা করে দেখুন এই সাধুবেশী শয়তানদের শনাক্ত করতে পারেন কিনা। তা না হলে এদের হিংস্র নখরগুলো কখন বুকে থাবা বসাবে– আত্মরক্ষার সুযোগও পাওয়া যাবে না। সুতরাং ভুল যখন ভেঙেছে– সংশোধনের চেষ্টা করুন। যারা ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামী শাসন কায়েমের নামে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বোমাবাজি-সন্ত্রাস করে ক্ষমতা দখল করতে চায় তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। ইসলামকে যদি ভালোই বাসেন তারা– তাহলে ইসলামের প্রদর্শিত পথেই তাদের ফিরতে হবে। আর সেটা হচ্ছে শান্তির পথ।

তবে যত কথাই যতভাবে বলি না কেনো দেশের পরিস্থিতি ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হচ্ছে না– এটাই সত্য। সরকার হয়তো দেশব্যাপী বোমা হামলার ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু ভেতরের বিষ কতটা তুলে ফেলতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বহিঃশক্তির ষড়যন্ত্র যদি থাকেও তাহলে তারা কখনোই সফল হতে পারবে না– যদি দেশীয় এজেন্ট না থাকে। দেশের মধ্যে যারা বোমা ফেলছে তারা বাইরে থেকে আসছে না– এরা দেশেরই লোক। কেনো এরা নিজ দেশের নিজের জাতির এবং আপনজনদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে, কেনো এরা দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে, দেশকে সন্ত্রাসী, ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে এরা কোন ফায়দা লুটতে চাচ্ছে? এদের বিরুদ্ধে গোটা দেশপ্রেমিক, ধর্মপ্রেমিক গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আগে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে সবাই ঐকমত্যে আসুন! দেশ, জাতি ও ধর্মের শত্রুদের চিহ্নিত করতে সব ভেদাভেদ ভুলে যান। নিছক ক্ষমতার লোভে জাতীয় স্বার্থকে কেউ জলাঞ্জলি দেবেন না। ক্ষমতায় কে আসীন হবেন– তা নির্ধারণের দায়িত্ব সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর ছেড়ে দিন। কারো দাবি বা কারো কোনো কথা শুনি না, শুনবো না– এই প্রবণতা পরিত্যাগ করুন। কোনো কিছু মানি না– মানবো না, এই মানসিকতা ছেড়ে দিন। সবাই সহনশীলতা এবং সমঝোতার পথে আসুন। দেশের সমস্যা, সংকট এবং দুষ্টক্ষতগুলো অপসারণে আমরা সবাই যদি একমত হতে পারি– তাহলেই হয়তো একটা সুন্দর-সমৃদ্ধ দেশ আমরা উপহার দিতে পারবো।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে প্রথম সার্ক সম্মেলন এবং আজকের প্রেক্ষাপট

কিছুদিন আগে ভারতের ইটিভি নামের একটি টিভি চ্যানেলের একজন সাংবাদিক এসেছিলেন আমার সাক্ষাৎকার নিতে। সাক্ষাৎকালে আমাকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন সেই রিপোর্টার। তার প্রশ্নমালার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো যে, একজন বিরোধী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আসন্ন সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি কতটা আশাবাদী এবং বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা। আমি এ প্রশ্নের ব্যাপারে এক সেকেন্ড চিন্তা না করেই বলেছিলাম যে, বাংলাদেশে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি খুবই আশাবাদী এবং সম্মেলন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ অবশ্যই আমাদের দেশে বিরাজ করছে। আমরা ঐতিহ্যগতভাবেই অতিথিপরায়ণ। অতিথির অভ্যর্থনা, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, তাদের নিরাপত্তা বিধান এবং স্বচ্ছন্দ অবস্থান নিশ্চিত করতে দেশের জনগণ ও সরকার সর্বতোভাবে নিবেদিত। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে ছোটখাটো ঘটনার অবতারণা হয়ে থাকে। সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমাদের মেহমানদারিতে তার সামান্য প্রভাব পড়বে না। সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ। আর সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে এই সংস্থার সাফল্য, আরো কার্যকারিতা এবং সঠিক সময়ে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করি।

আমার উত্তর শুনে ইটিভির সেই সাংবাদিক উৎফুল্লভাবে মন্তব্য করলেন যে– আমি নাকি রাষ্ট্রনায়কোচিত জবাব দিয়েছি। এই প্রশংসায় আমি বিগলিত হইনি। কারণ আমি যা বিশ্বাস করি সেটাই বলেছি। সাংবাদিক আমাকে জানালেন যে, তিনি বাংলাদেশে এসে আরো কয়েকজন বিরোধী রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এবং তাদের কাছেও এই প্রশ্নটি তিনি করেছেন। তারা নাকি এর উত্তরে বলেছেন– যেখানে আমাদের নিজেদের কোনো নিরাপত্তা নেই– সেখানে বিদেশী মেহমান এলে তাদের নিরাপত্তা দেবে কে? সুতরাং সার্ক সম্মেলন হওয়া নাকি সম্ভব নয়। আমি জানি না, কোন রাজনৈতিক নেতা এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। যিনি বা যারা এই মন্তব্য করেছেন তাদের নামও আমি শুনতে চাইনি। আমি বলবো, যদি কেউ সত্যিই এ ধরনের মন্তব্য

www.pathagar.com

করে থাকেন, তাহলে তিনি জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে কথা বলেছেন। ঢাকায় সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়টি আমাদের জাতীয় সম্মানের ব্যাপার। এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তির সম্মান বড় নয়– মুখ্য হলো দেশের বিষয়। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় সার্কের ত্রয়োদশতম সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে– বাংলাদেশে নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলে সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। সার্ক সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় আমি ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম।

১৯৮৫ সালের ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার যে যাত্রা শুরু হয় তার মাধ্যমে এ উপমহাদেশে সহযোগিতার নতুন আশার আলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিলো। আর সে আলোর মশাল প্রথম আমিই হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আবার ঢাকায় সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ উপমহাদেশের ৭টি দেশের মধ্যে ঐক্য আরো সুদৃঢ় করার নেতৃত্ব বাংলাদেশের হাতে আসবে– সে অনুভূতি আমাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলেছিলো। সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা মনে পড়লেই স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে অনেক গৌরবের কাহিনী। ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে ৭টি দেশের পথ ভ্রমণ করে আবার সার্ক ঢাকায় ফিরে আসবে– এই অনুভূতি আমাকে মোহবিষ্ট করে তোলে। কারণ এখানে আমার আনন্দ-উচ্ছ্বাস-উদ্বেলতা, হৃদয়ের মধুর শিহরণ এবং প্রাণের স্পন্দন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। তাই ফেব্রুয়ারিতে যখন ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়– তখন আমি দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলাম। তারপরও আশাবাদী ছিলাম– আগামী কোনো এক সময়ে ঢাকায় সার্ক সম্মেলন অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি ঘোষিত তারিখে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। সার্কের সাথে যেনো আমার আত্মার গভীর সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। কারণ এটা আমার শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ঘটনা। এ উপমহাদেশের ৭টি দেশের মধ্যে প্রথম ঐক্য ও একতার বন্ধন সূচিত হয়েছিলো এই সার্কের মাধ্যমে। জাতীয় চিন্তা-চেতনার বাইরেও আমি ব্যক্তিগতভাবে সার্কের দৃঢ় পায়ে অব্যাহত পথচলা কামনা করি এ কারণেও যে, আমি এই সংস্থার প্রথম চেয়ারম্যান। আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে ইতিহাসকে মুছে ফেলা বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা আছে। তবে সার্ক যদি টিকে থাকে– তাহলে আমি যে এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলাম এই সত্যকে কেউ ঢেকে রাখতে পারবে না। তাই আমি সর্বদা সর্বান্তকরণে সার্কের সাফল্য কামনা করি।

দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্যপীড়িত, জনসংখ্যার ভারে নুয়ে পড়া, অনগ্রসরতার যাঁতাকলে পিষ্ট এবং অপরদিকে বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির ধারক-বাহক ৭টি দেশকে নিয়ে গঠিত অঞ্চলে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের অঙ্গীকার নিয়ে জোট গঠন ছিলো এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি সেই ইতিহাসের

www.pathagar.com

এক সাক্ষী, সংগঠক এবং এক চরিত্র। এই ইতিহাস সৃষ্টি করতে গিয়ে আমাকে কতো অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, কিংবা কতোটা সুনিপুণভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়েছে– তা আমার স্মৃতিপট থেকে এখনো বিলীন হয়ে যায়নি। যতোদিন সার্ক টিকে থাকবে, ততোদিন ইতিহাস সমস্বরে ঘোষণা করবে– ঢাকা সার্কের সূতিকাগার, আমি সার্কের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। অনেক বাধা-বিপত্তি পার হয়ে আবার ঢাকায় সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেখে আমি নতুনভাবে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। আজো মনে পড়ে– সার্কের জন্ম উপলক্ষে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠা সেই কবিতাটি এখানে উল্লেখ করে আমার সে দিনের অনুভূতিটা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে চাই।

"মহান লক্ষ্যের সম্মুখে যে স্বপ্নের বিস্তার
সাতটি সম্ভাবনার সৌরভ দক্ষিণ এশিয়ার
বিশ্বাসে প্রতিফলিত এবং মিলিত এখন
সম্মানে, জীবনের গানে আর ফসলের ঘ্রাণে।

পাহাড়, সমুদ্র, নদী, রংধনু দৃশ্যের দ্বীপে
সূর্যের পটভূমি তো এখনো মিথ্যে নয়
শান্তি অগ্রগতির ঝাঁক আসবে আলোতে
পৃথিবীর এই অংশের অন্ধকার সরাতে।

সহযোগিতা ক্রমেই যদি সহজতর হয়
পারস্পরিক আদান-প্রদানে বন্ধুর বন্ধন
এবং প্রশস্ত প্রগতির পথে সংঘবদ্ধ শপথ
প্রসারিত হবেই একদিন ভাগ্যকে ঘোরাতে।

সভ্যতার ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরব
খুঁজে পাবে উন্নত জীবন ঝংকার,
পরিচিত পদক্ষেপ হবে পুষ্পিত আবার,
আকুল আগ্রহে জীবন গড়ে তুলবার।"

এই সার্কের ত্রয়োদশ সম্মেলনকে সামনে রেখে স্মৃতির দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে প্রথম সম্মেলনের অন্য ৬ জন সম্মানীত নেতার কথা। সেই প্রথম সম্মেলনে ভারত থেকে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, শ্রীলংকা থেকে প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস জয়বর্ধনে, নেপাল থেকে রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেব, ভুটান থেকে রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক এবং

www.pathagar.com

মালদ্বীপ থেকে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম। প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সাত দেশের সাত নেতার মধ্যে চারজনই বেঁচে নেই। এই চারজনের তিনজনই দুঃখজনক মৃত্যুবরণ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেব নিহত হয়েছেন। তাঁদের স্মৃতি আমাকে আজো কাঁদায়। স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস জয়বর্ধনে। প্রথম অংশগ্রহণকারী সাত নেতার মধ্যে বেঁচে আছি আমি সার্কের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম এবং ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক। প্রেসিডেন্ট গাইয়ুম এবারের সম্মেলনেও যোগদান করছেন। তিনি ভাগ্যবান– এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সবক'টি সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ভুটানের রাজা গত ফেব্রুয়ারিতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ছিলো সেখানে যোগ দিতেন না। এবার তিনি আসবেন কিনা তা এখনো নিশ্চিত জানি না। আমি সার্কের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময় কতোটুকু সম্মান পাবো জানি না– ইতিহাসের প্রতি সম্মান দেখানোর প্রবণতা আমাদের দেশে নেই বললেই তো চলে।

সার্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকায়। এটা ছিলো দেশের জন্য গৌরবের। এই সম্মেলন প্রথমবারের মতো ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে– সেটাই শুধু গৌরবের কারণ ছিলো না– ওই বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জাতিসমূহকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য ও বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে আগামী দিনের সমস্যা মোকাবেলা করার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে। সাতটি দেশের সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালোনোর রাজনৈতিক সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম আমরা সাত নেতা। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম প্রথম সার্ক চেয়ারম্যান, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার নেতা। অথচ সেই আমাকেই রাজনৈতিক কারণে জেলে পাঠানো হয়েছিলো। এ অঞ্চলের নেতৃত্বের মর্যাদার কথাও বিবেচনা করা হয়নি। যা হোক, আমি আমার কষ্টের কথা ভুলে গেছি– ভুলে যেতেও চাই। তবুও বলতে হয়– দেশের একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে, সার্কের প্রথম চেয়ারম্যানকে কারারুদ্ধ করায় জাতি কতো কি অর্জন করেছে কিংবা হারিয়েছে– সে বিচার একদিন জনগণই করবে। সার্কের প্রথম চেয়ারম্যানকে ত্রয়োদশ সম্মেলনে কীভাবে স্মরণ করা হয়– সেটাই এখন দেখার বিষয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্কের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন– আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি। একান্তভাবে আশা করি– তিনি তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে সার্ককে আরো কার্যকর করে তুলতে পারবেন। সার্কের প্রবক্তা বাংলাদেশের মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব তিনি আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

ইতিহাসে যার যে অবস্থান, যার যে অবদান– আমি তা সব সময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সার্ক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের মে মাসে। তিনি সার্কের স্বপ্ন দেখেছিলেন এটা যেমন সত্য, তার বাস্তব রূপ দিয়েছিলাম আমি এটাও সত্য। কিন্তু এই সত্যকে অনুচ্চারিত রাখা হয়। সার্কের প্রস্তাব উত্থাপনের পর এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছিলো আমাকেই। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা ঘোষণা' গৃহীত হয় এবং ৯টি নির্বাচিত ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার আন্তর্জাতিক কার্যক্রম চালু করা হয়। শেষ পর্যন্ত থিম্পুতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠান। গোটা জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো নতুন প্রেরণা। তখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের কথা হলো আজ যারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সার্কের স্বপ্নপুরুষ অভিহিত করে সার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য গর্ববোধ করেন, সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রার প্রাক্কালে তাদের মধ্যে কিন্তু আনন্দ-উল্লাস পরিলক্ষিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়া যে প্রস্তাবের উত্থাপন করেছিলেন, আমি তার সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলাম– এটাই আমার সফলতা। আমি বলি না যে– সার্ক একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। আমার উদ্যোগে তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তাই এই কৃতিত্বটুকু আমার ভাগ্যে জুটেছে। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা-আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়ে স্বাধীনতা এসেছে। সেই পথ চলার মধ্যে যথার্থ সময়ে স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে। এই কৃতিত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যায় না। সার্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমার ওপরও কিছু কৃতিত্ব এসেছে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে। সার্কের মূল চেতনা ও লক্ষ্য যদি বাস্তবায়িত হয়, তাতে আমি যে কতো আনন্দিত হবো– সে কথা ব্যক্ত করতে পারবো না। কারণ, এটা ছিলো আমার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক সাফল্য।

আমরা যখন সার্ক নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখনকার প্রেক্ষাপট আর বর্তমান প্রেক্ষাপটের মধ্যে কিছুটা তারতম্য দেখা দিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। তখন আমাদের এ অঞ্চলের সামনে বড় সমস্যা ছিলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। ১৯৮৫ সালে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মোট জনসংখ্যা ছিলো ৯৩ কোটি ৬২ লাখ। বর্তমানে সে জনসংখ্যা ১৩৬ কোটি। তবে ১৯৮৫ সালের আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার ছিলো– পরবর্তী পর্যায়ে সে হার গড়ে কমে এসেছে। তখন বিশ্বব্যাংকের যে হিসাব ছিলো তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা দেড়শ' কোটিরও ওপরে চলে

www.pathagar.com

যেতো। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো ১০ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ২.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে সেই হার অব্যাহত থাকলে দুই হাজার সালেই বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৭০ লাখে উন্নীত হয়ে যেতো। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের হয়তো মনে থাকবে যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের জন্য আমি জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছিলাম। সার্ক অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কর্মসূচির কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অকল্পনীয় পর্যায়ে কমে এসেছিলো। সে কারণেই দুই হাজার সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটিতে পৌঁছায়নি। ২০০৪ সালে এসে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার শাসনামলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। শুধু বিনামূল্যে বিতরণই নয়, পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর আমার গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর চড়া মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে গেছে। আমার শাসনামলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলাম তা অব্যাহত থাকলে বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটির ওপরে যেতো না।

সার্ক যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ ছিলো দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে। ৮ কোটি ৮১ লাখ জনসংখ্যা নিয়ে পাকিস্তান ছিলো তৃতীয়। তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ২.৮ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব মতে দুই হাজার সালে পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৪ কোটিতে উন্নীত হবার কথা ছিলো। পাকিস্তান জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বর্তমানে তাদের জনসংখ্যা ১৫ কোটি। সে হিসেবে আমাদের উন্নতি হয়েছে। জনসংখ্যায় আমাদের দ্বিতীয় স্থান পাকিস্তান দখল করেছে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তান আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। পাকিস্তানে বর্তমানে মাথাপিছু আয় ৪৪৫ মার্কিন ডলার এবং জিডিপি ২৮২ বিলিয়ন ডলার। সেখানে বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় ৪০০ ডলার এবং জিডিপির পরিমাণ ১৮৭ বিলিয়ন ডলার। অথচ এমনটি হবার কথা ছিলো না। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে, দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ বিনষ্ট না হলে, একের পর এক শিল্প-কারখানা বন্ধ না হলে, কিংবা দেশ বিদেশী পণ্যের বাজার না হলে আমাদের মাথাপিছু আয় এবং ডিজিপি অনেক বেড়ে যেতো।

বিশ্বে অনেক বিষয়েই অনেক শীর্ষ বৈঠক হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানের নজির ইতিপূর্বে ছিলো না। সে দিক থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ বৈঠকটি ছিলো অনেক দৃষ্টিকোণ থেকেই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মধ্যে অনেক বিষয়েই অনৈক্য ও ঐতিহ্যগত ভিন্নতা ছিলো এবং এখনো আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা

www.pathagar.com

অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। এই ৭ দেশের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাও আছে। যেমন– মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ইরাক সেনা অভিযান চালিয়ে কুয়েত দখল করে নেবার পর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আমি ইরাকের বিরুদ্ধে সৌদি আরবে সৈন্য প্রেরণ করেছিলাম। প্রতিবেশী ভারত আমার নীতিতে একমত ছিলো না। তা সত্ত্বেও সার্কের ইস্যুতে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। সার্ক প্রতিষ্ঠার আগেও জাতিসংঘের মঞ্চে আমাদের ৭ দেশ সব সময় অভিন্ন কণ্ঠে কথা বলেনি। আসিয়ান বা ইইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যে রাজনৈতিক সমঝোতা বিদ্যমান ছিলো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তা ছিলো না। তা সত্ত্বেও আমরা শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হতে পেরেছিলাম এবং একটা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছি। আমরা সার্কের অধীনে সহযোগিতার যেসব ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেছিলাম– তার মধ্যে ছিলো শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম, ক্রীড়া, কৃষি ও বনজ সম্পদ, শিল্প ও সংস্কৃতি, আবহাওয়া, টেলিযোগাযোগ, পর্যটন, পল্লী-উন্নয়ন, পরিবহন, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধ, উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

আমরা সার্কের আওতায় যে নীতিসমূহ গ্রহণ করেছিলাম– সে স্মৃতিগুলো এখনো আমার স্মৃতির দৃশ্যপটে ভাস্বর হয়ে আছে। আমরা যে নীতি প্রণয়ন করেছিলাম, তার মধ্যে ছিলো এ অঞ্চলের প্রায় শতকোটি মানুষের উন্নয়নের প্রচেষ্টা। এখন সার্কের আওতায় আছে ১৩৫ কোটি মানুষের বাস। সার্কের নীতি হচ্ছে সদস্য দেশগুলো কেউই পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং পরস্পরের সার্বভৌমত্ব মেনে চলবে। এর মধ্যে তারা পারস্পরিক মৈত্রী গড়ে তুলবে এবং নির্ধারিত ক্ষেত্রে অপরকে সাহায্য করার নীতি পালন করবে। তাই সার্কের নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিলো– প্রথমত সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা কল্যাণকর হবে সেই বিশ্বাস, দ্বিতীয়ত জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ সংস্থাগুলোর সনদের নীতিতে অবিচল থেকে এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার উন্নয়ন কামনা এবং তৃতীয়ত সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, শক্তি প্রয়োগ না করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধ মীমাংসার নীতি উজ্জীবিত ও সমর্থন করা। আমরা ঢাকা ঘোষণায় যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম সেগুলো ছিলো– পারমাণবিক অস্ত্ররোধ, স্বল্পোন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মুদ্রা ও লগ্নির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বৈঠক আহ্বান, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সম্পূরক অর্থনীতি, জাতীয় ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার তাগিদ। তখন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষের সংস্থার পক্ষ থেকে ঢাকা ঘোষণা এক অনন্য ঘোষণার মর্যাদা লাভ করেছিলো। সেই অনুভূতি আজো আমাকে আন্দোলিত করে। সেই ঘোষণা লিপিবদ্ধ হয়েছিলো চৌদ্দটি অনুচ্ছেদে। আমরা সার্কের ৭ নেতা একযোগে

www.pathagar.com

আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, নবগঠিত সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং শান্তি ও সমষ্টিগত আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার মনে পড়ে সার্কের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে একজন সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি বাংলাদেশের স্বার্থ বেশি করে দেখবেন, না সার্কের স্বার্থ দেখবেন বেশি? উত্তরে আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি বাংলাদেশের স্বার্থই বড় করে দেখবো। আবার সার্কের চেয়ারম্যান হিসেবে সদস্য সাতটি দেশের স্বার্থই দেখবো।

যে সহযোগিতার দ্বার আমরা উন্মোচন করেছিলাম সে পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো তাও নয়। বৈচিত্র্যের পটভূমিতে দারিদ্র্য জয়ের অভিন্ন তাগিদ দক্ষিণ এশিয়ায় অবশ্যই ছিলো। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধও কম ছিলো না। প্রথম সার্ক সম্মেলনের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বন্দ্ব-বিরোধের কথা এখানে আর উল্লেখ করতে চাই না। তবে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সমস্যা অবশ্যই ছিলো এবং সেসব সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার আকাশকে বারবার মেঘাচ্ছন্ন করেছে। আন্তর্জাতিক কমিটমেন্ট থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ সমাজ ব্যবস্থা পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে সাত দেশের মধ্যে ভিন্নতা ছিলো। তখন পুরনো এবং নতুন উভয় ধরনের বৈরিতা ছিলো। আবার নতুন-পুরনো মৈত্রীবন্ধনও ছিলো। তখন অনেক বৈরী বা বিরোধী ভাবনা পেছনে রেখেই সার্ক গঠিত হয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের এ অঞ্চলে আর একটি হিমালয় জয়ের মতো সাফল্য আমরা অর্জন করেছিলাম সার্ক নিয়ে যাত্রা শুরু করার মাধ্যমে।

কবিতার উষ্ণ স্পন্দনে মোহিত হয়ে আমরা সমাপ্তি টেনেছিলাম ঐতিহাসিক প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের অধিবেশন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ ইংরেজিতে উদ্ধৃত করেছিলেন। এ অধিবেশনেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা– "বাংলার মাটি বাংলার জল" ইংরেজিতে পাঠ করেছিলেন। সমাপ্তি অধিবেশনে রাজীব গান্ধী বাংলা উচ্চারণে পাঠ করেছিলেন– আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের "চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজেমাদল" কবিতার চারটি লাইন। তিনি বলেছিলেন, আজকের এই শীর্ষ সম্মেলন আমাদের সাত জাতির জন্য এক নতুন প্রভাতের সূচনা করবে। তাই কবি কাজী নজরুলের কবিতার কথা স্মরণ করি– "ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত/আমরা আনিব রাঙা প্রভাত/ আমরা টুটাবো তিমির রাত/ বাধার বিন্দ্যাচল।" রাজীব গান্ধীর সেই বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি এখনো আমার মনে ঝঙ্কারিত হয়। তার করুণ মৃত্যুর ঘটনা এখানো আমাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। সার্কের এই সমাপ্তি অধিবেশন দিনের সকাল বেলা আমার মনেও একটি কবিতার জন্ম হয়েছিলো। সেই নতুন প্রভাতে লেখা কবিতাটি আমি সমাপ্তি অধিবেশনে পাঠ করেছিলাম। সে কবিতাটিও এই স্মৃতি মন্থনের মাঝে উল্লেখ করতে চাই।

www.pathagar.com

"একশো কোটি মানুষের উষ্ণ স্পন্দনে
ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা নিবিড় বন্ধনে
স্বপ্ন সার্থক হলো সাতটি দেশে
শপথ সত্য হলো সহযোগিতায় এসে।

সূর্যের আলোতে আজ সাতটি পতাকা
আশা-ভরা আঙ্গিনায় জ্বল জ্বল উড়ছে
বিশ্বাস আমাদের আর রূপ কথা নয়
সমঝোতার মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়।
পৃথিবীর উৎসুক চোখ আমাদের কাছে
প্রমাণ করেছি আমরা মিলনের মাঝে
ইচ্ছা যদি থাকে ভ্রাতৃত্ব বাড়ানোর
পথ হয়েই যায় সম্মতি সংগ্রহের
অসংখ্য মানুষের দুয়ারে আমাদের
পৌঁছে দিতে হবে উন্নত জীবন
দূর করে দিতে হবে দুঃখ দারিদ্র্য
করতে হবে শিক্ষার সুযোগ আরো ব্যাপ্ত
মিলে মিশে প্রতিনিয়ত পরস্পরকে ভালোবেসে।"

গত ২০ বছরে এই অঞ্চলের মধ্যে আরো অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আজকের প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি- সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো আরো সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে। সার্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসের অস্তিত্ব ছিলো না। কয়েকটি দেশের ভেতর রাজনৈতিক কারণে গোলযোগ বা কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ ছিলো। কিন্তু সামাজিক সন্ত্রাস ছিলা না। এখন বাংলাদেশের মতো প্রায় সব দেশের মধ্যেই কমবেশি সামাজিক সন্ত্রাস আছে। সন্ত্রাসীরা অপরাধ করে পালিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ঢুকে পড়ছে। এসব সন্ত্রাসী আটক করা এবং তাদের সংশ্লিষ্ট দেশের প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। কোনো দেশের সন্ত্রাসী বা অপরাধী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে যাতে রক্ষা না পায় সে ব্যাপারে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। এ অঞ্চলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সার্কের ভূমিকা থাকলে কার্যকর ফল পাওয়া যেতে পারে। নদী শাসন, বাঁধের মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক গতি থামিয়ে দেয়া হলে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবেই। এ ব্যাপারে সার্ক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা ব্যবস্থা সহজ ও শিথিল করার প্রয়োজন আছে। আমরা যে ৭টি দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছি- সাধারণ মানুষ যেনো তা অনুভব করতে পারে। সার্কের দেশগুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য সৃষ্টির একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এ ধরনের আরো কিছু অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সার্কের আওতায় নিয়ে এলে এই সংস্থার গুরুত্ব, কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আরো প্রসারিত হবে।

www.pathagar.com

জোট সরকারের চার বছর এবং কিছু মূল্যায়ন

বর্তমান সরকারের সামনে আর মাত্র একটি বছর বাকি। চার বছর তারা পার করে এসেছে। গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির প্রতি একান্তভাবে আস্থাভাজন একজন রাজনীতিক হিসেবে প্রত্যাশা করি যে, সরকারের বাকি সময়টা সুন্দরভাবে কাটুক। বর্তমান দুনিয়ায় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। এ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদকাল পূর্ণ করা অন্যতম একটি শর্ত। আশা করি, সরকার সে শর্ত পূরণ করতে পারবে। তবে গণতান্ত্রিক সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদকালের মধ্যে শেষের বছরটি যায় নিজেদের ঘর গোছানোর কাজে। তাই বর্তমান সরকার যে পঞ্চম বর্ষে পা দিতে যাচ্ছে– এই সময়টা তারা হয়তো পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রক্রিয়ায় বেশি ব্যস্ত থাকবে। সে কারণে যে চারটি বছর তারা ক্ষমতায় ছিলো ওই সময়টাই তাদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সময় বলে ধরে নিতে হবে। এই সময় বর্তমান সরকার কতটুকু ব্যর্থ বা সফল হয়েছে– সেটাই আসল কথা। বাকি সময়ে উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে বেশি– বাস্তবায়ন হবে সামান্য।

বর্তমান সরকার যখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করতে যাবে সে মুহূর্তে পেছনে ফিরে তাকালে বিগত দিনের ছবিগুলোকে আমরা কেমন দেখতে পাবো সেটাই দেখা যাক। অতীতের ওপর পা রেখেই বর্তমানকে চলতে হয়। সেই চলার মধ্য দিয়েই পড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ। বিগত দিন যদি গৌরবের হয়– তাহলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎও সেভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমান সরকারের পেছনের দিনে স্মরণ করার মতো ইতিবাচক স্মৃতি তো তেমন কিছু নেই। সত্যি বলতে কী– ব্যর্থতার গ্লানিই এ সরকারকে বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবে বর্তমান সরকারেরও বেশকিছু ভালো কাজের নজির আছে। কিন্তু সে নজির দূরাকাশে মিটি মিটি তারার মতো জ্বলে। তাও প্রায় সময় ব্যর্থতার কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। সরকারের তৃতীয় বছরের আগস্ট মাসে যখন একটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা হলো তখন সন্ত্রাসের কালো ধোঁয়ায় সরকারের বিগত দিনের অর্জিত সাফল্য সব ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলো। তারপর চতুর্থ বছরটা যখন অপেক্ষাকৃত ভালোয় ভালোয় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিলো– তখন ঘটলো

www.pathagar.com

আর একটি বিপর্যয়। বর্তমান সরকারের জন্য এটি ছিলো সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতি। গোটা দেশজুড়ে একযোগে বোমা হামলা হলো। হতাহতের দিক থেকে এ ঘটনা অতটা মারাত্মক না হলেও ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার দিক থেকে এটা ছিলো সবচেয়ে ভয়াবহ। কারণ একই সময়ে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। হামলাকারীদের নেটওয়ার্ক এতই নিখুঁত ছিলো যে– দেশময় ছড়িয়ে থাকা গোয়েন্দা বিভাগ এতটুকু তার গন্ধ পর্যন্ত পায়নি। তাই মনে হয়েছে এরা গোয়েন্দা বিভাগের চেয়েও দক্ষ। এর দায়-দায়িত্বটা অবশ্যই সরকারের কাঁধে বর্তায়– কিন্তু ব্যর্থতাটা ছিলো পুলিশ প্রশাসনের। তাদের দক্ষতা-যোগ্যতা এবং কার্যকারিতাকে একেবারে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছে। বর্তমান সরকার বাকিটা সময় সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে কাটিয়ে দিতে পারলেও ১৭ আগস্টের বোমা হামলার ঘটনা তাদের বিব্রত করে রাখবেই। এই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে হলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যতটা কঠোর ব্যবস্থা ত্বরিতগতিতে নিতে পারা উচিত ছিলো তা তারা পারেনি। বরং নিরীহ এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার ওপর এই ঘটনার দায় চাপিয়ে প্রকৃত দোষীদের নিরাপদ দূরত্বে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অপরাধীরা হয়েছে আশ্বস্ত আর আতঙ্কিত হয়েছে গো-বেচারা মাদ্রাসা ছাত্ররা। নাজেহাল হয়েছে দাড়ি-টুপিওয়ালারা। অথচ গোটা জাতির সন্দেহ যাদের প্রতি– তাদের দিকে এখনো ফিরে তাকানো হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। দেশের সচেতন সমাজ এটা মেনে নিতে পারেনি।

যে কোনো সরকারের কাছেই দেশের মানুষ ভালো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করে। আর সেই আশায় সরকারের পর সরকার বদল করে। ভাবে, নতুন সরকারের কাছে মঙ্গলকর কিছু পাওয়া যাবে। বর্তমান সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিলো অনেক অনেক বেশি। সেই প্রত্যাশা নিয়ে দেশের মানুষ জোট সরকারকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছে। আমি ছিলাম সেই জোট গঠনের অন্যতম রূপকার। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যখন চারদলীয় জোট গঠিত হয়, তখন যদি আমার জাতীয় পার্টি জোটে শরিক না হতো তাহলে আজকের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হতো। কারণ সকল বিরোধী দল নিয়ে জোট গঠিত হবে– সেই ফর্মুলায় জামায়াতে ইসলামী জোটে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। যদি বিরোধী দলগুলো আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্মে থেকে সরকারবিরোধী আন্দোলন করতো, তাহলে বিএনপির পক্ষে শুধু জামায়াতকে নিয়ে জোট গঠন করা সম্ভব হতো না। কারণ জামায়াতের রাজনৈতিক ইতিহাসের গন্ধ অনেকেই সহ্য করতে পারে না। বিএনপি তাদের নিয়ে জোট গঠন করলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তো এবং তা বিএনপির জন্য হিতেবিপরীত হয়ে যেতো। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতৃত্বে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিলো তখনই– যখন দ্বিতীয় প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ওই জোট গঠনে এগিয়ে

www.pathagar.com

আসে। যদিও অনিবার্য কারণে জোট থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো, কিন্তু জোটের জোয়ার তখন শুরু হয়ে গেছে। সেই জোয়ার আর থেমে যায়নি। আর সে কারণেই বিগত নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের বিপুল বিজয় হয়েছে। আমি কেনো জোট থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম সে ব্যাখ্যা বহুবার দিয়েছি। আজ এখানে সে আলোচনায় যেতে চাই না।

আজ মনে হয়– জোটের সব শরিককে নিয়ে বিএনপি হয়তো সুখে নেই। কারণ শুরু থেকেই অন্যতম শরিক জামায়াতকে নিয়ে তাদের সমালোচনায় পড়তে হয়েছে। তথাপিও তাদের উপক্ষো করার শক্তি ও সাহস বিএনপির ছিলো না। জামায়াতের দুই নেতার গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানোর সুযোগ দিতে হয়েছে। সেই সুবাদে তাদের সাংগঠনিক অগ্রগতি হয়েছে দ্রুতগতিতে। অপরদিকে দেশ পরিচালনায় সীমাহীন সমস্যা মোকাবেলা করতে বিএনপির জনপ্রিয়তায় ঘটেছে চরম অধঃগতি। জামায়াত সাংগঠনিকভাবে কতটা এগিয়ে গেছে– তার একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করতে চাই। দেশজুড়ে যখন একযোগে বোমা হামলার ঘটনা ঘটলো– তখন একমাত্র জামায়াত ত্বরিতগতিতে রাজধানীতে বিশাল মিছিল বের করতে পেরেছে। গোটা জাতি তখন স্তম্ভিত-নিস্তব্ধ এবং দিশেহারা। কোনো রাজনৈতিক দলই বুঝে উঠতে পারছিল না দেশে একি ঘটছে! অথচ জামায়াত ঘটনার ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই রাজধানীতে অন্ততঃ বিশ হাজার লোক নিয়ে বোমা হামলার প্রতিবাদে মিছিল করেছে। কিন্তু তাতে যে খুব ভালো ফল তারা ঘরে তুলতে পেরেছে তাও নয়। পাপ বাপকেও ছাড়ে না বলে একটা প্রবাদ আছে। কথাটা ফলেছে এখানে। মানুষের সন্দেহ পোক্ত হয়েছে। গোটা জাতি যখন হতভম্ব সেই মুহূর্তে এতগুলো মানুষ কীভাবে সংগঠিত হলো? ধারণা করা অমূলক নয় যে– তাহলে তারা আগেই সব কিছু জানতো। তাই ঘটনার সাথে সাথে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেদের পাক-ছাফ রাখার চেষ্টা করেছে। সরকার এই দিকটার দিকে দৃষ্টি ফেরালো না কেনো তা বোধগম্য নয়। বিএনপি আগেও ক্ষমতায় ছিলো এবং এককভাবেই ক্ষমতায় এসেছে। তখন তাদের ভাবমূর্তিতে এবারকার মতো আঘাত লাগেনি– যা জোটগতভাবে সরকার চালাতে গিয়ে লেগেছে।

যাহোক, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অমার্জনীয় ভুল, সীমাহীন ব্যর্থতা আর মাত্রাতিরিক্ত অহমিকার বিরুদ্ধে তখন জোট গঠন অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। সেই জোটের পক্ষে যে জনমত গড়ে উঠেছিলো তাতেই তাদের পতন ঘটেছে। তার বিপরীতে জনগণ যে নতুন সরকারকে বেছে নিয়েছে তাদের ব্যর্থতাও কিন্তু অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এখানে আমি জোট সরকার উল্লেখ করে তাদের ব্যর্থতার কথা বলতে চাই না। আমি বলবো– এটা বিএনপির সরকার। এখানে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পেয়েছে জামায়াত। দায়িত্ব সবই বিএনপির। বন্দুকটা তাদের কাঁধেই। সুবিধামতো ফায়ার করে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করছে জামায়াত। যতোটুকু ব্যর্থতা– তার সবটুকু দায়ভার নিতে হচ্ছে

www.pathagar.com

বিএনপিকে। অপরদিকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে জামায়াত। দেশ পরিচালনায় যদি কোনো ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা অযোগ্যতার হিসাব বেরিয়ে আসে, তাহলে সে হিসাব জোটের খাতায় জমা হবে না– জমা হবে শুধু বিএনপির খাতায়।

আজ আমি এখানে এই আলোচনার অবতারণা করছি একজন রাজনীতিক বা একটি দলের প্রধান হিসেবে নয়। আমি আলোচনা করছি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের উপলব্ধি নিয়ে। আমি ঢালাওভাবে বলছি না যে, বর্তমান সরকার সবকিছুই খারাপ করছে, কোথাও তাদের কোনো সাফল্য নেই। অবশ্যই ভালো কাজের নিদর্শন তাদেরও আছে। সরকার ভালো করবে, সেই প্রত্যাশা নিয়েই তো তাদের ক্ষমতায় আনা হয়েছে। কিন্তু জনগণের প্রত্যাশা তারা চার বছরে পূরণ করতে পারেনি। যেটুকু সফলতার আলো তারা জ্বালাতে পেরেছে তা ব্যর্থতার গাঢ় কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। কোথায় সে ব্যর্থতা– সে আলোচনায় আসার আগে দেশের শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করতে চাই।

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় কোনো ধারাবাহিকতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এক একটি দলীয় সরকার ক্ষমতায় এসেছে– তারা নিজেদের মতো করে দেশ পরিচালনা করেছে। পূর্ববর্তী সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। এক একটি সরকারের শাসনকালকে এক একটি পর্ব হিসেবে ভাগ করা যায়। একটি দল দুই বা ততোধিকবার ক্ষমতায় এলেও তারা পূর্বেকার ধারা বজায় রাখতে পারেনি। নিজেদের সুবিধামতো সবকিছু বদল করে নিয়েছে। বিভিন্ন সরকারের শাসনকাল অনুসারে স্বাধীনতা উত্তরকালকে ভাগ করে নিলে ৪টি পর্ব পাওয়া যাবে। সেগুলো হচ্ছে– ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পর্ব, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বিএনপির পর্ব, ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির পর্ব এবং ১৯৯১ থেকে এ পর্যন্ত সংসদীয় ব্যবস্থার পর্ব। শেষ পর্বটাকে আমি আলাদাভাবে ভাগ করছি না এ কারণে যে, দুই দলের সরকারের মধ্যে নীতি-আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও দুই দলেরই মন-মানসিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন-ধারণ, যোগ্যতা, দক্ষতা, গতি-প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। আর সে কারণেই আমি আওয়ামী লীগ আর বিএনপিকে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে বর্ণনা করেছি।

যেমন, দুই দলই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করলেও সংসদকে কার্যকর করতে পারেনি। এই দুই দলের শাসনামলেই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রধান বিরোধী দল সংসদে থাকতে পারেনি। দুই দলের আমলেই সংসদ বর্জন-বয়কটের ঘটনা ঘটে আসছে। দুই দলের সময়েই একদলীয় কায়দায় সংসদ চলছে। সংসদে দেশ ও জনগণের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা না হয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কাদা ছোড়াছুড়ি, প্রয়াত নেতাদের নিয়ে বিরূপ কথাবার্তা, গালাগালি, অশ্লীল বাক্য বিনিময়ের ঘটনা ঘটছে। গত ১৪ বছরে সংসদের কার্যবিবরণী ঘেঁটে দেখলে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে। দুই

www.pathagar.com

দলের শাসনামলেই প্রতিহিংসার রাজনীতি সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তৃতি লাভ করেছে। দুই দলই গণতান্ত্রিক সরকারের নামাবলি গায়ে দিয়ে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য পুলিশ ও মাস্তান বাহিনীকে ব্যবহার করেছে। দুই দলই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এই দুই দলেরই শাসনামলে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছে, গডফাদারের সৃষ্টি হয়েছে। 'টেন্ডারবাজি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। চাঁদাবাজির বিস্তার ঘটেছে। এসবই তো বিএনপি-আওয়ামী লীগ সরকারের অবদান। এই দুই দলের শাসনামলেই সভা-সমাবেশে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। পাখির মতো মানুষ মরেছে। দুই দলই কোনো বোমা হামলার সুরাহা করতে পারেনি। দুই দলের সরকারই কোনো হামলার ক্লু বের করতে পারেনি। দুই দলের আমলেই প্রতিদিন খুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিকারহীনভাবে ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি-ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। দুই দলই প্রশাসনকে দলীয়করণ করেছে। দুই দলই তাদের পছন্দমতো, দলের প্রতি অনুগত-অনুরক্ত কিংবা দলীয় লেবেল লাগানো সরকারি কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ করেছে এবং অপছন্দের কর্মকর্তাদের ওএসডি করে রেখেছে। দুই দলই প্রশাসনে যোগ্যতার চেয়ে দলীয় আনুগত্যকে বেশি মূল্য দিয়ে এসেছে। দুই দলের আমলেই যোগ্যতার অবমূল্যায়ন হয়েছে। ফলে প্রশাসনে স্থবিরতা নেমে এসেছে। দুই দলের সরকারের আমলেই বিচার ব্যবস্থা দেশবাসীর কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ, বিচারপতি পদে দলীয় লোকদের নিয়োগের অভিযোগ দুই সরকারের আমলেই হয়েছে। এখনো সে বিতর্ক জীবন্ত আছে। এমনকি প্রধান বিচারপতির রাজনৈতিক পরিচয় আছে কিনা তাও ঘাঁটা হয়েছে। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই দলের আমলেই পাল্লা দিয়ে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না– এটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। দুই দলই দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার কলংক ভাগ করে গ্রহণ করেছে। দুই দলই জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির কোনো তোয়াক্কা করেনি। উভয় দলই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো– তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেবে, প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করবে, বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে নেবে, রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দুই দলই এসব অঙ্গীকারের কোনোটাই রক্ষা করেনি। এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে আরো অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমান সরকার তার পূর্ববর্তী সরকারের খারাপ নজিরগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

যেসব বিষয় উল্লেখ করলাম সেসবই হচ্ছে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা। বিগত সরকারের এসব ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই জনগণ তাদের পরিত্যাগ করে নতুনভাবে একটি জোট সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলো।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের পূর্বে যে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিলো, সেই বিএনপিকে জনগণ এবার এককভাবে ক্ষমতায় আনেনি। সাথে দেখেছিলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করা আরো দু'টি দলকে। মানুষ ভেবেছিলো– ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকরা হয়তো সরকারকে সবসময় সৎ পথে পরিচালিত করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে সে প্রত্যাশা তো পূরণ হয়নি, বরং দেশ আরো অধঃপতনের দিকে চলে গেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ব্যর্থতা ছিলো, বর্তমান সরকারের আমলে তার মাত্রা আরো প্রকট হয়েছে। বিগত সরকার আমলের দুর্বিষহ অবস্থার ধারাবাহিকতার সাথে যুক্ত হয়েছে আরো নানা উপসর্গ। যেমন দ্রব্যমূল্য। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পাগলা ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। তাকে রোধ করার সাধ্য যেনো সরকারের নেই। সাধারণ মানুষ ভোগ্যপণ্যের মূল্য কখনোই নাগালের মধ্যে পায়নি। রমজান মাস সামনে রেখে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে– তা প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ নেই, কাজ নেই। তারা ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। দেশে কোনো উন্নয়ন কাজ নেই বলে অর্থের সঞ্চালন স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষ দুর্ভোগ পোহাতে পোহাতে গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। সরকার হয়তো তা অনুধাবনের চেষ্টা করে না। সারাদেশের রাস্তাঘাটের করুণ দশা। মানুষ বাস-গাড়িতে চড়ে সরকারের প্রতি বিষোদগারণ করে। সরকারের কানে তা পৌঁছে কিনা জানি না– তবে এসব পথে তাদেরও তো চলতে হয়। কী মনে হয় তখন ? তারা সরকারে না থাকলে এ অবস্থা দেখে কী বলতেন তখন? রাজধানীর শোচনীয় অবস্থা দেখে কেমন উপলব্ধি ঘটে তাদের? বৃষ্টি হলে ঢাকার রাস্তাঘাট হাওর-বাওর বিলের রূপ ধারণ করে। বৃষ্টি কি ঢাকা শহরে নতুন হচ্ছে? আগেও বৃষ্টিতে রাজধানীর কোনো কোনো অঞ্চলে পানি জমতো, তবে তা আটকে থাকতো না। ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। ঢাকার অধিকাংশ রাস্তাঘাট খানাখন্দরে ভরে আছে। রাজধানীর ফুটপাতে পা রাখার সাধ্য নেই। ব্যস্ত এলাকার ফুটপাত হকারদের দখলে। কোনো কোনো এলাকার ফুটপাত পরিণত হয়েছে ভাসমানদের বস্তিতে। রাজধানীর ৪০ লাখ মানুষ বস্তিতে বাস করে। সেখানে কোনো স্যানিটারি ব্যবস্থা নেই, পানির ব্যবস্থা নেই। সেখানে মাদক-ফেনসিডিলের ব্যবসা চলে। এ সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ তো চোখে পড়ে না। র‍্যাবকে এখানে কাজে লাগালে হয়তো একটা ভালো ফল পাওয়া যেতো।

সরকার মুখে যতোই আত্মতৃপ্তির কথা বলুক না কেনো, বাস্তব অবস্থা তারাও বুঝতে পারে। তবে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে জামায়াত। তাদের হাতে আছে দু'টি মন্ত্রণালয়। একটি শিল্প আর একটি সমাজকল্যাণ। দু'টির অবস্থাই নাজুক। আদমজীসহ দেশের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। দেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি বা ভারি কোনো ধরনের শিল্প গড়ে উঠছে না। শিল্প

www.pathagar.com

বিপর্যয়ের কারণে দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ছে। দেশ বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। জুতো সেলাইয়ের সুতা থেকে শুরু করে শিল্পজাত নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যই আসে বিদেশ থেকে। এর আগে যখন কৃষি মন্ত্রণালয় তাদের হাতে ছিলো– তখন কৃষি সেক্টরে নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই ওখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যর্থতাও তাদের গায়ে লাগছে না। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও তথৈবচ। সমাজের সর্বস্তরে নেমেছে অবক্ষয়। সেই অবক্ষয়ের সমাজে একজন জামায়াতিকে ওই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া উপযুক্তই হয়েছে। যেমন আসন, তেমন তার আরোহী। নীতি-আদর্শ, মনুষত্ব, মানবিকতা, সহমর্মিতার ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কল্যাণের দায়িত্ব যারা পেয়েছে তাদের চরিত্রকে এ দেশের মানুষ কোন চোখে দেখে তা সরকারের অজ্ঞাত কিনা জানি না। সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে– সেখান থেকে উত্তরণের পথ বের করতে না পারলে ভবিষ্যৎ আরো তমসাঘন হয়ে পড়তে বাধ্য।

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে শাসনকার্যের কথায় ফিরে আসি। সদ্য স্বাধীন দেশে একটি জাতীয় সরকার গঠিত না হয়ে পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হলো। আওয়ামী লীগের সেই প্রথম সরকার পদ্ধতি ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর আর বজায় থাকলো না। প্রবর্তিত হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। একই আমলে সেই সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে বাকশালের একদলীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা কায়েম করা হলো। অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। এর পর ১৯৭৫-১৯৮১ পর্যন্ত বিএনপির পর্বে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বদৌলতে দেশে একদলীয় শাসনের কালো ব্যবস্থার অবসান ঘটলো। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত হলো বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি বহাল থাকলো। প্রেসিডেন্ট জিয়া শহীদ হওয়ায় দেশের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেলো। আমিও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা পেয়েছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে। আমি চেষ্টা করেছিলাম পূর্ববর্তী সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার। শহীদ জিয়া ১৯ দফা কর্মসূচি নিয়ে দেশ পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন। আমি ঠিক তার অনুরূপ না হলেও মৌলিক কিছু বিষয়ের নীতি অপরিবর্তিত রেখে ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলাম। আমি এখনো মনে করি, দেশ ও জাতির কল্যাণে আমার সেই ১৮ দফা কর্মসূচির কোনো বিকল্প নেই। এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, এই দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের কথা বলা হোক আর উন্নয়ন সমৃদ্ধির কথাই বলা হোক– এ দু'টি বিষয়ে যা কিছু অর্জন, তার সবটুকুই পাওয়া গেছে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় (বাকশাল আমল বাদে)। বর্তমান সরকারের চতুর্থ বর্ষের শেষ ভাগে ঘটে গেছে রাষ্ট্রীয় ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবকিছু ওলট-পালট করে দেবার মতো একটি ঘটনা। হাইকোর্টের একটি রায়ে সংবিধানের ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয়ে যায়। এমনকি সেই রায়ে জিয়াউর রহমানের মতো জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

www.pathagar.com

গ্রহণও অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়। পঞ্চম সংশোধনী যদি বাতিল হয়– তাহলে সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' উঠিয়ে দিতে হয়, বাকশাল কায়েম করতে হয়, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র চালু করতে হয়। এই রায় যদি কার্যকর করতে হয় তাহলে দেশের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। হাইকোর্টের সেই রায় এখন সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত আছে। কিন্তু ওই রায়ে বর্তমান সরকারি দলের ওপর আঘাত যা লাগার তা ঠিকই লেগে আছে।

বর্তমানে বিএনপি জামায়াতকে সাথে নিয়ে তাদের পূর্ববর্তী (১৯৯১-১৯৯৬) আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। ওই সময়ে তারা দেশ পরিচালনায় যে সাফল্য পেয়েছিলো– বর্তমান আমলে তা ধরে রাখতে পারেনি। তখন বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্যেও সরকার অনেক পরিপক্বভাবে দেশ পরিচালনা করেছে। দেশের মানুষ এখনকার থেকে সে আমলে অনেক বেশি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে পেরেছে। দক্ষতার অভাবে ব্যর্থতা তাদের কিন্তু তখনও ছিলো– তবে তা বর্তমান পর্যায়ের মতো নয়। বর্তমান সরকারের চার বছরের মূল্যায়ন করতে গেলে এক কথায় বলতে হয়– এই সরকার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছে তার মধ্যে নেতিবাচক দিকগুলোকে মুছে ফেলতে পারেনি, বরং তা আরো বেশি সংক্রমিত হয়েছে। সাফল্য চার বছরে যা অর্জন করেছে– তার মাত্রা খুবই নগণ্য। তবুও বলতে হবে বর্তমান সরকার ব্যাংকিং সেক্টরে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। ঋণখেলাপী প্রবণতা সরকারের দৃঢ়তার কারণে হ্রাস পেয়েছে। তবে ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অলস-অর্থ জমা হয়েছে। এই অর্থ শিল্পোন্নয়নে ব্যবহৃত না হলে তার কী মূল্য থাকবে?

দেশে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার সরকার নিষিদ্ধ করতে পেরেছে, যা পরিবেশের জন্য সহায়ক হয়েছে। পলিথিন ব্যাগের ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয় ড্রেনেজ ব্যবস্থায়। কিন্তু সেখানে কোনো সুফল আসেনি। ড্রেন থেকে ময়লা পানি নিষ্কাশন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তবে রাজধানী থেকে পরিবেশ দূষণকারী স্কুটার উঠিয়ে দিয়ে শহরকে অনেকাংশে বিষমুক্ত করতে সরকার সক্ষম হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় সরকারের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিও সফল হয়েছে। দেশবাসী সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং সরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে ফলজ, বনজ, ওষুধি গাছের চারা রোপণ করেছে। সেসব গাছ বেড়ে উঠে একটা সুন্দর সবুজ শ্যামল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তা দেখলে মন ভরে ওঠে। সরকারের এসব সাফল্যকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

বর্তমান সরকারের আমলে পুঁজি বাজারে একটা শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। বলা যায় অনেকটা স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে এখন বিনিয়োগ বাজারে। বিগত সরকারের আমলে পুঁজি বাজারের মাধ্যমে বিদেশীরা যেভাবে অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে, সেই ক্ষত এখনো মোছা না গেলেও বিপর্যয় থেকে উত্তরণ ঘটেছে। তবে গত ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বিদেশী

www.pathagar.com

বিনিয়োগ বেশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির হার প্রায় ৪ গুণ। ২০০৫ সালের বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তানের পরে বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী দেশ, যেখানে প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। সরাসরি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ হবার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। সরকার ২০০৬ সালে শিল্পের প্রবৃদ্ধি ১০% বৃদ্ধির আশা পোষণ করছে। এটা বাস্তবায়িত হোক তা একান্তভাবে কামনা করি। বন্ধুপ্রতিম দেশ ফ্রান্স বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বন্দর উন্নয়ন, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি স্থাপন, লিকুইড গ্যাস বোতলিকরণ, বস্ত্র শিল্প স্থাপন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন। এ ছাড়াও ভারতের টাটা ও আমিরাতের আবুধাবি গ্রুপও বাংলাদেশে বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। এটা অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে একটা ইতিবাচক সাড়া হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। বর্তমান সরকারের আমলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সেই পর্যায়ে না থাকলেও বিদ্যুৎ সংকট আছে। তবে কিছুটা উন্নতি হয়েছে– এটা সত্য। অবশ্য দেশের শিল্প-কলকারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সেক্টরে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে সাধারণ ভোক্তারা লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। তাই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সার্বিক অর্থে সাফল্যের কথা বলতে পারছি না।

কিছুদিন হলো সরকার একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও হোটেল রেস্তোরাঁয় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ভেজাল ও বাসি-পচা খাবার পরিবেশন বা সরবরাহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে এ ব্যাপারে বাসি-পচা খাবার ড্রেনে ফেলে দেয়ার জন্য টিভি ক্যামেরার সামনে পোজ দিলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। এ অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করে সংসদে আইন পাস না করলে চলবে না। তবে উদ্যোগটা যে ভালো সেটাও কম কথা নয়।

যাহোক, কোনো সরকারের শাসনামলের মূল্যায়ন করতে গেলে যে যার দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করবেন। সেখানে সাফল্য-ব্যর্থতার প্রসঙ্গ আসবেই। আমার দৃষ্টিভঙ্গি সকলের পছন্দ হবে তাও মনে করি না। তবে এখানে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চোখে জোট সরকারের চার বছর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সরকার ভালো কিছু করলে জনগণ অবশ্যই তার মূল্যায়ন করবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য নিজেদের কর্মগুণই একমাত্র উপায়। এর জন্য কোনো বিকল্প পথ বের করার চেষ্টা সমীচীন নয়। সরকারের চতুর্থ বছরে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোনো পদ ছিলো না। এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাও দোষের কিছু নয়। কিন্তু এই পদে যেভাবে লোক নিয়োগ করা হয়েছে তা অত্যন্ত

www.pathagar.com

গর্হিত কাজ। অভিযোগ উঠেছে, এই পদে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা সবাই দলীয় লোক। যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধা যাচাই করে নিয়োগ দেয়া হতো তাহলে বিতর্ক সৃষ্টি হতো না।

আমি গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতিতে একান্তভাবে বিশ্বাসী। জনগণের রায়কে আমি সম্মান করি। তাই বরাবরই বলে আসছি– একটি নির্বাচিত সরকারকে তার পূর্ণ মেয়াদ দায়িত্ব পালন করতে দেয়া উচিত। তা না হলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় থাকে না। ব্যতিক্রম তো সব ক্ষেত্রেই আছে। বর্তমান সরকার চার বছর সময় পার করে এসেছে। ব্যর্থতার পাল্লা তাদের ভারি– সে কথা বলতে কোনো দ্বিধা করছি না। তবে রাজনৈতিক সমস্যা যা সৃষ্টি হয়েছে তা সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। তার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিলো সহনশীলতা। প্রতিহিংসাপরায়ণতা পরিত্যাগ করে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা করলে অনেক ব্যর্থ বিষয় ম্লান হয়ে আসতে পারতো। সরকার ব্যর্থ হোক কিংবা ব্যর্থতা-অযোগ্যতা-অদক্ষতার কারণে দেশের জনগণ দুর্ভোগ পোহাক– আমি তা কোনোভাবেই চাই না। আমরা রাজনীতি করি জনগণের কল্যাণ এবং তাদের সুখে-শান্তিতে রাখার জন্য। তা যে সরকারই নিশ্চিত করতে পারবে– আমি তাকেই সাধুবাদ জানাবো। সরকার তা পারছে না বলেই জনগণের পাশে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। বর্তমান জোটের আমি ছিলাম অন্যতম রূপকার। সুতরাং আমার সৃষ্টির ব্যর্থতা আমি কখনোই প্রত্যাশা করি না। তবে আশা করবো– সরকার বাকি সময়টা ভালোভাবে শেষ করবে। আর কথায় আছে– শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

www.pathagar.com

জোট হতে পারে কর্মসূচির ভিত্তিতে

একজন প্রবাসী কলামিস্ট বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবর দেখে নাকি চমকে উঠেছিলেন। খবরটি হলো– দেশে একটি তৃতীয় জোট হচ্ছে, সেই জোটে থাকবো আমি, ডঃ কামাল হোসেন, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী এবং চরমোনাই পীর সাহেব। এই খবর দেখে কলামিস্ট আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এক দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে শিরোনামে জানতে চেয়েছেন– 'এই দুঃসময়ে রাজনীতিতে দুই ডাক্তারের আসল খেলাটা কী?' উল্লেখিত দুই 'ডাক্তারের' দুইজনই যে ডাক্তার বা চিকিৎসক নন তা কলামিস্ট জানেন এবং দেশবাসীও জানে। ব্যঙ্গ করে ডক্টর আর ডাক্তার নিয়ে যা-ই লিখুন না তিনি তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আর আসল খেলা কী– সে রহস্যও খুঁজে দেখার প্রয়োজন আমার নেই। কারণ যে খবরের সাথে আমার নাম জড়িত অথচ আমি কিছু জানি না, তা নিয়ে মন্তব্যের কিছু থাকতে পারে না। এসব বিষয় নিয়ে কিছু লেখারও তাগিদ বোধ করছি না। তবে কলামিস্ট কেনো আঁতকে উঠলেন এবং জোট প্রসঙ্গে কিছু কথা বলার আছে।

আমি রাজনীতি করি, রাজনীতি নিয়ে বেশি ভাবতে হয়। দল, দেশ ও জনগণের চিন্তা মাথায় থাকে সব সময়। অবিশ্রাম কাজ করতে হয় রাজনীতি নিয়ে। তাই ইচ্ছা হলেও লেখালেখিতে মনোযোগ দিতে পারি না। লন্ডনে বসে যিনি লিখছেন তাঁর কাজই লেখা। মনে হয় তার চেয়েও তাঁর বড় কাজ সুযোগ পেলেই আমার বিরুদ্ধে বিষোদগারণ করা। এতেই তার আনন্দবোধ এবং এটা তাঁর অভ্যাস। তবে এই অভ্যাসটা আমি মুহূর্তেই বদলে দিতে পারি যদি তাঁর পছন্দের জোটের প্রতি একটু মাথা নাড়ি। কিন্তু তাতো হবার নয়। সুতরাং তিনি লিখতে থাকুন মনের খোরাক মিটিয়ে– তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে কথায় কথায় আমাকে 'পতিত' বা 'স্বৈরাচারী' বলেন, অথচ পূর্বাপর সরকারগুলোর ইতিহাস ও পরিণতি চোখ খুলে দেখতে চান না– আপত্তিটা এখানেই। এই জন্যই তিনি একচোখা লেখক হিসেবে পরিচিত এবং নিজের নীতি-আদর্শ-মত-পথ পরিবর্তনে পারদর্শী। একদা তিনি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে 'অরাকল' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। আবার সেই তিনি এই সাহাবুদ্দীনকে 'পিশাচ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ডঃ কামাল হোসেন যখন ঐক্যমঞ্চ গঠন করে সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন তখন এই কলামিস্টের ধারণা হয়েছিলো কামালের মঞ্চ তাঁর পছন্দের মঞ্চের সাথে মিশে

www.pathagar.com

সরকারবিরোধী মঞ্চটা আরো উঁচু হয়ে যাবে। সে সময় প্রবাসী কলামিস্টের লেখার শিরোনাম ছিলো 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই'। কিন্তু তারপর যখন শুনলেন– ডক্টর আর ডাক্তার সাহেবরা তৃতীয় জোট গঠন করতে যাচ্ছেন এবং সেই জোটে আমিও থাকবো তখন তার হয়তো মনে হয়েছে স্বপ্নের ফানুস তো ফুটো হয়ে যাচ্ছে। ত্রিভুজ জোটের এরশাদের বাহুই তো বৃহত্তম হয়ে যাচ্ছে। এই আতঙ্কে কলামিস্ট হয়তো দিশেহারা হয়ে গেছেন। যাক লেখার বিষয় আমার এসব নয়– জোট প্রসঙ্গে কিছু আলোচনায় আসা যাক।

আমাকে প্রায়ই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো– আমি কোন জোটে যাবো। আমি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং প্রেস মিডিয়ার সাথে আলাপকালে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি– আমি নিজের মতো এককভাবে নিজস্ব ধারায় চলতে চাই। দেশপ্রেমিক এবং আমার সংস্কার কর্মসূচির সাথে একমত হতে পারলেই কেবল তাদের সাথে ঐক্য বা জোট হতে পারে। আমি আরো স্পষ্টভাবে বলেছি– কারো ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি কিংবা কাউকে ক্ষমতায় রাখার হাতিয়ার হিসেবে আমরা কখনোই ব্যবহৃত হতে যাবো না। তারপরও আমাকে নিয়ে এবং আমার দলকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হয়– এই বুঝি আমি ওই জোটের সাথে যোগাযোগ করছি অথবা সরকারের সাথে আঁতাত করছি। এসব অবান্তর-অবাস্তব প্রসঙ্গ আমি উপভোগ করি মাত্র।

জোট কীভাবে এবং কেন গঠিত হবে? জোটের লক্ষ্য কী হবে? এসব যদি নির্ধারিত না হয়ে কোনো জোট গঠিত না হয়– তাহলে সে জোটের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। বর্তমানে যে জোট ক্ষমতায় আছে, আমি ছিলাম সেই জোটের একজন অন্যতম রূপকার। তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতা-অযোগ্যতা-দুর্নীতি-আহমিকার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ এবং আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় তখন আমার জোট গঠন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যে প্রতিশ্রুতিতে বিগত সরকার গঠনে নিঃস্বার্থ সমর্থন জানিয়েছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে এবং জাতির কাছে যে অঙ্গীকার করে তারা ভোট নিয়েছিলো– তা রক্ষা করলে আমাকে জোট গঠন করতে এগিয়ে যেতে হতো না। আমার প্রতি অবিচারের কথা বাদই দিলাম– ক্ষমতা পেয়ে তৎকালীন সরকার জাতির কাছে ওয়াদাভঙ্গের এক কলঙ্কিত অধ্যায় সৃষ্টি করলো। তারা ওয়াদা করেছিলো ক্ষমতায় গেলে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করবে। সেই পৃথক করা তো দূরের কথা, বিচার বিভাগ আরো কলুষিত করা হয়েছে। বিচার বিভাগের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপের সবচেয়ে বড় বলি হয়েছি আমি। এ বিষয়ের ব্যাখ্যায় যেতে চাই না। বিচার বিভাগের ওপর আমি একান্তভাবে শ্রদ্ধাশীল। দোষটা বিচার বিভাগের নয়– দোষটা হস্তক্ষেপের। বিচার সরকারের মনঃপুত না হওয়ায় আদালত এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের নেতৃত্বে লাঠি মিছিলের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। তৎকালীন সরকারের আমলে আঘাত এসেছে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর। যা আমাদের দলীয় নীতি

www.pathagar.com

আদর্শের চরম পরিপন্থী। কারণ আমরা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত একটি রাজনৈতিক দল। আমাদের আদর্শের পরিপন্থী কার্যকলাপ কোনোভাবে মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না। তখন শিখা চিরন্তন প্রজ্বলনের মাধ্যমে অগ্নিপূজার নিদর্শন স্থাপন করা হয়েছিলো প্রতীয়মান হওয়ায় আমি তা মেনে নিতে পারিনি। আমি বিশ্বাস করি, ইসলামী বিধানে এক আল্লাহ বাদে চিরন্তন বলে কিছু নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আলেম ও ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী পোশাক পরিহিতদের নানাভাবে নাজেহাল করা হয়েছে। দ্বীনিয়াত শিক্ষা বাতিল করার জন্য বহু চক্রান্ত করা হয়েছে। এসব বিষয় আমি মেনে নিতে পারিনি। পার্বত্য শান্তিচুক্তি দেশের অখণ্ডতার পরিপন্থী ছিলো। তাও আমরা দলীয়ভাবে গ্রহণ করিনি। এসবের পাশাপাশি তখন সন্ত্রাস সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে। খুন-ডাকাতি-ছিনতাই-ধর্ষণ-রাহাজানি নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছিলো। সেই পর্যায়ে বিরোধী দলসমূহের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সরকারের পতন ঘটানো। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা জোট গঠন করে একটা অপ্রতিরোধ্য জোয়ার সৃষ্টি করেছিলাম। আবার কেনো সেই জোট থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সে প্রসঙ্গে পরে আসি। বিরোধী দলের যৌথ ঘোষণায় কী ছিলো এবং সে ঘোষণা অনুযায়ী কতোটুকু কাজ হয়েছে– তা যাচাই করে নেয়ার জন্য পূর্ণ ঘোষণাটি আমি উল্লেখ করতে চাই। তাহলেই বোঝা যাবে, কেনো আমি জোট থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছিলো ঃ "বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী দেশে পৌরসভাসহ সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন আসন্ন। নাগরিক জীবনের উন্নতি এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ়ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য এ নির্বাচনগুলো জাতীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের আমলে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনসহ জাতীয় সংসদের যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার কোনটাই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নাই। বরং সরকারের রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্রতিটি নির্বাচনে উচ্ছৃঙ্খলতা, বোমাবাজি, গুলি, ভোট জালিয়াতি, সন্ত্রাস, কারচুপি, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ ব্যাপক অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়। এবং প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। যার ফলে জনগণের ইচ্ছার সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটে নাই। সর্বশেষ পাবনা-২ উপ-নির্বাচন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান নির্বাচন কমিশন কোনো নিরপেক্ষতা পালন করতে পারে নাই। বরং সরকারের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পক্ষপাতমূলক ভূমিকা পালন করেছে। এবং এইসব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংবিধানে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং দেশের গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরো সুদৃঢ়, সুষ্ঠু এবং অবাধ করার জন্য আগামী

www.pathagar.com

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্বাচন আইডি কার্ড ব্যতীত করা হলে ওই নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হবে বলে আমরা মনে করি না।

এ ছাড়াও গত আড়াই বছর এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিরোধীদলসমূহের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের কারাবন্দি করেছে। হাজার হাজার মিথ্যা মামলা দিয়ে অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও হয়রানি করছে, যা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশে আজ স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পরিবেশ ধ্বংসের পথে এবং গণতন্ত্র এক চরম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হলো নির্বাচন। কিন্তু সে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সুষ্ঠু বা অবাধ পরিবেশ দেশে আজ বিরাজ করে না। তাই বর্তমানে বিরোধী দলসমূহের কারাবন্দি নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং তাদের অহেতুক হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করা না হলে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে বলে আমরা মনে করি না। তাই আমাদের দাবি হলো :

১. প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হবে।

২. সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগসহ নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে।

৩. পৌরসভাসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের ভোটারদের আইডি কার্ড প্রদান করা সম্পন্ন করতে হবে।

৪. বর্তমানে কারাবন্দি সকল বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত সকল মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে এবং তাদের গ্রেফতার-হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

যদি এ দাবিসমূহ উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে সরকার গ্রহণ না করে তাহলে পৌরসভা এবং কর্পোরেশনের নির্বাচনসমূহ হবে অর্থহীন এবং আমরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবো। এবং যতোদিন পর্যন্ত এ দাবিসমূহ মানা না হবে, ততোদিন জনগণকে সাথে নিয়ে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

আমরা চারদলের চার শীর্ষ নেতা এই যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলাম। ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি পৃথক পৃথক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো– জোট গঠনের এই ঘোষণায় পরবর্তী কোনো কর্মসূচি ছিলো না। অর্থাৎ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সরকারের পতন হলে পরবর্তীতে কোন কর্মসূচির ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে, তার কোনো উল্লেখ ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো একটাই– সরকারের পতন ঘটানো। ফলে সরকারের পতন ঘটার পর জোট সরকার ক্ষমতায় এসে পরিস্থিতির কোনো উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। কারণ জোট কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। জনগণ যে তিমিরে অবস্থান করছিলো, সে তিমিরেই রয়ে গেছে। বরং

www.pathagar.com

পরিস্থিতির আরো অবনিত ঘটেছে। তাই শুধু সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়েই কোনো জোট গঠিত হলে, সেই জোট একটি লক্ষ্যই বাস্তবায়ন করতে পারবে– অর্থাৎ এক সরকারের বদলে আর এক সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং সুবিধাভোগী, দুর্নীতিবাজ এক গ্রুপের বদলে আর এক গ্রুপের আবির্ভাব। দেশ ও জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না।

মাঝখানে একটি কথা বলে রাখি যে জোট গঠনে আমার অগ্রণী ভূমিকা ছিলো, সেই জোট থেকে কেনো বেরিয়ে এলাম– এই আলোচনায় যৌথ ঘোষণাটি উল্লেখ করেছি সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য। জোট গঠন করে সারাদেশে জোয়ার সৃষ্টি হবার পর সরকারের খড়্গ নেমে এলো শুধু আমার কাঁধে। অথচ জোটের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদের কথা উঠলো না। আমার মুক্তির জন্য জোট কোনো কর্মসূচি পালন করলো না। চট্টগ্রামে একজন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা হবার পর তার প্রতিবাদে হরতাল পালন করা হলো। অথচ আমাকে জেলে নেবার পর জোটের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলও বের করা হয়নি। তারপর দলের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হতে চলেছিলো, ষড়যন্ত্রের মুখে দলীয় প্রতীক যখন হারাতে বসেছিলাম, সেই পর্যায়ে জোট থেকে বেরিয়ে এসে বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এরপরও জোট গঠনের বলি হয়ে সংসদ সদস্য পদ হারালাম– নির্বাচন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।

যে কথা পূর্বেই বলেছি– আদর্শ, লক্ষ্য বা কর্মসূচিবিহীন জোট গঠন হবে নিষ্ফল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। অন্তত আমি তা সমর্থন করি না। স্বাধীনতার পর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তো হয়েছে। দেশবাসী বাকশাল ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা, সামরিক শাসন ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি, সংসদীয় শাসন পদ্ধতি– অনেক কিছুই তো দেখলো। এক দলের সরকার ব্যবস্থা, ঐক্যমতের সরকার, জোটের সরকার– এসবও দেখা হলো। অতএব আর কতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। ঐক্যমতের বোতল পরিবর্তন হয়ে জোটের বোতল এলো, ভেতরের মদ মদই থেকে গেলো। সুতরাং বারো মসলার জোট করে লাভ হবে না, যদি না দেশ ও জনগণের স্বার্থে কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। আজ গোটা জাতিকে সে রকম কিছু কর্মসূচির প্রতি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেটা হবে জাতীয় মহাজোট– আমি সেই জোটের কথা ভাবি। সেরকম কর্মসূচি প্রণয়নের কথা চিন্তা করি। ইতিমধ্যে আমি নিজে কিছু সংস্কার প্রস্তাব এবং দেশ ও জাতির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি দিয়েছি। আমার সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন। এ ব্যাপারে আমি সুনির্দিষ্ট ফর্মুলাও দিয়েছি। প্রকাশিত সে বিষয়গুলো আবার এখানে উল্লেখ করতে চাই না। এছাড়া জাতীয় পার্টির বিগত কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রণীত আমাদের কর্মসূচির কথাও বলেছি। আমাদের সাথে ঐক্য হতে পারে এসব সংস্কার ও কর্মসূচির ভিত্তিতে। আমি রাজনীতি করি দেশ ও জনগণের স্বার্থে। জনগণ যুগের পর যুগ ধরে দুর্ভোগের পর আরো দুর্ভোগ

www.pathagar.com

পোহাতে থাকবে, আর মুষ্টিমেয় মানুষের ভাগ্য বদলের রাজনীতি আমাদের লক্ষ্য নয়। জোট গঠন করে একবার তো সরকার পরিবর্তন করলাম, কিন্তু জাতিকে কী দিতে পারলাম। এক নতুন নবীন মুখের বদলে আর এক নতুন নবীন মুখ জাতির সামনে উপহার দিয়ে কী লাভ পাওয়া যাবে? সারা জীবনের পোড়-খাওয়া রাজনীতিকদের মাথা হেট করে দেয়ার রাজনৈতিক প্রবণতা বন্ধ করা না গেলে রাজনীতি এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে না।

আমি জানি– জল্পনা-কল্পনায় অনেক জোট গঠিত হচ্ছে। আমাকে নিয়ে অনেকে অনেক অংকও করেন। দেশের যে পরিস্থিতি, তাতে বর্তমান জোট সরকারের জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং তাদের টিকতে হলে জাতীয় পার্টিকে দরকার। আবার প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষে তৃতীয় শক্তিধর কোনো দলকে সাথে না পেলে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ত্রিভুজের বৃহৎ বাহুটিকে খাটো দেখাতে হলে এর অন্য দুই বাহুর যোগফল দেখাতেই হবে। অর্থাৎ ত্রিভুজের দুই বাহুকে যোগ করতেই হবে। কেবল তাহলেই ক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে। বর্তমান রাজনীতিতে এবং জনসমর্থনের দিক থেকে জাতীয় পার্টি ছোট হোক আর বড় হোক, ত্রিভুজের এক বাহু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে অংক করে দেখান– আমার কাঁধে যেহেতু অনেকগুলো মামলা আছে, তাই ভয়ে পড়ে হলেও আমাকে সরকারের দিকে যেতে হবে। তবে সেই ভয়ে ভীত হয়ে আমি যে সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়বো, তেমন রাজনীতি আমি করি না। এখানেও আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি, সরকারের ব্যর্থতার অংশীদার হতে ভয়ে বা লোভে পড়ে সরকারের সাথে মিশে যাবো না। ঐক্য হতে পারে ওখানেই, যেখানে বলতে হবে আগামীতে দেশ ও জনগণের জন্য কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে– তার ওপর ভিত্তি করে। আবার আর একটি পক্ষ অংক কষেন দুই পদ্ধতিতে। এক. আমি অতিবিপ্লবী রূপ ধারণ করে বিরোধী জোটে চলে যেতে পারি। তাতে আমার লাভ– চারদিকে আমার ধন্য ধন্য রব উঠবে। আমি ভয়কে জয় করতে পারি, নিজের জন্য ভাবি না, দেশের কথা ভেবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি– ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই. এদের অংকের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে– কোনোভাবে যদি জাতীয় পার্টিকে বিরোধীদের জোটে আনা না যায়, তাহলে আমাকে জেলে নিলেই তাদের জন্য ভালো। অর্থাৎ আমাকে যদি জেলে নেয়া হয়, তাহলে জাতীয় পার্টিকে আমার মুক্তির আন্দোলনে মাঠে নামতেই হবে। আর তখন সরকারবিরোধী জোটে না গিয়ে জাতীয় পার্টির আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। তবে অংক যে যেভাবেই করুক না কেনো, আমি জনগণের অংক ছাড়া আর কিছু বুঝতে চাই না, বুঝতে যাবোও না। সকল মহলকে অনুধাবন করতে হবে– আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় নেই, সুযোগও নেই। এখন আসতে হবে সংস্কারের পথে– প্রণয়ন করতে হবে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি এবং তার ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে জাতীয় মহাজোট।

www.pathagar.com

আরো একটি অপপ্রচার এবং কিছু কথা

জাতীয় পার্টিকে আরো একটি অপপ্রচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তা হলো সিপিবির উপর জাতীয় পার্টির কথিত হামলা। যা আদৌ সত্য নয়। আক্রান্ত হয়েছি আমরা, কর্মসূচির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিও আমরা। দলের নেতাকর্মীরা আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে– তাতেই সব দোষ চাপানো হয়েছে জাতীয় পার্টির উপর। সবার কথা আমলে আনিনি। তবে যাদের পণ্ডিত, নীতিবান, বিজ্ঞ–বুদ্ধিজীবী হিসেবে মনে করি– তাদের কলমে যখন অসত্য তথ্য এবং তত্ত্ব লেখা হয় তখন কিছুটা আহত হই বটে। সে রকমই একজনের কথা এই আলোচনায় উল্লেখ করতে চাই। তিনি বাম রাজনীতিবিদ ও কলামিস্ট বদরুদ্দীন উমর। তার লেখা 'সিপিবি'র জনসভায় সেনাপতি এরশাদের হামলা' শিরোনামের একটি নিবন্ধ ৪ জানুয়ারি-০৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক যুগান্তরে। বদরুদ্দীন উমরের মতো একজন লেখক আমাকে নিয়ে সত্যবর্জিত এমন একটি লেখা লিখেছেন– যা নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। আমাকে নিয়ে লেখা খুবই সহজ ব্যাপার। যা খুশি তাই লিখে দেয়া যায়। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে উমর সাহেবের মতো লেখকের কাছে যা কখনো আশা করিনি– উল্লিখিত লেখায় সেটাই পেয়েছি। রাজনৈতিক আদর্শগত দিক থেকে তার সাথে আমার কখনোই মিল হবে না– এটা সত্য। তাই বলে সঠিক তথ্য তার লেখায় পাওয়া যাবে না– তা দুর্ভাগ্যজনক।

নিবন্ধ বা প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস আমার নেই। আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আমার দিক থেকে অনেক কিছু বলার মতো বিষয় থাকলেও তা লেখার সময় হয় না। পয়লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মিছিল এবং সিপিবির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য বদরুদ্দীন সাহেব আমাকেই দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সিপিবির জনসভায় রাজনৈতিক কর্মীর নামধারী নিজেদের কিছু সংখ্যক গুণ্ডার মাধ্যমে হামলা চালিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি বহু গুণান্বিত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ফ্যাসিস্ট ঐতিহ্যের ইজ্জত রক্ষা করে নববর্ষে জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন।' এটি লেখকের প্রারম্ভিক বক্তব্য। তারপরে যা কিছু লিখেছেন তার সারমর্ম একটাই।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ওইদিন পল্টনের রাস্তায় সিপিবির জনসভা ছিলো, সেই জনসভায় আমরা হামলা চালিয়েছি। এটাই হলো বদরুদ্দীন সাহেবের মূল বক্তব্য। এই ধরনের বক্তব্যের পক্ষে তিনি যেসব যুক্তি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পড়ে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। তিনি সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের এতোটুকু চেষ্টাও করেননি। অবশ্য দু'একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিলো যে, 'সিপিবির সমাবেশে জাতীয় পার্টির হামলা'। কিন্তু এই হামলায় যারা আহত বা নিহত হয়েছেন তারা জাতীয় পার্টির কর্মী। অনেক পত্র-পত্রিকায় জাতীয় পার্টির মহিলা কর্মীদের ছবি ছাপা হয়েছে। নিহত মানুষটিও জাতীয় পার্টির একজন ওয়ার্ড নেতা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে জাতীয় পার্টির আহত নেতা-কর্মীরাই ভর্তি হয়েছেন। সিপিবির কোনো আহত নেতা-কর্মী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন– এমন কোনো খবর পত্রিকায় দেখা যায়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো– বদরুদ্দীন সাহেবের লেখার মধ্যে এসব তথ্যের এক ফোঁটাও উল্লেখ নেই। এমনকি যে রাজনৈতিক কর্মীটি নিহত হয়েছেন তার সম্পর্কেও একটি লাইন লেখা হয়নি। কারা নিহত বা আহত হয়েছেন– সে সব তথ্য বদরুদ্দীন সাহেবের যে জানা ছিলো না, তা নয়। হয়তো তিনি সচেতনভাবেই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। কারণ যদি লিখতেন– সিপিবির জনসভায় জাতীয় পার্টি হামলা চালিয়েছে, সেই হামলায় জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মী আহত ও নিহত হয়েছেন– তবে ব্যথা পেয়েছে সিপিবির নেতা-কর্মী, তাহলে পাঠক সেটাকে গ্রহণ করতেন না। আর সে বিবেচনাতেই বদরুদ্দীন সাহেব হামলার কথাটাই লিখেছেন– হামলার ফলটা বলেননি। বললে পাঠকরা প্রকৃত সত্যটা বুঝে ফেলতেন। তবে আমি একথাও বলছি না যে– জাতীয় পার্টির কর্মীরা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারই খেয়েছেন– তারাও প্রতিরোধ করেছেন। আর আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অধিকার সবারই থাকে। জাতীয় পার্টির প্রতিরোধের মুখে সিপিবির অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে– এটা সত্য। তবে সেটা কোন পর্যায়ে– তা বদরুদ্দীন সাহেবকে জানতে হবে।

জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার বিশ বছর বয়সে প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও আমরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছিলাম। ঐদিনটি উদযাপনের লক্ষ্যে পোস্টারিং হয়েছে, মাইকিং হয়েছে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোকসজ্জা হয়েছে, তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন জনসভা করার জন্য অনেক আগে মুক্তাঙ্গন ব্যবহারের অনুমতি নেয়া হয়েছে। বর্ণাঢ্য র‍্যালির জন্য সাজানো ট্রাক, ঘোড়ার গাড়িসহ আরো অনেকগুলো গাড়ি রাখা হয়েছিলো। মুক্তাঙ্গনে যখন আমাদের র‍্যালিপূর্ব সমাবেশ চলছিলো– তখন জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করে তোপখানা মোড় পর্যন্ত পুরো রাস্তা মানুষে পূর্ণ ছিলো। ওই রাস্তাটি সমাবেশে আগত জনতায় পূর্ণ থাকার কারণে বিজয়নগর মোড় থেকে তোপখানা মোড় পর্যন্ত এবং জাতীয় ঈদগাহের সামনের ফোয়ারা থেকে

www.pathagar.com

তোপখানা মোড় পর্যন্ত বাস গাড়িতে ঠাসা ছিলো। দৈনিক বাংলার দিক থেকে কিছু বাস-গাড়ি প্রেসক্লাবের দিকে এবং তোপখানা থেকে দৈনিক বাংলার দিকে কিছু রিকশা-গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিলো। জাতীয় পার্টির সমাবেশ শেষে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা যখন র‍্যালি নিয়ে যাত্রা করি, তখন আমাদের মিছিলের সামনে পুলিশের গাড়িও ছিলো। আমরা সেই গাড়ি অনুসরণ করে যখন দৈনিক বাংলার দিকে মিছিল নিয়ে যাত্রা করি, তখন সিপিবির অফিসের সামনে এসে আমরা বাধাগ্রস্ত হই। আমি দেখতে পেলাম সিপিবির অফিসের সামনে ৪০/৫০ জন সিপিবি কর্মী রাস্তায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে। উমর সাহেব যেটাকে জনসভা বলেছেন! আসলেই কি সেটা জনসভা ছিলো? ৪০/৫০ জন লোক চেয়ার নিয়ে বসে গেলে সেটাকে কি জনসভা বলা যায়? এই জনসভার কি কোনো প্রচার বা পোস্টারিং বা মাইকিং হয়েছে? এমন কি রাস্তার উপরে জনসভা করার জন্য কি কোনো পারমিশন নেয়া হয়েছিলো? বদরুদ্দীন সাহেব লিখেছেন যে, সিপিবি নিজেদের অফিসের সামনে জনসভা প্রায়ই করে থাকে। জনসভার সংজ্ঞা আমার চেয়ে উমর সাহেবেরই বেশি জানার কথা। কারণ তিনি একজন পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ এবং রাজনীতির দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ। সাধারণত জনসভা কাকে বলে এবং জনসভা বলতে কী বুঝি বা জনগণকে বোঝাই– সিপিবির সমাবেশটি কি সে রকম কোনো জনসভা ছিলো? সিপিবি যদি প্রায়ই জনসভা করে থাকে, তাহলে সেটা কি ওই রাস্তার উপর প্রায়ই আয়োজন করে? যদি তা করতে হয় তাহলে দৈনিক বাংলা থেকে তোপখানা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ রাখতে হয়। পয়লা জানুয়ারি বিকেলে সিপিবির সেই কথিত জনসভার সময় দৈনিক বাংলা থেকে তোপখানা পর্যন্ত রাস্তাটি কি যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ ছিলো? নাকি দুই পাশ দিয়েই সমানভাবে বাস-গাড়ি-রিকশা চলাচল করছিলো? আশা করি উমর সাহেব এসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করবেন।

আমি বলেছি– সিপিবির অফিসের সামনে যে তাদের সমাবেশ আছে তা জানতাম না। উমর সাহেব লিখেছেন, 'অন্য কোনো দলের জনসভা থাকলে তাকে জানানোর দরকার কী? তিনি কে?' তার উত্তরে বলতে চাই– অন্য দলের জনসভার কথা আমার জানার দরকার নেই– এটা ঠিক। কিন্তু রাস্তায় চলাচলকারী পাবলিকের তো জানার দরকার আছে। সিপিবির যদি রাস্তার উপর জনসভা থাকতোই, তাহলে তোপখানা মোড় থেকে রাস্তাটি বন্ধ থাকতো। একটি টিভি চ্যানেলের খবরেই দেখেছি– সিপিবির অফিসের সামনের রাস্তায় জনসভা করার ব্যাপারে তাদের কোনো পারমিশন ছিলো না। তাদের কর্মসূচি ছিলো 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস' উপলক্ষে নিজেদের কর্মীদের নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা। সেই আলোচনা সভাটি পারমিশন ছাড়া ৪০/৫০ জন লোকের জনসভায় রূপান্তরিত হয়ে হঠাৎ রাস্তায় নামলো কীভাবে– সে প্রশ্নের উত্তরটিও আমি উমর সাহেবের কাছে জানতে চাই। যে রাস্তা দিয়ে সমানভাবে বাস-গাড়ি-রিকশা চলাচল করছিলো, সেই রাস্তায় আমরা যখন মিছিল নিয়ে প্রবেশ করলাম সেখানে কেনো

www.pathagar.com

আমাদের বাধা দেয়া হলো। ৪০/৫০ সিপিবির লোক রাস্তা থেকে ফুটপাতে উঠে দাঁড়ালেই আমরা মিছিল নিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু সিপিবির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের মিছিলে যে বাধা দেয়া হবে– এটাই হয়তো ছিলো তাদের পূর্ব পরিকল্পনা। সেই অবস্থার মধ্যে আমার মহাসচিব সিপিবির নেতাকে অনুরোধ করে বললেন– 'আমরা জানতাম না এখানে আপনাদের সমাবেশ আছে, জানলে আসতাম না– এটা আমাদের ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দেবেন। ৫/৭ মিনিটের জন্য রাস্তাটা ছেড়ে দিন।' সেই অনুরোধ মনজুরুল সাহেব রাখলেন না। তখন ওই রাস্তায় গাড়ি-ট্রাক ও ঘোড়ার গাড়িগুলো ঘুরানোও সম্ভব ছিলো না। এদিকে বিশাল মিছিলের মানুষের চাপে যখন ৩০/৪০ জন লোক রাস্তার উপর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না, তখনই প্রথম আমার উপর হামলা চালানো হয়। মনজুরুল সাহেব নিজেই আমার গাড়ির উপর চেয়ার ছুড়ে মারেন। তা সত্ত্বেও আমি ওখান থেকে নীরবে চলে যাই। এই কথা আমার কর্মীরা জেনে গেলে তারা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলের বিশাল জনস্রোত প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই সিপিবির কর্মীরা তাদের অফিসের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সেখানেও যদি তারা থেমে থাকতো তাহলে ঘটনা হয়তো অবনতির দিকে এগোতো না। কিন্তু সিপিবির কর্মীরা তাদের ভবনের ২ ও ৩ তলায় অবস্থান নিয়ে আমাদের মিছিলের উপর বৃষ্টির মতো ইট, খোয়া আর বালি নিক্ষেপ করতে থাকে। আমাদের ৩৬ জন নেতা-কর্মী সেই ইটের আঘাতেই আহত হয়েছেন। আমার এক কর্মী ইটের আঘাত পেয়ে পালাতে গিয়ে বাসের সাথে ধাক্কা খেয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। অথচ উমর সাহেবের অভিযোগ ছিলো– সিপিবির জনসভায় হামলা করেছি আমরা। আমাদের কর্মীরা প্রতিরোধ করেছে, সেজন্য উমর সাহেবের ভাষায় তারা হয়েছে গুণ্ডা। আর যারা দুর্গের মতো অফিস ভবনে অবস্থান নিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছে– তারা হয়ে গেছে নিরীহ রাজনৈতিক কর্মী। সিপিবির অফিস থেকে যখন আমাদের মিছিলের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছে তখন সহজেই বোঝা যায় যে, তারা হামলার জন্য পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে ওৎ পেতে বসে ছিলো। জাতীয় পার্টির কর্মীরা যখন দেখেছে যে, তাদের সহকর্মীরা আহত হয়েছেন আবার একজন মারাও গেছেন– তখন তারা স্থির থাকতে পারেননি। বদরুদ্দীন সাহেব লিখেছেন যে, আমরা নাকি মিছিলের রুট পরিবর্তন করে সিপিবি অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তার ভাষায় এটা নাকি পূর্ব পরিকল্পিত। আমরা নাকি নিয়মিত রুট পরিবর্তন করেছি। আমরা নাকি সন্ধ্যার একটু আগে জনশূন্য হওয়া মতিঝিল এলাকায় মিছিল নিয়ে যেতে চেয়েছি। এ সব প্রসঙ্গে আমি সুস্পষ্ট ভাষায় উমর সাহেবকে জানাতে চাই যে, তিনি সম্পূর্ণ অসত্য কথা বলেছেন। গত বছরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও আমরা এই একই রুটে র‍্যালি নিয়ে দৈনিক বাংলার মোড় ঘুরে ডিআইটি রোড ধরে কাকরাইলে গিয়ে শেষ করেছি। এবার আমরা যখন সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে

www.pathagar.com

যাত্রা করেছি তখন সময় ছিলো বিকেল পৌনে পাঁচটা। সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস ছুটির সময় বিকেল পাঁচটা। অর্থাৎ ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত মতিঝিলের অফিসের লোকেরা রাস্তায় থাকেন যানবাহনের জন্য। এই সময়টা মতিঝিল এলাকা থাকে লোকে লোকারণ্য। এ ক্ষেত্রেও উমর সাহেব অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন।

জনসভায় হামলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, 'ক্ষমতায় থাকার সময় জনসভা ও মিছিলের উপর ট্রাক চাপিয়ে গণহত্যা করে তিনি যে আমোদফুর্তি তখন করতেন তারই ছিটেফোঁটা তিনি নিশ্চয়ই নববর্ষের প্রথম দিবসে ওই ঘটনার সময় উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের লোকেরা এমন মিথ্যা নেই যা বলতে পারেন না। তাছাড়া মিথ্যাবাদী হিসেবে এরশাদ একজন বহুল পরিচিত ব্যক্তি।' উমর সাহেবের এই বক্তব্যটুকু উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে– মিথ্যাবাদী কে তা প্রমাণ করা। পাপ কখনো চাপা থাকে না বলেই ট্রাক চাপার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। যারা সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য মিছিলে ট্রাক চাপা দিয়ে ছাত্র হত্যার অপকর্মটি বাস্তবায়ন করেছিলেন, তাদের ঘরের লোকেই শেষ পর্যন্ত 'আমার ফাঁসি চাই' নামের বই লিখে সব প্রকাশ করে দিয়েছেন। মানুষ হত্যা করে আমোদফুর্তি করে তারাই যারা গলাকাটার রাজনীতি করে। দুইজন ছাত্র সেদিন ট্রাক চাপায় মারা গিয়েছিলো বলে আমিই সেদিন বেশি আহত হয়েছিলাম। নিহতদের বাড়িতে গিয়ে শোক প্রকাশ করেছি। দুইজন ছাত্র নিহত হওয়াকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে যারা এটাকে গণহত্যা বলে দাবি করেন– তাহলে বাম রাজনীতির নামে যারা নির্বিচারে নিরীহ মানুষ হত্যা করে বিপ্লব দেখাতে চান, সেই হত্যাকাণ্ডকে কী বলে অভিহিত করা হবে? মিথ্যাচার আমার মধ্যে নেই। এই নিবন্ধের মধ্যেই দেখিয়ে দিলাম উমর সাহেব কতো জায়গায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং কতোগুলো সত্যকে আড়ালে রেখেছেন।

পয়লা জানুয়ারির ঘটনাকে কেনো উমর সাহেবরা সিপিবির উপর জাতীয় পার্টির হামলা বলে প্রচার করেন তা বুঝি। পরিকল্পিত হামলা করে সিপিবিকে যদি প্রতিরোধের মুখে পালাতো না হতো, তাহলে উমর সাহেবরা নিশ্চয়ই তাদের 'গাজীর' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতেন। এই হামলায় আমার একজন কর্মী নিহত হয়েছেন। যদি এই কর্মীটি তাদের হতো, তাহলে কি উমর সাহেব তার লেখায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি এড়িয়ে যেতে পারতেন? মাত্র কিছুদিন আগে আমার পার্টির ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজের কর্মীরা শিক্ষা সামগ্রীর মূল্য কমানোর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল বের করেছিলো। তখন চতুর্দিক থেকে বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা এক যোগে তাদের উপর হামলা চালিয়েছিলো। পত্র-পত্রিকায় তার সচিত্র খবরও ছাপা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র সমাজ বিতাড়িত।' সেটি বদরুদ্দীন সাহেবের কাছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা গুণ্ডামি বলে বিবেচিত হয়নি। সে সময়ে তিনি লিখতে

www.pathagar.com

পারেননি যে– ছাত্র সমাজের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বাম সিপাহীদের হামলা হয়েছে। উমর সাহেব পয়লা জানুয়ারিতে যে ঘটনা ঘটেছে সে ঘটনার দায় উল্টিয়ে জাতীয় পার্টির উপর চাপিয়ে একটি পার্টির সভায় ফ্যাসিস্ট হামলা বলে অভিহিত করলেন। কোনো রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশে হামলা হলে সেটাকে যদি ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপ বলা হয়, তাহলে এ যাবৎ কালের মধ্যে জাতীয় পার্টির উপর যতো হামলা হয়েছে সেগুলোকেও কি ফ্যাসিস্ট হামলা বলা হবে না? কিন্তু উমর সাহেব কি তা কখনো বলেছেন? বলতে পেরেছেন কি– বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো একটি ফ্যাসিস্ট হামলা করেছে! জাতীয় পার্টি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নির্বাচন করে ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ তারপরেও জাতীয় পার্টি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সায়েদাবাদে মহাসমাবেশ করতে পারেনি। পুলিশ আর মাস্তান একযোগে হামলা চালিয়ে শত শত নেতাকর্মীকে আহত করেছে, সেই মহাসমাবেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। জাতীয় পার্টির ১৪০টি বড় ধরনের জনসভা হামলা চালিয়ে ভেঙে দেয়া হয়েছে। তখন কি বদরুদ্দীন সাহেব এসব কর্মকাণ্ডকে ফ্যাসিবাদ বলে অভিহিত করে একটি কথাও লিখেছেন? জাতীয় পার্টির উপর হামলা হলে সেটাকে মনে করেন 'গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক মোলাকাত,' আর মুখে-কলমে নীতিকথার জোয়ার বইয়ে দেন– এটা ঠিক না। অন্তত সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার মানসিকতা প্রদর্শন করুন।

এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার সবার আছে। জাতীয় পার্টি এ দেশের রাজনীতিতে ভেসে আসেনি। জাতীয় পার্টি গণবিচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তাহীন কোনো দল নয়। আমরা ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পরও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। বামদের মতো দুরবস্থা জাতীয় পার্টির নেই। আপনারা দরিদ্র-মেহনতি-শোষিত মানুষের কথা বলেন। কিন্তু তারা কেউ আপনাদের পছন্দ করে না। বরং তারা জাতীয় পার্টির পক্ষে আছে। দেশের উত্তরবঙ্গের মানুষ সবচেয়ে দরিদ্র ও মঙ্গাপীড়িত। তারা কোনো বাম চেনে না। চেনে জাতীয় পার্টিকে। সুযোগ পেলে বামরা কী করতে পারে সে প্রমাণ এ দেশের মানুষ পেয়েছে। '৯১-এর নির্বাচনে ১৫ দলীয় জোটের সুবাদে সিপিবি নৌকা প্রতীক নিয়ে ৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেয়েছিলো। তার মধ্যে তারা ৫টি আসনে জয়ী হয়েছে। কিন্তু সেই ৫ এমপির একজনও পরবর্তীতে আর বামে থাকেননি। যে যার মতো করে সুবিধা অনুসারে ডানে চলে গেছেন। কেউ হয়েছেন বিএনপি, কেউ আওয়ামী লীগ আবার কেউবা হয়েছে গণফোরাম। এই তো বাম চরিত্রের আদর্শের নমুনা! সিপিবির সাথে জাতীয় পার্টির কোনো প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে না। তাদের সর্বমোট জনবল জাতীয় পার্টির কোনো জেলা ইউনিটেরও সমান নয়। বামরা একই নীতি-আদর্শের রাজনীতি করে। অথচ তারা বহুধাবিভক্ত। তাদের সব যোগ করলেও

www.pathagar.com

ফলাফল বড় একটি শূন্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। সেই সিপিবির মতো একটি দলের সাথে জাতীয় পার্টির কোনো ভাবে লাগতে যাবার প্রশ্নই আসে না। সিপিবি আমাদের একটি বর্ণাঢ্য মিছিলে বাধা দিয়ে পত্র-পত্রিকার শিরোনাম হবার যে পরিকল্পনা করেছিলো, সে ক্ষেত্রে সফল হয়েছে– এটাই তাদের রাজনৈতিক লাভ। আর আমরা একটি সুন্দর আয়োজনকে সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে পারিনি– সেটাই আমাদের ক্ষতি।

www.pathagar.com

সমালোচনার জবাব প্রসঙ্গ বিদিশা

গত কয়েকদিন ধরে পত্র-পত্রিকায় আমাকে নিয়ে ঝড় বয়ে গেলো। এখন কিছুটা স্তিমিত। বিষয়টা ছিলো আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রসঙ্গ। শুধু রিপোর্ট নয়– নামজাদা কলামিস্টরাও লিখেছেন এবং এখনো লিখছেন। সত্য মিথ্যা কল্পনা মিশিয়ে লিখছেন। লেখার মধ্যে গায়ের রাগ ঝাড়ছেন আমার বিরুদ্ধে। রাজনীতিবিদ, যারা পত্রিকায় কলাম লেখেন– তারাও লিখেছেন বিস্তর। বিভিন্ন পত্রিকায় আমার সাক্ষাৎকার বের হয়েছে। আমি মনে হয় বিষয়টা সকলের কাছে পরিষ্কার করতে পেরেছি। তারপরেও একটা কথা বলি। তালাক ধর্মীয় বিধানের মধ্যে একটিমাত্র নির্মম ব্যবস্থা। একজন স্বামী বা স্ত্রী কতোটা বাধ্য হয়ে এই পন্থাটি অবলম্বন করে তা বোধকরি ভুক্তভোগী ছাড়া বেশি কেউ অনুভব করবেন না। আমি প্রার্থনা করি– আমার যদি কোনো চরম শত্রুও থাকে, তার জীবনেও যেন তালাকের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। আমি জেল-জুলুম অনেক ভোগ করেছি। কিন্তু পরাস্ত হইনি। জীবনের একটি ক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য পরাজিত হয়েছি। তাই তালাকের মতো ব্যবস্থা আমাকে বেছে নিতে হয়েছে। শুধু সেখানেই পরিত্রাণ জোটেনি, জীবনের নিরাপত্তার জন্য, সন্তানকে বাঁচানোর জন্য আইনের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে হয়েছে। যাকে আমি স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলেছি, যার জন্য তীব্র সমালোচনার বিষ হজম করেছি, প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে যাকে আমার পার্টির সর্বোচ্চ ফোরামে অন্তর্ভুক্ত করেছি– সেই স্ত্রীকে কেন তালাক দিতে হলো– কেন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলো– এই উপলব্ধিটুকু যদি কেউ না করতে চান তাহলে বলতে হবে– এটা আমারই দুর্ভাগ্য। আর স্বীকার করতে হবে আমার তালাক দেয়া স্ত্রী বিদিশার সৌভাগ্যের কথা। কারণ যারা একদা তাকে নষ্টা-ভ্রষ্টা-কুলটা-চরিত্রহীনা বলে অভিহিত করেছিলো, তারাই এখন তাকে তাদের মায়ের আসনে বসিয়ে তপ-জপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এতে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যারা আমার সংসারে গুপ্তচরবৃত্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, তাদের পরিচয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে– একটা বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছি– আমার পার্টিতে স্বস্তি ফিরে এসেছে। বিদিশা-ঝড় পরবর্তী পরিবেশে এটাই আমার বড় অর্জন।

www.pathagar.com

আজ মনে হয়– যে মহলটি চক্রান্ত করে আমার ঘরের মধ্যে একটি বিষধর সাপ সৃষ্টি করেছিলো, সে ধরা পড়ায় পরিকল্পনাকারীরা বেসামাল হয়ে পড়েছে। পত্র-পত্রিকার লেখা পড়ে মনে হলো– লন্ডন প্রবাসী লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। তিনি বরাবরই আমার বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে বিষোদগার করে থাকেন। এটা যেন তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। গাফ্ফার চৌধুরী সুন্দর সাজিয়ে লিখতে পারেন– এটা সত্য। কিন্তু তিনি কোনো নিরপেক্ষ লেখক নন। এক পক্ষ তাকে পছন্দ করে –যারা তার লাইনের লোক) এবং আর এক পক্ষ তাকে ঘৃণা করে। কারণ তিনি মিথ্যা কথা লেখেন। তবে তিনি মিথ্যাকে উপস্থাপন করতে পারেন সত্যের পোশাক পরিয়ে– এটাই তার বড় মুন্সিয়ানা। এই লেখকটির একটি লেখা দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে গত ১৩ জুন '০৫ তারিখে। লেখাটির শিরোনাম ছিলো– 'চারিদিকে অন্ধকার বিদিশার নিশা'। এ লেখাটি আমার বিরুদ্ধে শুধু কুৎসাপূর্ণই নয়, এখানে তিনি অত্যন্ত অরুচিকর এবং অভদ্রোচিত ভাষা ও বাক্য প্রয়োগ করেছেন। ওই সব ভাষার জবাব দেয়ার রুচিও আমার নেই। গাফ্ফারের সৌভাগ্য যে, উনি লন্ডনে বসে যা খুশি তাই লিখে দেন এবং তা অবিকল ছাপা হয়ে যায়। অবাস্তব, অবান্তর এবং চরম মিথ্যা কথাগুলো তিনি আমার বিরুদ্ধে লিখে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। বিদিশার জন্য ওনার হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠেছে। উঠুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কিছুদিন আগেও এই বিদিশাকে কী ভাষায় এবং কী সব অভিযোগ উত্থাপন করে লেখালেখি করেছেন, তা কি তিনি ভুলে গেছেন? অবশ্য এক লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে– বিদিশা নাকি একবার তার জন্মদিনে একটা গিফট দিয়েছিলো। সেই 'গিফট' পাওয়ার পর তার লেখার ধরন একটু বদলে গেছে।

বিদিশাকে তালাক দেয়ায় এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় গাফ্ফার চৌধুরী ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এটাকে তিনি নারী নির্যাতন বলে উল্লেখ করেছেন। ভালো কথা, কিন্তু শুনতে খারাপ হলেও আমি বলতে চাই– যে সব কারণে আমি বিদিশাকে তালাক দিয়েছি তার মধ্যে একটি কারণ ঘটলেও কি আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারতেন? আমার বলতে খারাপ লাগলেও উদাহরণ হিসেবে বলতে হচ্ছে, ধরুন আপনি লন্ডনে বসে আছেন, আপনার স্ত্রী ঢাকায় এসে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর পরিবর্তে কলিমদ্দি বা ছলিমদ্দির নাম স্বামী হিসেবে দেখিয়ে আর একটা পাসপোর্ট নিয়েছে এবং ওই ব্যক্তির সাথে গোপনে সহাবস্থানও করছে– একথা জানার পর আপনার স্ত্রীকে কি আবার নতুন বউ সাজিয়ে বিয়ে করবেন, না তালাক দেবেন? এ বিষয়ে আমি আর বেশি দূর যেতে চাই না। গাফ্ফার চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি কোনো অসম্মান দেখিয়ে কথাটা বলতে চাই না। ধরা যাক তার স্ত্রীর কোনো এক সময়ের বিকিনি পরা ছবি লন্ডনের পত্রিকায় ছাপা হলো। এতে আব্দুল গাফ্ফারের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে, তবে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কেউ তা মেনে

www.pathagar.com

নিতে পারে না। এ ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হোক বা না হোক, বাংলাদেশের যে নারী এই অপসংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তারা এই সমাজে বাসের যোগ্যতা হারায়।

আব্দুল গাফ্ফার তার লেখায় অভদ্রতার শেষ সীমাও লংঘন করেছেন। তিনি যেন শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার ক্ষোভে-দুঃখে জ্বলে মরছেন। তার লেখার প্রায় প্রতিটি লাইনে গালাগালি এবং আমার সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভরে রেখেছেন। মিথ্যাচারের জবাব দিতেও রুচিতে বাঁধে। তিনি বিদেশের ব্যাংকে আমার অর্থ পাচারের কথা বলেছেন। এর যদি প্রমাণ দিতে না পারেন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, তাহলে নিজের মুখে নিজে জুতো মেরে পরিণত বয়সে মিথ্যাচারের পাপ হালকা করে নেবেন।

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, আব্দুল গাফ্ফার দেশের বাইরে অবস্থান করে তার নিজের জন্মস্থান, অর্থাৎ মাতৃভূমির প্রতি ক্রমাগতভাবে কুৎসা প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছেন। দেশকে হেয়প্রতিপন্ন করছেন। তিনি একটি বিশেষ দলের ক্যাডারের মতো কথা-কাজ করে থাকেন। তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কারো বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বা কাউকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেয় করার অধিকার তিনি রাখেন না। দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার রয়েছে। সরকারের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তাই বলে সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের অধিকার থাকতে পারে না। বিদিশা আমার স্ত্রী হয়ে আর একজনকে স্বামী দেখিয়ে আর একটি পাসপোর্ট গ্রহণ করবে, অন্য একজনকে স্বামী হিসেবে উল্লেখ করে ব্যাংক একাউন্ট খুলবে, কিংবা সে আমার সংসার জীবন তছনছ করে দেবে– অথচ আমি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবো না। ব্যবস্থা নিলে বলতে হবে– এর মধ্যে রাজনীতি আছে, সরকারের হাত আছে। আমি এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানাই। দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ানো, অপপ্রচার করা রাষ্ট্রদ্রোহিতারই শামিল। তাই এ ধরনের গাফ্ফারদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত।

আব্দুল গাফ্ফার আমার নামে লাম্পট্যের কথা বলেছেন। জানতে চাই– কার সাথে আমি লাম্পট্য করেছি? তারা কি আব্দুল গাফ্ফারের কাছে নালিশ জানিয়ে এসেছে? লাম্পট্যের অভিযোগ করতে পারে কোনো নারী। আমার বিরুদ্ধে কি কোনো নারী কোথাও এই অভিযোগ করেছে? এই ভদ্রলোক লন্ডনে বসে জ্বলছেন কেনো? ওনার কোনো নিকটজন কি কানে কানে তাকে লাম্পট্যের কথা জানিয়ে দিয়েছেন? বল্গাহীনভাবে বাজে কথা বলে যাবেন না গাফ্ফার চৌধুরী। নিজের অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। বৃটিশ সরকারের ভাতা খেয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার থেকে বিরত থাকুন। দেশের কথা যদি চিন্তা করেন, তাহলে দেশে ফিরে আসুন– দেশের জন্য কাজ করুন। প্রবাসী বাংলাদেশীরা অর্থ উপার্জন করে দেশে পাঠিয়ে জাতীয় উন্নয়নে অনেক অবদান

www.pathagar.com

রাখেন। কিন্তু আব্দুল গাফ্ফার এমন এক আদম যিনি দেশের অর্থ বিদেশে নিয়ে যান। উনি কথায় কথায় আমাকে স্বৈরাচার বলেন। আমি স্বৈরাচার হই আর যাই হই, দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলাম বলেই দেশ বাসযোগ্য হয়েছে। দেশের মানুষ এখনো যে সুখসুবিধা ভোগ করছে তার অধিকাংশ অবদান আমার। আমার শাসনামল যদি স্বৈরাচারী শাসনামল হয়, তাহলে বিবেকবোধ থাকলে স্বৈরাচার আর পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনামলের তুলনা করে দেখুন কোন আমলটা শ্রেষ্ঠ ছিলো। দেশের মানুষের কাছে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করুন। বিদেশে বসে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন না। এই আব্দুল গাফ্ফার এ পর্যন্ত তার লেখায় যতোবার আমার নাম উল্লেখ করে স্বৈরাচার শব্দটি লিখেছেন, সারা জীবনে ততোবার হয়তো নিজের বাবার নামও লেখেননি। কিন্তু তাতে দেশের মানুষের মধ্যে সামান্য প্রতিক্রিয়াও হয়নি।

বিদিশা আমার দাম্পত্য জীবন থেকে গত হয়ে যাওয়ায় গাফ্ফারের হা-হুতাশ দেখে আমার সন্দেহ হয়– যারা তাকে আমার সংসারের মধ্যে একটা দুষ্ট গ্রহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ষড়যন্ত্র করেছে– এই ব্যক্তি তাদের মধ্যেই একজন। তার লেখার মধ্যে উল্লেখ আছে– লন্ডনে গিয়ে বিদিশা তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। বিদিশা জানতো আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী আমার একজন ঘোর বিরোধী। হেন আ-কথা, কু-কথা নেই যা সে আমার সম্পর্কে ব্যবহার করেনি। আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে সরকার গঠনে সুযোগ দেয়ার জন্য কিছুদিন গাফ্ফারের প্রিয় ছিলাম। কিন্তু ৪ দলীয় জোট গঠনের পর থেকে শুরু হয়েছে তার গাত্রদাহ। এহেন লোকের সাথে আমার স্ত্রী হয়ে বিদিশা সাক্ষাৎ করতে যাবে কেন? বেশ কয়েক বছর আগে গাফ্ফার চৌধুরী আমার স্ত্রী বেগম রওশন এরশাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন– সে কথা আমি জানতাম। কিন্তু বিদিশা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো সে কথা আমার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। সুতরাং এটা বোঝা যায় যে, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের হোতাদের মধ্যে আব্দুল গাফ্ফার এক অন্যতম চরিত্র। যার কাজ শুধু আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারই নয়, আমাকে রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষ করাও তার অপতৎপরতার একটি অংশ। বিদিশার সাথে সাক্ষাতের পটভূমি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তার বাবা আবু বকর সিদ্দিক ছিলেন আব্দুল গাফ্ফারের বন্ধু। বিদিশার বাবা নাকি তাকে আব্দুল গাফ্ফারের সাথে দেখা করতে বলেছিলেন। তাই বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি বন্ধু-কন্যার সাথে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আব্দুল গাফ্ফারের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বিদিশা মিথ্যা বলেছে। কারণ বিদিশা যতোদিন আমার ঘরে ছিলো ততোদিন তার পিতার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে দেখিনি। আগে থেকেই আবু বকর সাহেবের সাথে বিদিশা ও তার মা-ভাইবোনদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আমাকেও সম্পর্ক গড়তে দেয়নি। বিদিশার অজ্ঞাতে একবার তার বাবার সাথে দেখা করেছিলাম বলে খুব ঝগড়া করেছিলো। সেদিন আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের দুরবস্থা দেখে

www.pathagar.com

আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। তাই প্রতি মাসে বিদিশার বাবাকে দশ হাজার টাকা দিতাম। যে কথা বিদিশা জানতো না। বিদিশার বাবা আমার কাছে ফোন করে জানতে চাইতেন তার মেয়ে আমার কাছে আছে কিনা। থাকলে তিনি আর ভয়ে কথা বলতেন না। বাপের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করতেন। এই ছিলো বাপ-মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক। শেষ পর্যন্ত বিদিশার বিপদে তার বাবাই এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তার আগে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সুতরাং গাফ্ফার চৌধুরীর সাথে সাক্ষাতের যে পটভূমি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে দুইজনের যে কোনো একজন মিথ্যা বলেছেন।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী সম্পর্কে আমি বেশি কথা আর বলতে চাই না। তার লেজে মণকে মণ ঘি মালিশ করলেও ওটা সোজা হবে না– সে কথা আমি স্পষ্টভাবে জানি। এও বুঝতে পেরেছি– বিদিশার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ায় তার আঘাত লেগেছে কোথাও। গাফ্ফার চৌধুরী যে তার লেখক জীবনের আগাগোড়া দুইমুখে কামড়ান– সে কথা প্রবীণরাও জানেন। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে চাকরি করতেন এবং সেখানে কলাম লিখতেন স্বনামে আর দৈনিক আজাদে লিখতেন ছদ্মনামে। ইত্তেফাকে নিজে যা লিখতেন, আজাদে তার তীব্র সমালোচনা করে লিখতেন। আবার আজাদে যা লিখতেন, ইত্তেফাকে তার সমালোচনা করতেন। এ জাতীয় নীতিহীন লোক সম্পর্কে বেশি আর কি-বা বলা যায়।

দৈনিক যুগান্তরে ১৮ জুন '০৫ বিদিশা প্রসঙ্গ নিয়ে রাশেদ খান মেননও একটি নিবন্ধ লিখেছেন। মেনন সাহেবও আমার একজন ঘোর সমালোচক। তিনি বিষয়টিকে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। বস্তুত আমি নিরুপায় হয়ে যা করেছি ওটা ছিলো আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তালাক ধর্মের স্বীকৃত একটি বিষয়। কেন মামলা করেছি সে কথা পূর্বেই বলেছি। তারপর আইনের আওতায় যা ঘটেছে সেখানে কারো হাত নেই। আইন সবার কাছে সমান। নারী পুরুষের ভেদাভেদ থাকে না, থাকতেও পারে না। সব প্রসঙ্গ বাদই দিলাম, একটা অভিযোগের কথাই বলি। একজন নারী যদি দুইজনকে স্বামী দেখিয়ে দুইটি পাসপোর্ট গ্রহণ করে, সেটা কি তার অপরাধ নয়? এ ব্যাপারে যদি মামলা হয় তাহলে সেটা জামিনযোগ্য। আদালত তাকে জামিন দিয়েছেও। আমি যে অভিযোগ করেছি তাতে নির্দোষ প্রমাণিত হলে সে সাজা পাবে না। কিন্তু কারো দ্বারা যদি আমার জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে কি আমি আইনের সাহায্য নিতে পারি না? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা এটা কি নতুন ঘটনা? পরিস্থিতি এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্ম দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। মেনন সাহেব তার লেখার মধ্যে এক জায়গায় এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, 'এটা ঠিক বিদিশার মতো মহিলারা অর্থবিত্ত-ক্ষমতার কারণে যে আচরণে লিপ্ত হন তাতে তাদের প্রতি সহানুভূতি থাকার কোনো কারণ নেই। এ ধরনের নারীরা সমাজ তো বটেই রাজনীতিকেও কলুষিত করছেন। শত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে নারীসমাজ সমাজ ও রাজনীতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত

www.pathagar.com

তাদের কলঙ্কিত করছেন।' মেনন সাহেবের এই উপলব্ধিটুকু যথার্থ। বিদিশাকে বিয়ে করা আমার ভুল ছিলো। তার সাথে চেনা-জানা থেকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখানে তো আমার কোনো অপরাধ ছিলো না। স্বামী সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন– জীবনের তার কথা আমি বিশ্বাস করেছি। তাকে আমি ঘর দিয়েছিলাম, সম্মান দিয়েছি, সন্তান দিয়েছি– এর মধ্যে আমার তো কোনো অন্যায় ছিলো না। ব্যর্থতা আমার একটাই। তা হলো– তাকে সৎ পথে রাখতে পারিনি। সে তার কর্মফল ভোগ করেছে। নারী সমাজের মর্যাদা সে ভূলুণ্ঠিত করেছে। মেনন সাহেব জাতীয় মহিলা পার্টির বিবৃতি উল্লেখ করে বলেছেন, 'এরশাদ রাহুমুক্ত হয়েছেন– কিন্তু একজন নারীর প্রতি তিনি যে অন্যায় করেছেন তার কি হবে?' রাশেদ খান মেনন এখানে ঠিক কথা বলেননি। আমি বিদিশার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি। বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে। ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের জায়গা আদালত। বিদিশার সাথে সংসার চলমান থাকলে আমার জীবনাশঙ্কা নিশ্চিত ছিলো। সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ বেছে নেয়া আমার কি অন্যায় হয়েছে? যে নারী সন্তানকে হত্যা করে আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছে, তাকে নিয়ে ঘর করা তো আমি নিরাপদ মনে করিনি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে গেলে আমার সন্তানকে জিম্মি করে ৬ তলা থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলো। পত্র-পত্রিকায় তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের নারী কোন পর্যায়ের হতে পারে? এমন নারীকে নিয়ে এক ছাদের নিচে বাস করা যায় কিনা– সে কথা যদি রাশেদ খান বা আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীরা একটি বারের জন্য বিবেচনা করতেন, তাহলে আমাকে দোষারোপ করে তারা কলাম লিখতে যেতেন না।

'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়' শিরোনামে বিদিশাকে নিয়ে কামাল লোহানীর লেখা আর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে দৈনিক যুগান্তর ২২ জুন ২০০৫ তারিখে। এখানেও বিষয়বস্তু একই। বিদিশার জন্য তার বাবার বন্ধুদের এই হা-হুতাশ দেখে আমারও মনে হয় সত্যি সত্যিই 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। বিদিশাকে নিয়ে ৫ বছর সংসার করেছি আমি। তার শারীরিক সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জানার কথা আমার। আমি বলেছি– সে অসুস্থ্য নয়। অসুস্থতার ভান করছে। কামাল লোহানী 'কালা হ্যায়' কলামে লিখেছেন– 'বিদিশা অসুস্থ'। সে সুস্থ না অসুস্থ তাতো তার জানার কথা নয়। আমি তাকে তালাক দেয়ার পর যে চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করেছেন– তাদের রিপোর্ট উল্লেখ করে তো লোহানী সাহেব বিদিশা অসুস্থ কিনা তা বলেননি। লিখেছেন সে অসুস্থ। অথচ তার লেখাটি যখন প্রকাশিত হয়েছে– সেদিন পিজি হাসপাতালের ৫ সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে– বিদিশা সম্পূর্ণ সুস্থ। তাহলে দাঁড়ালোটা কী! কামাল লোহানী মিথ্যা কথা লিখেছেন।

লোহানী সাহেব তার লেখার উল্লেখ করেছেন, বিদিশার বাবা তাদের বন্ধু ছিলেন। থাকতে পারে। তার বন্ধু আরো অনেকে ছিলেন। বিদিশা প্রথম

www.pathagar.com

যাকে বিয়ে করেছিলো সেই বৃটিশ ভদ্রলোকও তার বাবার বন্ধু ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে এসে এই বন্ধুত্ব হয়েছিলো। তখন আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের বড় মেয়ে বিদিশার বয়স ১৪ আর তার বিদেশী বন্ধুর বয়স ৪০। আবু বকর সাহেব সেই সময় দেশের বিবাহ বিধি লঙ্ঘন করে তার কিশোরী কন্যাকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে দিয়ে ছিলেন। ১৮ বছর বয়সের নিচে কোনো কিশোরীর ওই বিয়েটাই তো আইনগতভাবে অপরাধ ছিলো। কামাল লোহানী সাহেবদের বিবেচনায় তখন কোনো দোষ হয়নি। আমি অধিক বয়সে ডিভোর্সি জেনে ৩৪ বছর বয়সের এক মহিলাকে কেন বিয়ে করেছি সেটাই ছিলো মহাঅপরাধ। আমি শরিয়ত মোতাবেক স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। এটা নিয়ে কৈফিয়ত দেয়ার কিছু নেই। আমি বিদিশার বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণে মামলা করেছি– এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব আদালতের। সরকার তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করেছে। যদি অপরাধী সাব্যস্ত না হয়– সে বেরিয়ে আসবে। এখনই এত হা-হুতাশ কেন? এত দিন তো চাচাজানদের ভাতিজির জন্য দোয়া করতেও দেখিনি বা শুনিনি! তারা কি আমার ঘরে ফাঁদ পেতে ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন? তাই মনে হচ্ছে 'ডাল মে কালা' অবশ্যই কিছু ছিলো– সেটা আবিষ্কৃত হওয়ায়ই হয়তো এদের জ্বালা ধরেছে। বিদিশা এর আগেও সে আর এক স্বামীর ঘর করতে পারেনি। স্বামী ও দুই সন্তান বৃটেনে রেখে ঢাকায় এসে একাকী জীবনযাপন করেছে। সে তার বাবার আশ্রয়ে থাকেনি কিংবা থাকতে চায়নি। তখন তো এই সব চাচারা পত্রিকায় সিরিয়াল তার জন্য ধরে কলাম-কাহিনী লেখেননি! এই লেখকদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো– বন্ধু কন্যার প্রতি যদি প্রকৃত অর্থে দরদ থাকে তাহলে আইনগতভাবে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করে বের করে আনুন। অন্যকে দোষারোপ করতে যাবেন না। কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করতে হবে– কেউ তা খণ্ডাতে পারবে না।

www.pathagar.com

মানবজমিন এবং একজন পিতার অশ্রুসজল ঈদ

এবারের ঈদের বেশ আগে থেকেই মনটা খুব খারাপ ছিলো। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা পরিস্থিতি আমাকে খুব পীড়া দিয়েছে। মঙ্গার কারণে বিদেশ সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে এসেছি। ফিরেই চলে গেছি উত্তরাঞ্চলে। দেখেছি মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা। উপলব্ধি করেছি অনাহারক্লিষ্ট মানুষের যন্ত্রণা। মনটা পাগল হয়ে উঠেছিলো– যদি এইসব ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে পারতাম! আমার সাধের সীমা ছিলো অপরিসীম, কিন্তু সাধ্যের মাত্রা ছিলো খুবই সীমিত। যতোটুকু সম্ভব ছিলো তাই নিয়ে মঙ্গাপীড়িত কিছু মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আহ্বান জানিয়েছিলাম দেশের বিত্তবান সমাজের কাছে- মঙ্গায় কাতর জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। বলেছিলাম– সামনে ঈদ, এই সময় দেশের একটি অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠীকে অভুক্ত রেখে আমরা ঈদ উদযাপন করতে গেলে আনন্দে পূর্ণতা থাকবে না। তাই আসুন সবাই– সকল মহল মঙ্গাকবলিত অঞ্চলের আর্তমানবতার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে– বিত্তবানদের ঈদ যথারীতি ব্যয়বহুল আনন্দেই উদযাপিত হয়েছে। অপরদিকে ক্ষুধার্ত মানুষ এক বেলার ভাতের জন্য হাহাকার করেছে।

এসব ঘটনায় মনটা ভারাক্রান্ত ছিলো। তবুও ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দিন, যে দিনকে শত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও কোনোভাবে উপেক্ষা করা যায় না। সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মিলন ঘটায় এই ধর্মীয় উৎসব। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে উৎসবের ছোঁয়া শীতল থাকলেও প্রাণের পবিত্র আমেজ ফুরিয়ে যায় না। তাই ভারাক্রান্ত মনের বেদনাকে চাপা রেখে পুত্র এরিককে নিয়ে ঈদের নামাজ পড়ে দেশবাসীর কল্যাণে খোদার দরবারে মোনাজাত করতে চেয়েছিলাম। এরিক শিশু। নিষ্পাপ। অবুঝ। কিন্তু আল্লাহকে চিনেছে। এতোটুকু বয়সেই মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে। ওকে ওমরাহ করতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম সকলের জন্য দোয়া চাইতে। অবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি কাজ করে এরিকের মাথায়। পবিত্র কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ধরে সকলের জন্য দোয়া চেয়েছে। বলেছে– আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে ভালো করে দাও। ভেবেছিলাম ঈদের নামাজ পড়ে এরিককে দেশ ও জনগণের জন্য

www.pathagar.com

দোয়া চাইতে বলবো, দেশের মঙ্গা দূর করে দিতে বলবো। ওকে যাই বলি তোতা পাখির মতো তাই বলে যেতে পারে। শুনলে মনটা ভরে যায়। সেই এরিককে নিয়ে এবার আমি ঈদের নামাজে যেতে পারিনি। ঈদের দিনে এরিককে আমি বুকে তুলে নিতে পারিনি। ঈদের জামাতে ওর কচি মুখে আমি শুনতে পারিনি– হে আল্লাহ, আমাদের দেশটাকে ভালো করে দাও! যারা না খেয়ে আছে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দাও! কিন্তু কেনো পারলাম না? কেনো একজন পিতা হয়ে আমি ঈদের দিনে সন্তানের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলাম? কেনো আমার ঈদের আনন্দ বেদনার অশ্রুতে ধুয়ে গেলো? কে বা কারা এর জন্য দায়ী? তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আমি জনতার আদালতে পেশ করতে চাই। আনন্দময় ঈদের দিনে পড়ন্ত বেলায় পুত্র এরিকের জন্য মনটা যখন খাঁ-খাঁ করে যাচ্ছিলো– তখন মনে হলো বেদনার কালিতে লিখে রাখি এক অসহায় পিতার অশ্রুভেজা একটি ঈদ উদযাপনের কাহিনী।

ঈদের দিনে মঙ্গাপীড়িত মানুষের ছবি একদিকে আমার আনন্দকে বিবর্ণ করে রেখেছিলো আগে থেকেই। তার ওপর পুত্র এরিকের কাছে না থাকার কষ্টগুলো অশ্রুসিক্ত করে রেখেছে সারাক্ষণ। আমি দায়ী করবো একটি পত্রিকাকে। আমি রাজনীতিবিদ হলেও আমার একটা ব্যক্তিজীবন আছে। সেখানে আছে ঘাত-প্রতিঘাতের অনেক চিহ্ন। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাকে আমার বয়ে বেড়াতে হয়। আমার দাম্পত্য জীবনে তালাকের মতো নির্মম ও নিষ্ঠুর বিধানকে অবলম্বন করতে হয়েছে। একজন স্বামী জীবন যন্ত্রণার কোন পর্যায়ে উপনীত হলে তালাকের মতো পন্থাকে গ্রহণ করতে হয়– বিবেকবান মানুষ মাত্রই সেই পরিস্থিতিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা উচিত। আমি বিদিশাকে কেনো তালাক দিয়েছি তার প্রেক্ষাপট, ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। নতুন করে বলার কিছু নেই। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে তালাকের পরে প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে কোনোভাবে হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক রাখতে পারি না এবং তা কোনোভাবে সম্ভবও নয়। তবে সন্তানের কারণে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে সাধারণ কোনো যোগাযোগ থাকাটা দোষের কিছু হতে পারে না। আমাদের দু'জনের একটি শিশুসন্তান রয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে সে বাবা-মায়ের কাছে থাকে। তালাকের পর সমঝোতার মাধ্যমে এরিক এক সপ্তাহ আমার কাছে এবং এক সপ্তাহ তার মার কাছে থাকে। আমার ছেলে তো এই সাত দিনের গণ্ডি সম্পর্কে অবুঝ। তাই সে মায়ের কাছে যখন থাকে তখন আমার কাছেও চলে আসতে চায়। তার মা তাই কখনো কখনো আমার কাছে এরিককে পাঠিয়ে দেয়। তাই এরিককে নিয়ে আসা বা দিয়ে আসার জন্য বিদিশার সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা ছাড়া আর কি কোনো গত্যন্তর আছে? অথচ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকাটি আমার শিশুসন্তানের মা-বাবার কাছে যাওয়া-আসার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমন একটি উদ্দেশ্যমূলক খবর ছাপিয়ে বসলো– যে কারণে দেশের মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে। রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছে ঈদের ঠিক

www.pathagar.com

একদিন আগে। তারপর ৩ দিন পত্রিকা বন্ধ। সুতরাং প্রতিবাদ দিলেও তা প্রকাশিত হবে ৪ দিন পর। আর মানবজমিনের নীতি হলো– আমার কোনো প্রতিবাদ সাধারণত তারা ছাপায় না। এদিকে আমার সাথে বিদিশার কাল্পনিক খবর প্রকাশিত হওয়ায় বিদিশা ঈদের দিনে এরিককে আমার কাছে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ চুক্তি অনুসারে ওই সময়ে এরিকের বিদিশার কাছেই থাকার কথা। তাই এরিক আমার সাথে ঈদের জামাতে যেতে পারলো না– ঈদে সে পিতার সান্নিধ্য পেলো না। আমি সন্তানের ছোঁয়া পেলাম না– ঈদের খাবার তার মুখে দিতে পারলাম না। অনেক যত্নে সন্তানের জন্য ঈদের যে পোশাকটি কিনেছিলাম, সেটি তাকে পরাতে পারলাম না। মানবজমিন এই পরিস্থিতিটি সৃষ্টি করে সাংবাদিকতার কী মহান দায়িত্ব পালন করেছে– সে বিচারের ভার যদি তাদের বিবেকের ওপর ন্যস্ত করি তাহলে কী রায় পাওয়া যাবে তা জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি– মানবজমিন একটি শিশুর ঈদ উদযাপন থেকে বঞ্চিত করে আলাহর কাছে তার হাত তুলে মোনাজাত করা থেকে বিরত করে একজন পিতার ঈদকে অশ্রুসিক্ত করেছে।

ঈদের আগের দিনে দৈনিক মানবজমিনে "এরশাদ-বিদিশা ফের প্রেমে মগ্ন" শিরোনামের লিড নিউজটি দেখে আমি বিস্মিত এবং হতবাক হয়েছিলাম। অমানবিক বক্তব্য মিশ্রিত ওই খবরটি দেখে আমি দারুণভাবে আহত হয়েছিলাম– ওরা কেনো এভাবে আমার ক্ষতি করতে চায়। আমি বিদিশাকে কোনো গাড়ি দেইনি। অথচ লেখা হয়েছে– আমি তাকে দু'টি গাড়ি দিয়েছি। আমার ছেলের স্কুলে যাওয়ার জন্য একটি ছোট্ট গাড়ি কিনে দিয়েছি। সেটা বিদিশাকে দেয়া হয়েছে বলে লেখা হয়েছে। এই ধরনের কথার কী প্রতিবাদ করা যায়! আমার ছেলে যখন তার মায়ের কাছে থাকে তখন আমি মাঝে মাঝে ওর জন্য খাবার পাঠাই। এরিক যখন আমার কাছে থাকে তখন ওর মা কখনো কখনো কিছু খাবার পাঠায়। এটা কি খুব অপরাধের বিষয়? সন্তানের মুখে খাবারও দিতে পারবো না? যারা এটা নিয়ে লিখেছেন তাদের কী সন্তান-সন্ততি নেই? তারা কি তাদের সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন না? আমরা আমাদের সন্তানের জন্য খাবার দেই বা পাঠাই– সেটাকে সূত্র ধরে আমার নামে একটি খবর ছাপিয়ে জনগণের কাছে আমাকে হেয় করা হলো– আমার ছেলেকে ঈদের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত করা হলো। ওদের কারণে আমার ছেলেটা এবার ঈদের জামাতে যেতে পারলো না– এই কষ্ট আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু কেনো ওরা আমার ব্যক্তিজীবনের ওপর এভাবে আঘাত হানবে? আমি রাজনীতি করি তাই বলে কি?

ঈদের আগে আমি উত্তরবঙ্গে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে গিয়েছিলাম। তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করেছি। কিন্তু তা মানবজমিন পত্রিকায় লিড নিউজ হয়নি। এমনকি ছোট করেও ছাপায়নি। মঙ্গাপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছি– সে কথাও এই পত্রিকা ছাপেনি। মনে

www.pathagar.com

হয়– দুর্গত মানুষকে সাহায্য করা বা ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান এদের কাছে ভালো লাগেনি। ওদের মাথাব্যথা উঠেছে আমি কেনো আমার সন্তানের জন্য খাবার পাঠালাম বা তার মা কেনো খাবার পাঠালো।

আমাদের দেশে রাজনীতি করাটাই যেনো অপরাধ। হয়তো কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ রাজনীতির নামে কিছু অনৈতিক কাজ করে ফেলেন। কারণ এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তারাও বাসিন্দা। ছোট-খাটো স্বার্থের কাছে কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ত্যাগী রাজনীতিবিদও তো আছেন। দেশ গড়া, দেশ পরিচালনা, সকল ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া কিংবা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে মানুষের সেবায় এগিয়ে আসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজনীতিকরাই তো অবদান রাখেন। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনও তো রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল। আবার দেশ ও জাতির সেবা করতে গিয়ে জেল-জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন সেসবও সহ্য করতে হয় রাজনীতিকদের। সেই সাথে মিডিয়ার খড়গটিও সব সময় ঝুলে থাকে রাজনীতিকদের ঘাড়ের ওপর। তাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন– যা তাদের একান্তই নিজস্ব, তার ওপর মিডিয়ার দৃষ্টি থাকবে কেনো? রাজনীতিকের রাজনীতি নিয়ে সমালোচনা-পর্যালোচনা যাই করা হোক না, তা মিডিয়ার এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু সেখানে তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে দেশের কী উপকার বা সাংবাদিকতার কী মহান দায়িত্ব থাকতে পারে? একজন শিল্পীর একটি ছবিকে ভালো বা মন্দ বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই ছবি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিল্পীর ক'টা বউ বা কার সাথে সে প্রেম করে– এটা কি আলোচনার বিষয় হতে পারে?

এরিক আমার শুধু সন্তানই নয়, সে আমার আরো অনেক কিছু। একজন রাজনৈতিক পিতার সন্তান হিসেবে সে আমার দেশের তাবৎ শিশু সমাজের একটি প্রতীক। এরিকের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আমি সব শিশুর ছবি দেখার চেষ্টা করে। আমি বিশ্বাস করি আমার সন্তানকে যেভাবে ভালোবাসি– সব পিতা এভাবেই তার সন্তানকে ভালোবাসেন। আমি আমার সন্তানকে যেভাবে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলতে চাই– সব পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে সেভাবেই গড়তে চায়। আমি রাজনীতি করি মানুষের জন্য। মানুষের প্রত্যাশা পূরণই আমার প্রচেষ্টা। এক এরিকের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে আমি সব শিশুদের প্রতি ভালোবাসা জানাই। কোনো শিশুর কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না। এবারের ঈদে আমার সন্তান এরিক কষ্ট পেয়েছে। সে তার পিতাকে কাছে পায়নি। ঈদের জামাতে যেতে পারেনি। জামাতে বসে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাতে পারেনি। সেই কষ্ট আমার ঈদকে ম্লান করে দিয়েছে। একজন স্নেহময় পিতার ঈদ উদযাপিত হয়েছে সন্তানের জন্য অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। ঈদের অবসরে সেই বেদনাবিধুর স্মৃতি মন্থন করেই লেখা হলো এই কাহিনী।

(৪ নভেম্বর ২০০৫)

www.pathagar.com

খুলনাবাসীর একটি স্বপ্ন পূরণ এবং আমার কিছু স্মৃতি

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের আনন্দ-উৎফুল্লতার সাথে আমিও একীভূত হয়েছি। তাদের একটি স্বপ্নসাধ পূরণ হয়েছে। প্রমত্তা রূপসা নদীর উপর দুই পাড়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের সেতু নির্মিত হয়েছে। বাস, গাড়ি ট্রাকসহ মানুষের পারাপারের দুর্ভোগ কেটে গেছে। অনেক প্রতীক্ষার পর খুলনাবাসীর স্বপ্নের সেতুটি বাস্তব রূপ পেয়েছে। সেতুটি উদ্বোধন করতে পারায় দেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আমি অভিনন্দন জানাই। তিনি খুলনা তথা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অনেক দিনের প্রত্যাশার ফলক উন্মোচন করেছেন। আরো ভালো লাগতো যদি প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সেতুর সাথে রেললাইন সংযোজিত থাকতো। মংলাকে কার্যকরি সমুদ্র বন্দরে পরিণত করতে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ছিলো একটি অপরিহার্য বিষয়।

ওলিকুল শিরোমণি হযরত খান জাহান আলী –রহঃ)-এর নামানুসারে রূপসা সেতুর নামকরণ করা যথার্থই হয়েছে বলে আমি একান্তভাবেই মনে করি। এই সেতুটি বাস্তব রূপ লাভ করায় আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হবার কারণ এখানে আমারও কিছু স্মৃতিচিহ্ন জড়িয়ে আছে। পাকিস্তান আমলে সম্ভবত ১৯৬৭ সালে এই রূপসা সেতু নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিলো। তবে সেতুটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম আমি। খুলনার অবিসংবাদিত নেতা সবুর খান সাহেব পাকিস্তান আমলে ক্ষমতার সাথে যুক্ত থাকাকালে দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার ভূমিকার জন্য তিনি বিতর্কিত হয়েছেন এটা সত্য– কিন্তু ১৯৪৭ সালে খুলনাকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করতে যে ভূমিকা পালন করেছেন সে ইতিহাসও মনে রাখতে হবে। হয়তো খুলনার জনগণ সে কথা মনেও রেখেছিলো। তা না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে তীব্র সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সবুর খান তিন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটিতেই বিপুল ভোটে বিজয়ী হতে পারতেন না। আমার সমস্যা হচ্ছে– যার যেটুকু অবদান তা ভুলতে পারি না। সে কথা স্মরণ করি। খুলনা শিল্প নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বড় তিনি সবুর খান। তিনি রূপসা সেতু নির্মাণের দাবি তুলেছিলেন পাকিস্তান আমলে। কিন্তু কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। তারপর

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমল গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশেরও অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। খুলনাবাসীর একটি প্রাণের দাবির দিকে কোনো সরকার ফিরে তাকায়নি। ক্ষমতা গ্রহণের পর আমি রূপসা সেতু নির্মাণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করার সময় আমি পাইনি। কারণ সংসদে এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাসের পর মাত্র চার মাসের মতো সময় পেয়েছি। তবে আমি গর্বের সাথে বলতে পারি– খুলনা তথা দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে আমি যতোটা কাজ কাজ করেছি, আর কোনো সরকার তা করতে পারেনি। এমনকি আমার পরে আর কোনো সরকার দক্ষিনাঞ্চলের দিকে ফিরেও তাকায়নি। খুলনায় আড়াইশ' বেডের আধুনিক হাসপাতাল, খুলনাকে মেট্রোপলিটন সিটিতে রূপান্তর, খুলনা পৌর কর্পোরেশন, খুলনা পাবলিক হল প্রতিষ্ঠা আমার উদ্যোগেই হয়েছে। খুলনা-মংলা মহাসড়ক, খুলনা–সাতক্ষীরা মহাসড়ক, খুলনা–চালনা সড়ক, খুলনা-পাইকগাছা সড়ক, খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কসহ অনেক ছোট-বড় পাকা রাস্তা নির্মাণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে আমার সরকারের আমলে।

সবচেয়ে বড় কথা আমি খুলনাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। যে বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজ জেলা রংপুরে প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম, সেটি আমি খুলনাবাসীকে উপহার দিয়েছি। এখানে আমার মধ্যে জেলাপ্রীতি কাজ করেনি। ন্যায় ও বিচারবোধকে আমি বড় করে দেখেছিলাম। রংপুরবাসীরও বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিলো। খুলনারও ছিলো। আমি খুলনাবাসীর দাবি অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছি। কারণ তখন একমাত্র খুলনা বাদে অন্য সব বিভাগীয় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো। দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে গোটা দেশকে আমি সমান চোখে দেখেছি। সেদিন যদি ন্যায়-নীতি-নিরপেক্ষতাবোধ বিসর্জন দিয়ে খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করতাম তাহলে আজ হয়তো দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সামনে এভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না। এতোটা বড় গলা নিয়ে আজ এই নিবন্ধ লিখতে পারতাম না। আমি মাঝে মধ্যে রংপুরের জনগণের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি– ক্ষমতায় থাকাকালে কেনো আমি রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিনি। সেখানেও একই কথা বলেছি– রাষ্ট্রপতি হিসেবে তখন আমি একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি অবিচার করতে পারিনি। সে সময় দেশের ৪টি বিভাগের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, ও চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো। খুলনা ছিলো বঞ্চিত। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বিভাগীয় শহর হিসেবে খুলনাতে বিশ্ববিদ্যালয় করা না হলে বিবেকের কাছে প্রতারণা করা হতো। যা আমি করতে পারিনি। বিজ্ঞ পাঠক সমাজের হয়তো জানা আছে যে, ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের স্পীকার থাকাকালে একবার ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময়টুকু দায়িত্ব পালনের মধ্যেই তিনি কুমিল্লায় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিলো তা বাতিল করে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করে রেখে যান। সেভাবেই চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কারা অভ্যন্তরে রহস্যজনকভাবে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। হয়তো কুমিল্লার জনগণের দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুকে লেগেছে। তখন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর নগরী হিসেবে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিলো। কিন্তু তা অন্য কোনো অঞ্চলকে বঞ্চিত করে করতে হবে কেনো। খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রংপুরের জনগণ আমার ন্যায় বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন দেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে সে ক্ষেত্রে রংপুরের দাবিই হবে অগ্রগণ্য। কারণ ভৌগোলিকভাবে রংপুর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। আমি রাজনৈতিকভাবে বিভাগীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই। প্রদেশ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমার সংস্কার প্রস্তাব। তবে বর্তমান ব্যবস্থায় রংপুরকে বিভাগীয় মর্যাদায় উন্নীত করা যায়। তাই আমার অঙ্গীকার আছে– যদি সুযোগ পাই তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

আজ খুলনা তথা দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের সামনে বড় মুখে বলতে পারি– যদি সময় পেতাম তাহলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের মতো রূপসা সেতুও অনেক আগেই নির্মাণ করে যেতে পারতাম। প্রশ্ন আসতে পারে, নয় বছরে পারিনি কেনো? এ ধরনের একটি সেতু নির্মাণ করতে প্রস্তুতিপর্বে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। আমার শাসনামলে যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের উদ্যোগসহ ৫০৮টি ছোট-বড় সেতু নির্মাণ করেছি। এর পাশাপাশি রূপসা সেতু নির্মাণেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যে অর্থ ব্যয়ে রূপসা সেতু নির্মিত হয়েছে, ওই পরিমাণ অর্থের মাধ্যমেই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সেতু নির্মাণ সম্ভব ছিলো। এ ব্যাপারে রাশিয়ার জরিপকারী দল তাদের রিপোর্ট পেশ করেছিলো। রূপসা সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করার জন্য আমার মন্ত্রী সুনীল গুপ্তকে মস্কোতে পাঠিয়েছিলাম। সে সময় মস্কো সরকারের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপসা সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে বাংলাদেশ-রাশিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। আজো স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে খুলনাবাসীর স্বপ্নের রূপসা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে আমার গৃহীত পদক্ষেপের কথা।

১৯৮৯ সালের ৯ মার্চ খুলনার সার্কিট হাউজ ময়দানে আমার জনসভা ছিলো। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে খুলনার জনগণ সেই জনসভায় সমবেত হয়েছিলো। জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিলো খুলনার ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ ময়দান। সেদিন খুলনাবাসীর প্রাণের দাবি রূপসা সেতু নির্মাণের ঘোষণাটি ছিলো তাদের প্রত্যাশা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েক কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণের কথাটি জানানোর জন্য আমিও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। এর আগে রূপসা সেতু নির্মাণের সকল সম্ভাব্যতা আমি যাচাই করে নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে ১৯৮৫ সালের ১৩ এপ্রিল রাশিয়ান সরকারের সাথে আমাদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাদের একটি জরিপকারী দল রূপসা সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে

www.pathagar.com

এবং এই সেতু নির্মাণের ব্যয় নির্ধারণ করে। রাশিয়ান জরিপকারী দলটি ১৯৮৬ সালের ১৭ এপ্রিল আমার কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ওই রিপোর্টে তিন ভাবে সেতু নির্মাণের তিনটি ব্যয়ভারের প্রস্তাব দেয়া হয়। ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিলো একভাবে ৫৫০ কোটি, একভাবে ৫৩৯ কোটি এবং রেল যোগাযোগসহ একভাবে ৬১৯ কোটি টাকা। এই রিপোর্ট বিবেচনা করে ১৯৮৮ সালের ২৭ জানুয়ারি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে রূপসা সেতু নির্মাণের পক্ষে মন্তব্য সম্বলিত সুপারিশ পেশ করা হয়। এরপর আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আমার সরকার রূপসা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঘোষণাটি দেয়ার জন্যই আমি খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আজো মনে পড়ে সেই জনসভার কথা। যখন বলেছিলাম রূপসা নদীর ওপর সেতু নির্মিত হবে– তখন লাখো জনতার হর্ষধ্বনি-আনন্দ-উচ্ছ্বাসের উচ্চারণ রণদামামার মতো খুলনাকে প্রকম্পিত করে তুলেছিলো। দেখেছি মানুষের আনন্দ– সে স্মৃতি আজো আমাকে সুরের মূর্ছনার মতো মোহাবিষ্ট করে রাখে।

তারপর রূপসা সেতু নির্মাণের প্রস্তুতিপর্বে আরো কিছুটা সময় ব্যয় হয়। সেতুটি নির্মাণের লক্ষ্যে সংসদে বিল পাসের জন্য উত্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালের ১৯ জুলাই আমার দলের সংসদ সদস্য খুলনা-৪ থেকে নির্বাচিত মোক্তার হোসেন প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করেন। এটা ছিলো বাংলাদেশের চতুর্থ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের ২৭তম বৈঠক। সংসদ বিতর্ক ষষ্ঠ খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠা থেকে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। ডেপুটি স্পীকার রিয়াজউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ওই বৈঠকে খুলনায় রূপসা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিলো। সংসদে যে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পাস হয়েছিলো তাতে রূপসা সেতুর সাথে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সেতু নির্মাণের প্রস্তাব পাস হয়েছিলো। সংসদে রূপসা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আমরা যখন সেতু নির্মাণ করার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিলাম, সে সময়ে বিরোধী দল তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। তারপর ৪ মাস ব্যবধানে আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেই। ফলে খুলনাবাসীর স্বপ্নের সেতুর বাস্তব রূপ পেতে প্রায় পনের বছর সময় পার হয়ে যায়।

রূপসা সেতু কোনো আকস্মিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নয়। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। তবে এই ফসল পেতে যে সময় লাগার কথা ছিলো, লেগেছে তারচেয়ে ঢের বেশি সময়। কথা ছিলো সেতুতে রেলের সংযোগ থাকবে। তা হলো না। ফলে মংলা বন্দরকে যতোটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার কথা ছিলো, তা কিছুটা হলেও ম্লান হলো। এই সেতু শুধু একটি অঞ্চলের স্বার্থেই নির্মিত হয়নি। এর সাথে জড়িয়ে আছে গোটা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থ। এই সেতুর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল সরাসরি উপকার পাবে। বিশেষ করে মংলা বন্দরের জন্য এই সেতুর প্রয়োজনীয়তা আমি দারুণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তবে একটি বন্দর রেললাইন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হয়

www.pathagar.com

না। সেই দিক থেকে রেল যোগাযোগবিহীন সেতু নির্মিত হওয়ায় মংলা বন্দর অপূর্ণই থেকে গেলো। অবশ্য মংলা তো এখন প্রায় বিরাণবন্দর! তাই আমার দুঃখ হয়। এই দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে আমার রয়েছে আত্মার সম্পর্ক– হৃদয়ের গভীর অনুভূতি। দেশের সাফল্য দেখলে আনন্দে উদ্বেলিত হই– ব্যর্থতায় ব্যথিত হই। খুলনাকে ঘিরে রয়েছে আমার অনেক স্মৃতি। যেদিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম, সেদিনের জনসভায় দেখেছিলাম আমার দেখা সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ। ওইদিনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম– খুলনাবাসীর আর একটি প্রাণের দাবি রূপসা সেতু আমি নির্মাণ করবো। সময় আমাকে সে সুযোগ দেয়নি। তবে উদ্যোগ আমি গ্রহণ করেছি। আজ তা বাস্তবায়িত হয়েছে– এটাই আমার সুখ– আমার আনন্দ।

www.pathagar.com

পল্টনের মহাসমাবেশে যা বলেছি

আমি যতটা ভাবি ততটা লিখি না। কারণ সময়ের অভাব। তাই লেখার বিষয় মাথায় জমা থাকলেও লেখা হয় না। সার্বক্ষণিক রাজনীতিক হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেই ডুবে থাকতে হয়। আবার আমি কোনো নিয়মিত লেখকও নই। মাঝে মধ্যে যেটুকু লিখি তার সবাই আমার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। এর বাইরে আপাতত যেতেও চাই না। সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গে আমার একটি রাজনৈতিক সফর ছিলো। সেই সফরের সফলতার বাইরেও একটা চমৎকার অনুভূতি ভেতরে ভেতরে কাজ করেছে। জোছনা রাতে নৌ-যাত্রার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে– মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে 'দুরন্ত প্রত্যয়' শিরোনামের একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি দৈনিক ইনকিলাবের একুশের ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তার আট দিন পর ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জাতীয় পার্টির মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসমাবেশকে সামনে রেখে আমি বেশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। মহাসমাবেশের ডাকে কী রকম সাড়া পাবো– সারা দেশ থেকে কত লোক আসবে এবং যারা আসবে তাদের কাছে আমার বার্তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে তা নিয়ে কিছুটা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু পয়লা মার্চ- ২০০৬ তারিখে পল্টনে আমার আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্বাধীন একটি জোটের মহাসমাবেশ, অতঃপর সরকারি দল এবং তারপর সরকারি জোটের আর একটি শরিক দলের মহাসমাবেশের পর জাতীয় পার্টির মহাসমাবেশটি ছিলো বর্তমান রাজনৈতিক ধারা-প্রবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দেশের মানুষের কাছে আমরা কতটা আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছি– তার বার্তা পেয়েছি পল্টনের মহাসমাবেশ থেকে। এটা ছিলো আমার বিরোধী রাজনৈতিক অঙ্গনে সর্বাধিক সাফল্যের কর্মসূচি। এখানে জনতার সাথে আমি একাত্ম হতে পেরেছি। জনতাও আমার সাথে একাত্ম হয়েছে। আমি রাজনীতি করি জনগণের স্বার্থে। কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। জনগণ আমার কাছে যা প্রত্যাশা করে– আমার রাজনীতিতে যদি তার প্রতিফলন না ঘটে– তাহলে সেই রাজনীতি মূল্যহীন। পরিণত বয়সে আমি মূল্যহীন রাজনীতি করতে পারি না।

www.pathagar.com

আমি একান্তভাবে লক্ষ্য করেছি– আমার বক্তব্যে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। মহাসমাবেশে কোনো ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে আমার সামনে তিনটি পথ খোলা ছিলো। আমি গত তিন মাস ধরে সেই তিন পথ নিয়ে গভীর চিন্তা করেছি। জনগণের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেছি। কয়েকটা জেলায় সফরও করেছি। তারপর মহাসমাবেশে যখন আমার বেছে নেয়া পথের ঘোষণা দিলাম- তখন সত্যিকার অর্থে 'জনতার সাগরে জেগেছে উর্মী' বলতে যা বুঝায় তাই ঘটলো। আমার হৃদয় ভরে গেলো। ভবিষ্যতে ভাগ্যে কী ঘটবে কী ঘটবে না– সে চিন্তা আমার মন থেকে চিরতরে মুছে গেলো। নিজেকে তখন সার্থক মনে করেছি– জনগণের মনের কথা বলতে পেরেছিলাম বলে। তিনটি মহাসমাবেশকে ছাপিয়ে আমার মহাসমাবেশ জনারণ্যে পরিণত হয়েছে– মানুষ আমার বার্তা গ্রহণ করেছে– মানুষের মনোভাব আমি জানতে পেরেছি– এই বহুমুখী অর্জন আমাকে রাজনীতিতে সফল করে তুলেছে।

আমি তো সর্বদাই কিছু না কিছু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হই। আমার রাজনীতির মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও বিভ্রান্তিকর প্রচারের জটাজালে আমাকে আটকানোর একটা প্রবণতা আছেই। মহাসমাবেশের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরও একটি পত্রিকায় আমার মন বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার ঘোষণায় জনতার প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটলেও হয়তো দুই পক্ষই খুশি হতে পারেনি। একটা ধারণা আছে যে– বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমি সরকারি বা বিরোধী জোটের যে পক্ষই অবলম্বন করবো সেই পক্ষের ক্ষমতায় থাকা বা যাওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু সেই প্রত্যাশার যদি ব্যাঘাত ঘটে– তাহলে উভয় পক্ষেরই আমার উপর ক্ষুব্ধ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমি জনতার কাতারই বেছে নিয়েছি। এখানে যদি স্বার্থের রাজনীতির কাছে হেরেও যাই– তথাপিও আমার সান্ত্বনা থাকবে– জনগণের মনোজগত আমি জয় করেছি। আমি আগেও বলেছি এখানো বলছি– কারো ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা আমার রাজনীতির আদর্শ নয়। 'আমার দেশ' পত্রিকা লিখেছে– 'আমার ঘোষণায় নাকি জাপার মধ্যকার বিএনপিপন্থী অংশটি হতাশ হয়েছে।' এই লেখায় আরো কিছুটা বিভ্রান্ত করা হয়েছে যে, আমি নাকি বিএনপি'র তীব্র সমালোচনা করেছি। আরো বলা হয়েছে– আমার বক্তব্যের মধ্যে নাকি বিরোধী জোটের প্রতিই কিছুটা ঝুঁকে পড়ার ইঙ্গিত আছে। এসব ধারণা বা কল্পনা-আশ্রিত মন্তব্য সম্পর্কে কোনো ধরনের অভিমত প্রকাশের কিছু নেই। যেহেতু আমি পল্টনে সুস্পষ্টভাবে আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছি। হয়তো আমার পুরো বক্তব্য সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছেনি। তাই পল্টনে যা বলেছি– সে কথা জনগণের কাছে আবার তুলে ধরতে চাই। সে উদ্দেশ্যেই এই ভূমিকার অবতারণা করেছি।

সেদিন পল্টনে আমি যা বলেছি : ঐতিহাসিক পল্টনের মহাসমাবেশে মানুষের বাঁধ ভাঙা জোয়ার দেখে আমার হৃদয় এক দিক আনন্দে কানায় কানায় ভরে ওঠে– আবার আরেক দিক বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কেনো এই

www.pathagar.com

অনুভূতি সে কথাই আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাকে বলা হয়েছে স্বৈরাচারী, গণআন্দোলনের মুখে নাকি আমি পদত্যাগ করেছি। আমি স্বৈরাচারী হলে আমার ডাকে এক জনসমুদ্রের সৃষ্টি হতো না। জনতা প্রমাণ করেছে, আমি স্বৈরাচারী নই– আমি তাদের প্রাণের একান্ত ভালোবাসার মানুষ। তাই আমার হৃদয় আজ আনন্দে নেচে ওঠে। মুসলিম শরিফের হাদিসে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যদি কেউ কাউকে ভিত্তিহীন গালি দেয়, আর সে তার উপযুক্ত না হয়, তাহলে সে গালি তার উপরই ফিরে আসে। আল্লাহর ইশারা ছাড়া নবী কোনো কথা বলেন না। তাই রাসূলের কথা চিরসত্য প্রমাণিত হয়েছে। একদিন যারা আমাকে স্বৈরাচার বলে গালি দিয়েছিলো, আজ তারাই একে অপরকে স্বৈরাচার বলছে।

আবার ভারাক্রান্ত কেনো হই? গণতন্ত্র আর জনগণের শান্তির আশায় স্বেচ্ছায় আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিলাম। আজ দুঃখ হয়– যে জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে শান্তির জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দিলাম– সেই জনগণ এখন সীমাহীন দুঃখের অকূল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদের দুর্দশার ছবি এই জনতার মুখে আমি দেখতে পাই। তাই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি আরো শোকাহত যে, গত কয়েক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দু'টি গার্মেন্টস দুর্ঘটনায় শতাধিক শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। আমি তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা, তাদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানাই।

আমি যখন মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছি– তখন বলেছিলাম, জাতীয় নির্বাচনের আর মাত্র এক বছর বাকি। গত নির্বাচন থেকে দেশে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করার একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে। তাই আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কোনো দল বা জোটের সাথে জোটগতভাবে নির্বাচন করবে নাকি এককভাবে নির্বাচন করবে সে ব্যাপারে আমি মহাসমাবেশে ঘোষণা করবো। আমি বলেছিলাম– শুধু ক্ষমতায় যাবার জন্যই জোটে যাওয়া নয়, জোট হতে পারে জনগণের স্বার্থে প্রণীত কর্মসূচির ভিত্তিতে। তার জন্য আমরা সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে– এমন ১২ দফা কর্মসূচি পেশ করেছি। আমি বলেছি এই কর্মসূচি যারা মেনে নেবেন– এবং যাদের কর্মসূচি আমরাও গ্রহণ করতে পারবো কেবল তাদের সাথেই আমরা জোট গঠন করতে পারি। আজ সে ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার সময় এসেছে। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক পালাবদল হয়েছে। তাই আমার সেই ঘোষণা দেয়ার আগে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং রাজনীতির অবস্থা সম্পর্কে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই।

দেশ আজ বিভিন্ন ধরনের সংকটে নিমজ্জিত। বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনো দেশে এত সংকট একসাথে আসেনি। ডিজেল, সার, বিদ্যুৎ সংকটের ফলে দেশ অচল হয়ে পড়েছে। মানুষ এখন দিশেহারা। বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রকট হয়ে

www.pathagar.com

দেখা দিয়েছে। প্রায় সময় অন্ধকারে ডুবে থাকতে হয়। বিদ্যুতের জন্য কানসাটে ২০ জন সাধারণ মানুষ জীবন দেয়ার পরও বিদ্যুৎ সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। গত চার বছরে বিদ্যুৎ খাতে সরকারের একমাত্র সাফল্য– টঙ্গীর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও বন্ধ হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন ঢাকাসহ সারা দেশে চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং। এসএসসি পরীক্ষার সামনে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ছাত্র-ছাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এক মন্ত্রী বললেন, তিনি ১১শ' কিলোমিটার ভ্রমণ করে এসেছেন কিন্তু কোথাও ডিজেল সংকট দেখেননি। অথচ ডিজেলের অভাবে ট্রেন চলে না, সেচ বন্ধ-কৃষি কাজ চলে না। অর্থমন্ত্রী বললেন– বিশ্বে তেলের দাম বেড়েছে। তাই ডিজেলের দাম বাড়াতে হবে। মন্ত্রীর কথা শোনার পর বাজার থেকে ডিজেল উধাও হয়ে গেলো। সেই তেল নিয়ে সংকট এখনো কাটেনি– সংকট কাটার লক্ষণও দেখা যায় না। ফলে আসন্ন মৌসুমে চাষাবাদ দারুণভাবে ব্যাহত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। যে দেশে তেলের অভাবে এক দিনে ১৬টি রুটে রেল চলাচল বন্ধ থাকে– এর চেয়ে ব্যর্থতার আর কী উদাহরণ থাকতে পারে।

তেল-বিদ্যুতের মতো আরো একটি বড় সংকট হচ্ছে সার। কৃষকরা সারের জন্য দিনের পর দিন ধরনা দিচ্ছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে। কিন্তু সার মিলছে না। অথচ শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে কোনো সার সংকট নেই– এই সংকট মিডিয়ার সৃষ্টি। কৃষকরা সার না পেয়ে দল বেঁধে আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছে। তারা বলছে সার না দিলে বিষ দেন। অথচ সরকারপ্রধানকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। আমার মনে হয় দেশের প্রকৃত অবস্থা তাকে অবহিত করা হয় না। ডিজেলের অভাবে যদি আগামীকাল ট্রেন চলতে না পারে তাহলে সেটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অজানা থাকার কথা নয়। কৃষকের চাহিদা মতো সার সরবরাহ করা যাবে কিনা তাও মন্ত্রণালয়ের না জানার কথা নয়। কিন্তু এসব বিষয় সরকারপ্রধানকে অবহিত করা হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। মন্ত্রী বলেছেন, তাদের নাকি ২ গোডাউন সার মজুদ আছে। দেশের ৮০ ভাগই যেখানে কৃষক সেখানে ২ গোডাউন সার কতটুকু চাহিদা মেটাতে পারে।

বিমান একটি দেশের গৌরবের প্রতীক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন জাতীয় পতাকাবাহী বিমান পৌঁছে, তখন সেখানে বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হয়। অথচ সেই বিমান এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এসব সমস্যা নিয়ে দেশের সংসদ দিতে পারছে না কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা কোনো সংকটের সমাধান। কীভাবে সংসদ কার্যকর হবে? যে সংসদে কথা বলতে না পারার উসিলায় একটানা সোয়া বছর প্রধান বিরোধী দল সংসদের বাইরে কাটায়, আবার সরকারি দলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যখন সংসদে প্রায় প্রতিদিন কোরাম সংকট হয়– সেই সংসদ দেশ ও জাতির সমস্যার কী সমাধান দেবে? দেশের এই দুর্দশা দেখে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এবার কিছু পেছনের কথা বলি : আমার শাসনামলে বিরোধী দল আমাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনে আসার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো। আমি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। সাংবিধানিক পন্থায় তিন জোটের মনোনীত প্রার্থী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে আমি উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে তার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তিন জোট কথা রাখেনি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন প্রতিশ্রুতি ভেঙে আমার প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার করেছেন। আমি বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছিলাম– আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো। টঙ্গী থেকে আমার প্রচার অভিযান শুরু হবে। এটাই ছিলো আমার অপরাধ। তাই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার বাতিল করা বিশেষ ক্ষমতা আইনে অবৈধভাবে আমাকে গ্রেফতার করলেন। আমার মন্ত্রীদের গ্রেফতার করা হলো– তাদের নামে হুলিয়া জারি করা হলো। সকল দল সব ধরনের নির্বাচনী সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নির্বাচন করলেও বঞ্চিত হলো জাতীয় পার্টি। তারপরও আমার দল চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নির্বাচন করে ৩৫টি আসনে জয়লাভ করলো। আমি জেলে থেকে নির্বাচন করে ৫টি আসনে জয়লাভ করলাম, একবার নয় দু'বার। আমার দলের উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল মন্ত্রী কারাগারে থেকে অথবা হুলিয়া মাথায় নিয়ে জয়লাভ করলেন। জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে আমরা স্বৈরাচারী ছিলাম না। তাহলে আমিসহ আমার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা নির্বাচনে জয়লাভ করতেন না।

তারপর আমি যাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে না পারি তার জন্য সংবিধানও পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি আমি কায়েম করিনি। এটা প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এই পদ্ধতি ধারণ করেছেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি পেয়েছিলাম। যারা সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন– তারা কি এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে পেরেছেন? ব্যক্তিবিশেষের কারণে যারা সংবিধান কাটাছেঁড়া করেন তারা সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দাবি করতে পারেন না। এক ব্যক্তির ৬ মাসের চাকরির জন্যও সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

আপনারা জানেন– বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সন্ত্রাসের যে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়েছিলো, বর্তমান সরকারের আমলে তা ডালপালা ছেড়েছে। বিগত সরকারের আমলে শুনেছি– মাটির নিচ থেকে হলেও সন্ত্রাসীদের ধরে আনা হবে। কিন্তু মাটির নিচে কোনো সন্ত্রাসী পাওয়া যায়নি। সন্ত্রাসীদের দেখা যেতো মন্ত্রীদের ড্রইংরুমে। বর্তমান সরকারের আমলে সেই সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারণ করলে অপারেশন ক্লিনহার্ট পরিচালনা করতে হয়। এতে সন্ত্রাস দমন হলেও এক সময় আবার তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব গঠন করতে হয়। র‍্যাবের তৎপরতা সফল হয়েছে– এটাই বর্তমান সরকারের একটি বড় অর্জন। তাই আমি র‍্যাবকে ধন্যবাদ জানাই।

www.pathagar.com

আবার র‍্যাবের তৎপরতার মধ্যেই আকস্মিকভাবে জঙ্গিদের আত্মঘাতী তৎপরতা শুরু হয়। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো জঙ্গি তৎপরতার কারণে। সে সময় ঢালাওভাবে দোষ দেয়া হয়েছিলো মাদ্রাসার ওপর। আমি বলেছিলাম, যেখানে হতদরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে– যারা দু'বেলা ঠিক মতো খেতেও পায় না, মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান চলে সেই মাদ্রাসাকে ঢালাওভাবে দোষ দেবেন না। আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে, কোনো মাদ্রাসা জঙ্গি সন্ত্রাসের সাথে জড়িত।

এখন দেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে কিন্তু মানুষের আয় বাড়েনি। প্রত্যেকটি পণ্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। দেশের শিল্প-কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখো লাখো শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে গেছে। বর্তমানে দেশের ৪ কোটি যুবকের মধ্যে ৩ কোটি বেকার। তার মধ্যে ৪৫ ভাগই নিরক্ষর। প্রতি বছর ২৭ লাখ শিক্ষিত যুবক শ্রম বাজারে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকে। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। বেকারত্বের কারণে তারা হতাশায় ভুগে বিপথগামী হয়ে পড়ে।

এবার বিরোধী রাজনীতির কথা বলি : প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানিয়েছে। তা না হলে তারা নির্বাচনে যাবে না বলে ঘোষণা করেছে। সরকার বলে দিয়েছে– তারা ওই দাবি মানবে না। ফলে আগামী নির্বাচন নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। আওয়ামী লীগ সরকারে থেকে যতটা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে– বিরোধী দলে এসে আরো ব্যর্থ হয়েছে। তারা সরকার পতনের জন্য ট্রাম্পকার্ড দেখানোর জন্য ৩০ এপ্রিলের একটা ডেডলাইন দিয়েছিলো। দেশ ও জনগণের স্বার্থে তারা কোনো কর্মসূচি দিতে পারেনি। লক্ষ্য ছিলো একটাই– সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে। তার জন্য একের পর এক ব্যর্থ আন্দোলন করেছে। জনসমর্থনহীন হরতাল ডেকেছে। মানুষের মধ্যে কোনো আবেদন তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। নিজ দলের নেতাকর্মীদের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা আওয়ামী লীগ। অথচ তারা কখনোই সংসদকে কার্যকর করতে ভূমিকা পালন করেনি। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রথম সংসদ তারা বর্জন করেছে। তখন একদলীয়ভাবে বিএনপি সংসদ চালিয়েছে। তারপর আওয়ামী সরকারের আমলেও অধিকাংশ সময় প্রধান বিরোধী দল সংসদে থাকেনি। আওয়ামী লীগ একদলীয়ভাবে সংসদ চালিয়েছে। বর্তমান বিএনপি সরকারের আমলে প্রধান বিরোধী দলকে কথা বলতে না দেয়ার অজুহাত এনে তারা সংসদ বর্জন শুরু করে। কিন্তু বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, বিদেশ ভ্রমণ সবই উপভোগ করতে থাকেন। সংসদ সদস্য পদ যখন চলে যাবার উপক্রম হয়– তখন তারা আবার সংসদে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ দেশ ও জনগণের জন্য সংসদে কথা বলা বা সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন তাদের মুখ্য বিষয়

www.pathagar.com

নয়। নিজেদের স্বার্থ রক্ষাই বড় কথা। গত ৪ বছর ধরে আওয়ামী লীগ শুধু সরকার পতনের আন্দোলনই করলো। শেষ পর্যন্ত তারা দুই মাসের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করলো। চূড়ান্ত কর্মসূচি ছিলো ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ। জাতি মনে করলো না জানি কী ঘটে বসে লংমার্চ ঢাকায় পৌঁছে গেলে। পত্র-পত্রিকায় বিশাল বিশাল শিরোনাম হয়েছে–"লংমার্চ ধেয়ে আসছে রাজধানীর দিকে।" কিন্তু আমরা কী দেখলাম– সেই ধেয়ে আসা লংমার্চ ঢাকায় এসে ঘোষণা করলো– "আমরা সংসদে যাবো।" লংমার্চের ফলাফল নিয়ে একজন কলামিস্ট লিখেছেন– পর্বতের মূষিক প্রসব হয়েছে। দেড় বছর পর যদি বুঝে থাকেন যে, সংসদে যেতে হবে, যাওয়া উচিত– তাহলে এতদিন সংসদে গিয়ে জনগণের জন্য কথা না বলার জন্য কি জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত ছিলো না? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে কী করেছে সে কথাও এদেশের জনগণ ভুলে যায়নি। বর্তমান সরকারের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি–ধর্ষণ, লুটপাট, দলীয়করণ, দুর্নীতি তখনও সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিলো। পুলিশের প্রধান কাজ ছিলো বিরোধী দল দমন।

মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। তারা স্মরণ করে জাতীয় পার্টির শাসনামলের কথা। আমার তো রাজনীতিতে আসার কথা ছিল না– ইচ্ছাও ছিলো না। ক্ষমতা গ্রহণের ২ বছরে দেশে সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে আমি ১৯৮৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। তখন আমার কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। সেই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করলে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আমি আবার ব্যারাকে ফিরে যেতাম। কিন্তু সেদিন রাজনৈতিক দলগুলোর অদূরদর্শিতার কারণে আমাকে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয়। সেই পার্টি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত-সুখ-দুঃখের পথ পাড়ি দিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জাতীয় পার্টির শাসনামলের ইতিহাস উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সু-সংস্কারের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় নিয়ে রচিত। ১৫ বছর পরও আমরা দেখাতে পারি আমাদের উন্নয়নের দৃশ্য। প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে নতুন জেলা উপজেলা প্রবর্তনের ফলে এদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষ প্রথমবারের মতো উন্নয়ন-সমৃদ্ধি উপলব্ধি করতে শুরু করে। ভূমি সংস্কার, খাস জমি বিতরণ, গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা, যুগান্তকারী ওষুধনীতি, কৃষি ব্যবস্থার সংস্কারের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আমার ৯ বছরের শাসনামলে সারাদেশে ১০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছে। ১৫ হাজার ছোট বড় সেতু-কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। কৃষি-শিক্ষা-ধর্ম-মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, কূটনীতিসহ এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে আমার উন্নয়ন-সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগেনি। আমি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছি, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেছি, রেডিও-টিভিতে আজান প্রচারের ব্যবস্থা করেছি। অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার করেছি, মসজিদ-মন্দিরসহ সকল উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল মওকুফ করেছি। আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন করেছি,

www.pathagar.com

সারা দেশে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছি। ইসলামের সেবায় এত কিছু কাজ করলেও আমার সময়ে দেশকে কেউ মৌলবাদী দেশ বলতে পারেনি। আমার সময়ে দেশে সন্ত্রাস-জঙ্গি তৎপরতা ছিলো না। র‍্যাব-চিতা-কোবরা গঠন করতে হয়নি। অপারেশন ক্লিন হার্টের প্রয়োজন হয়নি। আমার সময় দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়নি। আমার সময়ে বাংলাদেশ কালো তালিকায় ওঠেনি। আমার সময়ে দেশ ব্যর্থ–অকার্যকর রাষ্ট্রের প্রক্রিয়ায় যায়নি। আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি ১৫ বছর আগে। মাত্র এই সময়ের মধ্যে জাতির ললাটে এতগুলো কলঙ্কের তিলক অঙ্কিত হয়েছে। আমরা ৯ বছরে দেশের যত উন্নয়ন করেছি– স্বাধীনতার বাকি সময়ে সব সরকার মিলে তা করতে পারেনি। তারপরও আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। আমার শাসনামলের পুরো একটি বছরের সময় বিরোধী দল হরতাল করেছে। তারপরও জাতীয় পার্টির উন্নয়নের গতি স্তব্ধ করতে পারেনি। রাজনীতির জন্য আমাকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে– যে নির্যাতন, অবিচার সহ্য করতে হয়েছে– এদেশের আর কোনো রাজনীতিকের জীবনে তা আসেনি। একনাগাড়ে ৬টা বছর কারাগারে দুঃসহ জীবনযাপন করতে হয়েছে। সাড়ে তিন বছর আমাকে কারো সাথে কথা বলতে দেয়া হয়নি। ১২টা ঈদ চলে গেছে জামাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারিনি। ৬টা রমজানে সেহেরী খেয়ে রোজা রাখতে পারিনি। আমার তো বাঁচার কথা ছিল না। আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছিলাম। বিলোরুবিন ২৯ পর্যন্ত উঠেছিলো। অথচ কোনো রোগীর বিলোরুবিন ১৮ হলেই তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আমি বেঁচে রয়েছি অলৌকিকভাবে। আপনাদের দোয়ায় আমি নতুন জীবন লাভ করেছি।

আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। তবে দেশের জনগণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে যে– বিগত ১৫ বছর যে দু'টি দল রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তারা দেশের উন্নয়ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের পক্ষে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং সমাজের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব নয়। গত তিন মাসে আমি দেশের যেখানেই গেছি– সেখানেই রব উঠেছে, দুই দলকে আর চাই না। তারা পরিবর্তন চায়। বিকল্প শক্তির উত্থান দেখতে চায়। একমাত্র জাতীয় পার্টিই হতে পারে সেই বিকল্প শক্তি। দেশবাসী তিনটি দলের রাষ্ট্র পরিচালনা বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। এবার জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে তারা বিকল্প শক্তির উত্থান ঘটাতে চায়। আমরা কোনো পক্ষের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাই আমরা কোনো জোটে যাবার কথা ভাবছি না। এককভাবেই ৩০০ আসনেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। তবে সময়ের দাবিতে ন্যূনতম কর্মসূচিতে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের সমঝোতায় জোট গঠন করতে পারি। সারা বিশ্বের প্রতিপালক যে মহান আল্লাহ পাক, মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের স্রষ্টা– সেই মহান স্রষ্টার

www.pathagar.com

উপর ভরসা করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের আপামর জনগণকে সাথে নিয়ে আমি এগিয়ে যাবো। জনগণের সাথেই হবে আমার মহাজোট। আমি জনগণের উদ্দেশে বলেছি, আপনারা যার যার এলাকায় ফিরে যাবেন। গড়ে তুলুন দেশজুড়ে জাতীয় পার্টির দুর্ভেদ্য দুর্গ। মনে রাখবেন– পার্টির অস্তিত্ব রক্ষায় এটাই হবে শেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের জিততেই হবে। আমরা যদি আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতীক লাঙ্গলের পক্ষে জোয়ার সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে এদেশের মানুষের মুখে আবার হাসি ফোটাতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমরা যদি ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে দেশ ও জাতির স্বার্থে যে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবো– এখন তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। মহাসমাবেশে আমি যে সব কর্মসূচি ঘোষণা করেছি, সেগুলো হলো : এক. উপজেলা আদালত ও পারিবারিক আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা চালু করা হবে। স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে এবং নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের কাছে উপজেলার ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। দুই. প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। তিন. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেয়া হবে। চার. নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেয়া হবে এবং সন্ত্রাস, অস্ত্র ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করা হবে। পাঁচ. ধর্মীয় মূল্যবোধ সবার ঊর্ধ্বে স্থান পাবে। মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল মওকুফ করা হবে। ছয়. কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে সার, ডিজেল, কীটনাশক সরবরাহ করা হবে এবং কৃষি উপকরণের কর শুল্ক মওকুফ করা হবে। কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো সার্টিফিকেট মামলা থাকবে না। সহজ শর্তে কৃষি ঋণ সরবরাহ করা হবে। সাত. দেশের পাট শিল্পের গৌরব ফিরিয়ে আনতে আধুনিকভাবে আদমজীর মতো জুট মিল প্রতিষ্ঠাসহ বন্ধ শিল্প কারখানা চালু করা হবে। প্রত্যেক উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তোলাসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা হবে। আট. সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দমনে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে। নয়. উত্তরবঙ্গসহ দেশের সর্বত্র পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সারা দেশে সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। দশ. গুচ্ছগ্রাম, পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এগার. পল্লী রেশনিং চালু করা হবে। বার. উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মঙ্গা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া হবে। তের. বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। সর্বশেষ মূল বেতনের সমান পেনশন দেয়া হবে। চৌদ্দ. বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ৯০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগে উন্নীত করা হবে। পনের. সুলভ মূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন সরকারি শিক্ষকদের সমতুল্য করা হবে। ষোল. স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে।

www.pathagar.com

এই ষোল দফা কর্মসূচির প্রতি যদি আপনাদের সম্মতি থাকে তাহলে আমাকে সমর্থন জানাবেন। আমি কল্পনাবিলাসী রাজনীতিবিদ নই। দেশ পরিচালনায় আমার অভিজ্ঞতা আছে। দেশ ও জাতির জন্য যা করতে পারবো, বাস্তবতার ভিত্তিতে আমি ন্যূনতম সেই কর্মসূচি প্রণয়ন করেছি। দেশের নারী সমাজের কল্যাণে এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে আমি সুচিন্তিত কর্মসূচি গ্রহণসহ আরো জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপের কথা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পেশ করবো। আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। আপনারা জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা জনগণের দ্বারে দ্বারে যাবেন। তাদের কাছে ভোট প্রার্থনা করবেন। জাতীয় পার্টির হতাশার দিন কেটে গেছে। আগামী নির্বাচনে আমরা অবশ্যই ইতিহাস গড়তে পারবো।

এদেশের নির্বাচনের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের কাছে শেরেবাংলার মতো নেতার দলের ভরাডুবি হয়েছে। আবার ১৯৫৪ সালে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়েছে। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার কাছে সব দল ম্লান হয়ে গেছে। আবার ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর ১৯৭৯-এর নির্বাচনে সেই আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৩৯ আসন লাভ করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির কোনো সাংগঠনিক ভিত ছিলো না। তখন বিএনপির দলীয় অবস্থা এখনকার জাতীয় পার্টির চেয়েও খারাপ ছিলো। তাই আওয়ামী লীগের নেত্রী বলেছিলেন, নির্বাচনে বিএনপি ১০টি আসনও পাবে না। কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সেই বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে যে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের সাফল্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলো– ২০০১ সালে তাদেরই পতন হয়েছে। এই সব ইতিহাসের স্রষ্টা এদেশেরই জনগণ। তাই আগামী ২০০৭ সালের নির্বাচনে আর একটি বিরল ইতিহাস গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আপনারা যে যার অবস্থানে থেকে জাতীয় পার্টির জন্য কাজ করে যাবেন।

প্রিয় দেশবাসী, কাজ করতে গেলে মানুষ মাত্রেই ভুল-ত্রুটি হতে পারে। আমিও তার ঊর্ধ্বে নই। ভুল-ত্রুটি আমারও হয়তো হয়েছে। যদি ইচ্ছার অজ্ঞাতে কোনো ভুল করে থাকি তার জন্য আমি এই মহাসমাবেশে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে– দেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আসুন দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে আসুন আমরা জীবনের বাজি ধরি– 'হয় করবো– নয়তো মরবো'। আপনারা আমাকে আর একটিবার সুযোগ দিন। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আমার আর চাওয়া পাওয়ার কিছু বাকি নেই। যত দিন বাকি তত দিন দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশ ও জাতির সেবা করে যেতে চাই। আর একবার চেষ্টা করে দেখি এই বিপর্যস্ত দেশকে রক্ষা করে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি

www.pathagar.com

কিনা– সেই সুযোগ প্রার্থনা করে মহাসমাবেশ সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমার বিরোধী রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে সফল ও সুশৃংখল এই কর্মসূচি আমাকে শুধু উৎসাহই জোগায়নি– আমি পেয়েছি নতুন দিক-নির্দেশনা। আমি যেনো জনতার কাতারে এক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সেই বক্তব্য যারা শুনতে পাননি অথবা শোনার সুযোগ ছিলো না– আশা করি এই লেখাটি তাদের জন্য সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

আমার জীবনের বৈচিত্র্যময় ঈদ

ঈদ অর্থই যখন খুশি, তাই ঈদ নিয়ে কিছু লেখার মধ্যেও খুশির বিষয়টা মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কীভাবে সেই খুশির প্রকাশ ঘটানো যায়। কবি কায়কোবাদের উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক। ঈদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

"কুহেলির অন্ধকার সরাইয়া ধীরে ধীরে ধীরে
উঠেছে ঈদের রবি উদয় অচল গিরি শিরে
অই হের বিশ্বভূমে কি পবিত্র দৃশ্য সুমহান
প্রকৃত আনন্দময়ী চারিদিকে মঙ্গলের গান।"

পবিত্র ঈদ যখন সামনে সমাগত তখন মনের ভেতরে অজান্তেই মঙ্গলের গানের সুর বেজে ওঠে। ত্রিশদিন সিয়াম সাধনার পর যে দিনটি মুসলিম জাহানের সামনে হাজির হয়, সে দিনের মহিমা, অপার আনন্দ ও হৃদয়ের গভীর উদ্বেলতা বর্ণনায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তা শুধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। আবার সব উপলব্ধি ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। আত্মাকে শুদ্ধ করা এবং সংযমের শ্রেষ্ঠতম উপায় রোজা পালন। রোজার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তাকে লাভ করা যায়, স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় এবং কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছাকে নিবৃত্ত রাখা যায়। এই পবিত্রতার সিঁড়ি বেয়ে আসে ঈদ। সেই আনন্দেই বিশ্ব প্রকৃতিতে মঙ্গলের গান বেজে ওঠে। মানব সমাজ সেই সুরে মোহিত হয়।

ঈদ কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিষয় নয়। এটা সার্বজনীন। চন্দ্র-সূর্য, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ-বাতাস, নদী সমুদ্রের মতোই সার্বজনীন। ঈদের আনন্দ– সাগরে সবাই অবগাহন করতে পারে। আমিও পরিণত বয়সে এই আনন্দের ভাগ নিতে এতোটুকু ইতস্তত করি না। নিজেকে দেখতে পাই চঞ্চল কিশোরের মাঝে। সে যেনো আমারই প্রতিচ্ছবি। সত্যি-সত্যিই ঈদের দিনে আমি ফিরে যাই আমার দুরন্ত কৈশোরে– উদ্যম যৌবনে। ঈদকে উদযাপন করি আনন্দের মাঝে হৃদয়কে উজাড় করে। ঈদ মানেই তো আনন্দ। মনের আনন্দই দেহের শক্তির উৎস। তাই মহান আল্লাহতায়ালা ঈদের মধ্যে জীবন-শক্তির একটি বড় উপাদান রেখে দিয়েছেন। এই দিনটিতে হিংসা-বিদ্বেষ, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ, রাগ-অনুরাগ, দুঃখ-ক্ষোভ-বেদনা সবকিছু ভুলিয়ে মানুষকে জীবনানন্দে মাতিয়ে তুলতে শেখায়।

www.pathagar.com

এমন একটি মহিমাময় দিনকে সামনে রেখেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মনের মাঝে হতাশার গুবরে পোকা বিড়-বিড় করে ওঠে। প্রশ্ন জাগে– সবাই সবাইকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে পারবে তো? ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে পঙ্কিল রাজনীতি কালি ছিটাবে না তো? কোনো আতঙ্ক ঈদের আনন্দ সুরকে বেসুরা করে তুলবে না তো? ঈদের মিলন মাঙ্গলিক গান যদি আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সময় সকল স্তরে গাইতে পারতাম– সেই স্বপ্ন আমাকে সব সময় বিভোর করে রাখে। তাই প্রত্যাশায় থাকি এই দিনের। অপেক্ষায় থাকি এই দিন উদযাপনের। একে একে জীবন থেকে কতোটা বছর পার হয়ে গেলো। যুগের পর যুগ চলে গেলো। প্রায় পৌনে এক শতাব্দী অতিক্রম করলাম। নতুন আর একটি শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি। এতোটা দীর্ঘ সময় ঈদ উদযাপনে যেনো কখনো গতানুগতিকতার আবর্তে জড়িয়ে পড়িনি। প্রত্যেক বার যেনো জীবনে ঈদ এসেছে নতুন রূপে– নতুন বেশে।

আমার জীবনের বাঁকে বাঁকে পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তনের ধারায় ঈদকে বরণ করেছি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এখন যেহেতু রাজনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছি, নিজে সফল কি বিফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সে বিচারের ভার আমার হাতে নেই। তবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ততা আছে বলে তারা আমার ঈদ উদযাপনের খবর রাখে। পত্র-পত্রিকা থেকেও জানতে চায়– কোথায় ঈদ করবো, কোন ঈদগাহে নামাজ আদায় করবো। ঈদের দিনটিতে আমার সময় কীভাবে কাটবে। এসব জানার বা জানানোর খুব যে কোনো অর্থ আছে তা মনে করি না, তবে কারো মধ্যে আগ্রহ কিছুটা দেখা যায়। সে কারণেই এই লেখা।

একটু আগে বলেছি– আমার জীবনধারা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে ঈদ উদযাপন করেছি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে। যখন ছোট ছিলাম সেই সময়ের ঈদের আমেজ ছিলো অতুলনীয়। নতুন জামা পরে ঈদের ময়দানে যাবার সে আনন্দ জীবনে আর কখনো ফিরে পাবো না। তবে আজকের শিশু-কিশোরের মধ্যে যখন নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করি তখন সত্যিকারভাবে আমি ভুলে যাই আজ আর সেদিনের মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে। আজকের কিশোরকে মনে হয় যেনো আমার মনেরই আয়না। যার মধ্যে দেখি নিজেরই প্রতিচ্ছবি। তখন ঈদ উদযাপনের মধ্যে খুঁজে পাই আমার কৈশোরের সেই উচ্ছল আর উচ্ছ্বাসময় মুহূর্তগুলোকে। আবার নিজের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন হিসাব মেলাতে পারি না– কখন হারিয়ে গেলো জীবনের স্বর্ণালী দিনগুলো। প্রতিদিন ঈদের আনন্দ খুঁজি বলেই কী এতোগুলো ঈদের সাথে অজান্তে ফুরিয়ে গেলো সময়ের সিঁড়ি! এসব ভাবনাও মাঝে মাঝে কুরে-কুরে খায়। ভাবতেও এখন কেমন লাগে– এক সময় ঈদের আনন্দে মাঠময় ছুটে বেড়াতাম, বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করতাম, বয়োজ্যেষ্ঠদের সালাম করে উপহারের খুশিতে মেতে উঠতাম। স্বপ্ন জাগে– যদি আবার সেই দিন ফিরে আসতো!

www.pathagar.com

আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো কর্মজীবনে আমার ঈদ কেটেছে গতানুগতিকতায়। চাকরির কারণে অনেক ঈদ কর্মক্ষেত্রেই উদযাপন করেছি। সৈনিক ছিলাম। নিয়মের ছকে বাঁধা ছিলো আমাদের জীবন। সারাটা বছর অপেক্ষা করতাম এই একটি দিনের। এই দিন নিয়মের বেড়াজাল আমাদের আটকে রাখতে পারতো না। বিশ্বজনীন ঈদের সাথে আমরা সবাই গা ভাসিয়ে দিতে পারতাম। সিনিয়র জুনিয়র, অফিসার বা সেপাই, এমনকি একজন ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ কর্মকর্তার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকতো না। সেদিন মনে হতো এটাই মানবজীবনের আসল চিত্র। বাকি সব দু'দিনের খেলা। জীবন নাটকের দৃশ্যমাত্র। আমার কর্মজীবনের পুরোটা সময়ই তো কেটে গেছে সেনানিবাসে। বাইরের জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জীবন-প্রণালী সেখানে। ইচ্ছা করলেই ঈদের সময় ছুটি নিয়ে বাড়িতে যেতে পারতাম না। সেইসব ঈদে মাকে অনুভব করতাম মনের সব ব্যাকুলতা উজাড় করে দিয়ে। মাকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণাগুলো জর্জরিত করে রাখতো রমজানের শুরু থেকেই। ভাবতাম– এবার আর মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করতে পারবো না। মায়ের হাতের ছোঁয়া লাগবে না আমার মাথায়। মায়ের হাতের তৈরি খাবার এবার আর খাওয়া হবে না। জীবনে কতো সুস্বাদু খাবারই তো মুখে দিয়েছি। কিন্তু মায়ের হাতের তৈরি খাবার কিংবা তার দেয়া খাবারের মতো মহাতৃপ্তি জোগানো খাবার পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাইনি। সেই মাকে দূরে রেখে ঈদ উদযাপনের আনন্দটাই উপভোগ করতে পারতাম না। তারপর সৃষ্টির অমোঘ বিধানে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান– সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার– সবচেয়ে বড় ভালোবাসার– সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি আমার মা এই পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানদের চিরদিনের জন্য এতিম করে দিয়ে চলে গেলেন। একদা মনে হতো মাকে ছাড়া কি ঈদ হয়? অথচ আজ বেশ ঈদ করে যাচ্ছি। ঈদের জামায়াত থেকে ঘরে ফিরে মাকে পাই না। তার চিরস্থির ছবিটার সামনে দাঁড়াই। ছবির অপলক চোখ দুটো আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় মা যেনো এখনো আমাকে দোয়া করছেন। কিন্তু তার পবিত্র পা আমি ছুঁতে পারি না। ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। মা-হারা সন্তানের আকূল আকুতি দুমড়ে-মুচড়ে দেয় সকল আনন্দধারা। আবার ফিরে আসতে হয় বাস্তবে। মনের গভীর কোণে মায়ের প্রতি অসীম ভালোবাসা লুকিয়ে রেখে ঈদের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে হয়। এভাবেই চলে এখনকার জীবন।

এক সময় অযাচিতভাবেই দায়িত্ব এলো রাষ্ট্র পরিচালনার। পবিত্র এই দায়িত্ব। মহান আল্লাহপাকের ইচ্ছার প্রতিফলন। দেশ পরিচালনা এবং দেশের মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করা কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ। রাষ্ট্রপ্রধানের সাফল্য বা ব্যর্থতাই হচ্ছে দেশ ও জাতির সুখ-শান্তি-উন্নতি-অবনতি নির্ধারণের মাপকাঠি। তাই ক্ষমতা গ্রহণ করেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম সাফল্য অর্জনের সংগ্রামে। মায়ের দোয়া ছিলো সাথে। ঈদের সময় দোয়া চেয়ে মাকে বলতাম– দোয়া করো

www.pathagar.com

মা, আমি যেনো আমার দেশের মানুষকে সমানভাবে ঈদের আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারি। মা প্রাণভরে দোয়া করতেন। আজো মনে হয়– আমি দেশের জন্য যা কিছু ভালো কাজ করতে পেরেছি তার পেছনে ছিলো মায়ের দোয়া। আমার সৌভাগ্য মা আমাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখে গেছেন, আমার দুঃখ আমার বাবা আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতায় দেখে যেতে পারেননি।

রাষ্ট্রপতির জীবন– সেও নিয়মের নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ থাকে। ইচ্ছা করলেই সবকিছু করা যায় না। তবে ঈদের দিনে কিছুটা ব্যতিক্রম তো থাকেই। ঈদগাহে ভেদাভেদহীনতায় মহান ইসলামের মহত্বে হৃদয়-মন পবিত্রতায় ভরে ওঠে। মনে জেগে ওঠে– একদিন তো এভাবেই রাজা-প্রজার ভেদাভেদ থাকবে না। সবাই এক ময়দানে দাঁড়াবো। এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, রাষ্ট্রপতি-জীবনে ঈদ উদযাপনে ধর্মীয় অনুভূতিতে সিক্ত থাকলেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে সম্পূর্ণ প্রাণের ছোঁয়া কিছুটা হলেও ম্লান থাকতো। অনেকেই ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসতেন দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে। ব্যক্তি এরশাদের সাথে নয়। সেখানে আমি প্রাণের স্পর্শ অনুভব করতাম না। রাষ্ট্রীয় পরিবেশে ঈদ উদযাপনে আনুষ্ঠানিকতার একটা বিষয় জড়িয়ে থাকে। সেসব কিছু সব সময় ভালোও লাগতো না। ঈদ মানে উৎসব। সেই উৎসব নিয়ন্ত্রিত হলে সেখানে প্রাণের আমেজ থাকে না– সেটাই উপলব্ধি করতাম রাষ্ট্রপতি- জীবনে। অনেক সময় মনে হতো– আজ যারা আমার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে এসেছে এবং অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করছে, এটা তাদের হৃদয়ের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়। তখন কিছুটা হলেও নিজেকে গুটিয়ে নিতাম। তবে ব্যক্তি আমাকে ভালোবেসেও অনেকে আমার কাছে ঈদের দিনে আসতেন, তাদের নিয়ে ঈদের আনন্দে মেতে উঠতাম। সবচেয়ে ভালো লাগতো যখন এতিমদের কাছে যেতাম। তাদের হতভাগ্য জীবনে দেশের একজন রাষ্ট্রপতির খানিকটা সময়ের সান্নিধ্য আনন্দধারায় স্রোতের সঞ্চালন ঘটাতো। ওদের কচি মুখের হাসিতে দেখতাম– ঈদের সত্যিকার আনন্দগুলো চিক চিক করে উঠেছে। নিজেকে তখন ধন্য মনে করতাম। মনে হতো আমার উপস্থিতিটাই ওদের ঈদের বড় উপহার। যা-হোক, ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রপতিকে ঈদ উদযাপন করতে হয় এবং সেটাই পালন করতাম তখন। একজন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সারাটা বছর ব্যস্ত জীবন কাটানোর পর ঈদের একটা দিন সারাদেশের মানুষের আনন্দের অনুভূতি উপলব্ধি করতাম– সেটাই ছিলো আমার তখনকার জীবনের সবচেয়ে বড় ঈদ উপহার।

ওই যে বলেছি– সময়ের বাঁকে বাঁকে আমার জীবনের গতিধারায়ও এসেছে পরিবর্তন। রাষ্ট্রপতি-জীবনের পর রাজনৈতিক কারণে বদলে গেছে আমার জীবনধারা। যেতে হলো আমাকে জেলে। কেনো গেলাম– এখানে সে আলোচনায় যাবো না। বন্দি জীবনে ঈদ কেমনভাবে উদযাপন করেছিলাম– সেই স্মৃতি খানিকটা এখানে মন্থন করতে চাই। জীবন থেকে চলে গেছে আমার

www.pathagar.com

বারোটা ঈদ অলক্ষ্যে– খাঁচার পাখির মতো নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে। ঈদের আকাশে যখন পাখা মেলে উড়ে চলা বলাকার মতো সাদা পাঞ্জাবি পরা মানুষেরা শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা বদল করে চলেছে– আমি তখন একাকী নিঃসঙ্গ এক শিকলপরা মানুষ বন্দি যন্ত্রণায় কাতর মিনতি জানিয়েছি আল্লাহর দরবারে– আমাকে ঈদগাহে নামাজ পড়তে দাও। আমি একটি জাতীয় ঈদগাহ তৈরি করেও বারোটা ঈদের নামাজ জামাতে পড়তে পারিনি। সেই বারোটা ঈদ আমার জীবনে আর ফিরে পাবো না। দোষ কাউকে দেবো না তার জন্য। হয়তো এটাই ছিলো আমার নিয়তির বিধান!

পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে রোজার দিনে সেহেরি খেয়ে রোজা রাখতে পারতাম না। কারণ জেলখানায় সন্ধ্যা বেলায় সেহেরির জন্য যে খাবার দিয়ে যাওয়া হতো– ভোর রাতে তা খাওয়ার উপযুক্ত থাকতো না। তাই প্রায়ই এক গ্লাস পানি খেয়ে রোজা রাখতাম। তারপর এক সময় ঈদের পবিত্র দিনটি সামনে আসতো। মনে পড়তো নজরুলের কবিতার চরণ–

"শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো
বরষের পরে আসিল ঈদ।"

সেই প্রতীক্ষিত ঈদ–আনন্দের এতোটুকু ভাগ নিতে পারতাম না। তবুও ভোরবেলা গোসল সেরে মনের মাঝে ঈদের ময়দান তৈরি করে ছোট পরিসরের কক্ষের মধ্যেই জায়নামাজে দাঁড়িয়ে যেতাম। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যও কাউকে কাছে পেতাম না। অপেক্ষায় থাকতাম– বাসা থেকে হয়তো কিছু খাবার আসবে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আসবে। কাচের দেয়ালের ওপার থেকে ওদের দেখবো। ইন্টারকমের মাধ্যমে ওদের বলবো– ঈদ মোবারক ! এসবই ছিলো আমার জেল জীবনের ঈদ উদযাপন। কান্নাভেজা কণ্ঠের আওয়াজ আসতো ইন্টারকমে– ঈদ মোবারক। কাচের ওপার থেকে দেখতাম– ঈদের আনন্দের দিনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অশ্রুভেজা চোখ। এভাবেই কেটে গেছে আমার জীবনের বারোটা ঈদ।

ঈদের খাবারের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। বাসা থেকে চার বাটির একটি টিফিন ক্যারিয়ারের তিন বাটিতে ঈদের খাবার এসেছে। আমার মনে হলো– আরো একটি বাটি হয়তো ছিলো। খাবার না থাকলেও চতুর্থ একটি বাটি থাকা উচিত। তা না হলে ক্যারিয়ারটা ঠিকমতো বন্ধ করা যায় না। যাহোক, তিন বাটিতে যে খাবার ছিলো সেটাই খেয়ে নিলাম। তার বেশ কয়েকদিন পর আদালতে হাজিরা দেবার সময় আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম– ঈদের দিনে তিন বাটিতে খাবার পাঠালে বাকি বাটিটা পাঠালে না কেনো। তিনি জানালেন– চতুর্থ বাটিটায় গরুর গোশত ছিলো। সেটা জেল কর্তৃপক্ষ ভেতরে পাঠাতে দেয়নি। কারণ ঈদের দিনে কী কী খাবার দেয়া হবে সে ব্যাপারে একটা আবেদন করতে হয়েছিলো। কিন্তু আবেদনপত্রে গরুর গোশতের কথা উল্লেখ ছিলো না। তাই

www.pathagar.com

গরুর গোশতের বাটিটা দিতে দেয়নি। এ কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার আর কোনো উত্তর দেবার ছিলো না।

ঈদের দিনে জেলখানায় বসে ভাবতাম দেশের মানুষের কথা। ভাবতাম আজ হয়তো ওরা আনন্দেই আছে। যে যার অবস্থানে থেকে যে যার সাধ্যমতো ঈদ উদযাপন করছে, ঈদের আনন্দ উপভোগ করছে। এই অনুভূতিই আমার ছিলো ঈদের আনন্দ উপহার। তবে আমি তো চিরদিন আশাবাদী মানুষ। আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা রেখে আশায় বুক বেঁধে রাখতাম। এই মেঘ হয়তো একদিন কেটে যাবেই। মেঘের আড়ালেই তো সূর্য হাসে। হারানো শশীর হারানো হাসি এক সময়ে অন্ধকার দূর করেই ফিরে আসে। আমি সেই অপেক্ষায় ছিলাম এবং সে অপেক্ষার অবসান ঘটেছে।

এখন আমি মুক্ত মানুষ। মুক্ত মনে মুক্ত চিন্তার রাজনীতি করি। মুক্ত পরিবেশে ঈদ উদযাপন করি। মুক্তভাবে আপনজনের সান্নিধ্যে যাই। আমার জীবনে এসেছে নতুন অতিথি। সে আমার প্রাণের এক টুকরা– আমার এরিক! ওকে নিয়ে ঈদ উদযাপনে আনন্দের আতিশয্যে ভুলে যাই জীবনের সব দুঃখ বেদনার-তিক্ততার স্মৃতি। অনুভব করি নতুন প্রাণের নতুন স্পন্দন। এরিকের মুখচ্ছবিতে দেখি আমার বাল্যজীবনের স্মৃতি। সেই সাথে পাশে পাই অনেক পোড় খাওয়া আমার রাজনৈতিক কর্মীদের। আমার আদর্শের সন্তানদের। রাজনৈতিক আদর্শের সন্তান একজন রাজনীতিকের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমার সেই সন্তানেরা আমার সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় সব সময় পাশে থাকতে চায়। ঈদের দিনে আমার রাজনৈতিক কর্মীদের মুখগুলো সবচেয়ে ভালো লাগে। এখন আমি ক্ষমতায় নেই। কিছু দেয়ারও নেই আমার। সুতরাং এখন যারা আমার কাছে আসে তারাই আমার প্রকৃত আপনজন– হৃদয়ের মানুষ, তারাই আমার সুহৃদ বন্ধু। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমি আপনজনদের খুঁজে নিতে পেরেছি– এটাই এখনকার ঈদে আমার বড় আকর্ষণ। একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিক হিসেবে আমি দেশের লাখো কোটি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। যেখানে যাই, দেশের যে প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াই– সেখানেই আমার ভালোবাসার মানুষগুলো ছুটে আসে। তারা আমার কথা শুনতে চায়– পেতে চায় হাতের পরশ, জানতে চায়– আমি কেমন আছি। ঈদের আনন্দের মতো সে আনন্দ আমি উপভোগ করি প্রতিনিয়ত–প্রতিদিন– প্রতিমুহূর্তে। আমি ঈদের অনুভূতিতে ব্যক্ত করি, প্রতিটি মানুষের জীবনে ঈদের আনন্দ ভরে থাকুক প্রতিটি দিন– প্রতিটি রাত। পবিত্র ঈদের মর্মবাণী শান্তি-সৌহার্দ্য-উৎসব-আনন্দ প্রতিফলিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবনে।

www.pathagar.com

কবিতায় আমার স্মৃতিময় ঈদ

"রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ..." কাজী নজরুলের এই অমর সঙ্গীতটির সুরে সুরে মনের মাঝে মহাপবিত্র আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয়। সে অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। কবি গোলাম মোস্তফা কবিতার ভাষায় বলেছেন,

"সকল ধরা মাঝে বিরাট মানবতা মুরতি লভিয়াছে হর্ষে,
আজিকে প্রাণে প্রাণে যে ভার জাগিয়াছে, রাখিতে হবে সারা বর্ষে
এ ঈদ হোক আজ সফল ধন্য, নিখিল মানবের মিলনের জন্য;
শুভ যা জেগে থাক, অশুভ ঘুরে যাক, খোদার শুভাশীষ পর্শে"

ঈদ নিয়ে প্রায় সব মুসলিম কবিই কিছু না কিছু লিখেছেন। বর্তমানে কবিতার ছন্দে আধুনিকতা এসেছে। আধুনিক কবিরাও ঈদ নিয়ে কবিতা লিখছেন। তবে আগের ছন্দে নয়। লিখছেন গদ্যের ছন্দে। অনেকেই বলেন– আধুনিক কবিতা বুঝতে কষ্ট হয়। কবিতার পাঠকও অপেক্ষাকৃত কম। তবে কবিতা যারা পড়েন তারা কিন্তু কোনো কবির কবিতাই বাদ দেন না। বর্তমানে কবির সংখ্যাও কম নয়। বলা যায়– পয়ার যুগের চেয়ে অনেক বেশি। আমিও কবিতা লিখি। তবে নিজেকে একজন সফল কবি ভাবি না। কবিতার প্রতি রয়েছে আমার গভীর ভালোবাসা। তাই কবিতা নিয়ে সাধনা করি। সে সাধনার ফল হিসেবে নিজের মনের কিছু অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসে। তা কবিতা হয় কিনা জানি না। তবে সেখানে থাকে আমার কাব্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

১৯৯৭ সালে জেল থেকে মুক্ত হবার পর আমার লেখা সবগুলো কবিতা সংকলিত করে 'কবিতা সমগ্র' নামে একটি বই প্রকাশ করেছি । সে বই-এর ভূমিকায় বলেছিলাম– কবিরা কখনো পরাজিত হয় না। কবির সত্য কণ্ঠ কখনো স্তব্ধ হবে না। সত্যিই– যতো বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হই না কেনো, আমি কিন্তু পরাজিত হইনি। আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়নি। আমার কবিতার কলম থেমে থাকেনি।

একজন কবি সাধারণত যে ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন, আমি কিন্তু তা কখনো হইনি। আমার কবিতা 'বাজে বা কোনো কবিতাই হয়নি'– এ ধরনের কথা আমি শুনিনি। বলা হয়েছে– যখন আমি ক্ষমতায় ছিলাম তখন

www.pathagar.com

নাকি আমার "তোষামুদে" কিছু কবি আমার নামে কবিতা লিখে দিতেন। যাহোক আজ আমি ক্ষমতায় নেই। এখন আমার চারপাশে কোনো খয়েরখাঁও নেই। আমি কিন্তু কবিতা লিখে যাচ্ছি। তবে তা সংখ্যায় বেশি নয়। রাজনীতির ব্যস্ততার কারণে লেখা খুব বেশি হয়ও না। এর মাঝে কয়েকজন সম্পাদক ও সাংবাদিকের অনুরোধে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছি। আবার কয়েকজন কলামিস্টের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়েও কিছু কথা লেখা হয়ে গেছে। হাতে সময় না থাকলেও লেখার জন্য সময় বের করে নিতে হয়েছে। যাহোক যে বিষয় নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনার অবতারণা করতে চেয়েছি তা কিন্তু এসব প্রসঙ্গে নয়। শুরুটাই করেছি পবিত্র ঈদ নিয়ে এবং ঈদ প্রসঙ্গেই কিছু কথা বলতে চাই। এখানে আমার প্রসঙ্গ হলো ঈদের কবিতা।

ইতিপূর্বে ঈদ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কোনো নিবন্ধ আমার লেখা হয়নি। ঈদ উপলক্ষ করে কিছু কবিতা লিখেছি। তবে তা ঈদের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক নয়। সেখানে শুধু ঈদের প্রসঙ্গ এসেছে। এবার ঈদকে সামনে রেখে ঈদ উপলক্ষে কোনো কবিতার কথা চিন্তা না করে ঈদের কবিতা নিয়ে আমার কিছু স্মৃতিকথা আলোচনা করতে চাই। এই আলোচনায় কবিরা তাদের কবিতায় ঈদকে কীভাবে উপজীব্য করেছেন তার বিশদ বর্ণনা দিতে পারলে নিবন্ধটি হয়তো সমৃদ্ধ হতো। তবে আমি সেদিকে যাবো না এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যও আমার সংগ্রহে নেই। আমি নিজে কবিতায় ঈদকে কীভাবে উপস্থাপন করেছি, তার দু'চারটি কথা এবং প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবো হয়তো। আমি কবিতায় কোনো জটিল ভাষা প্রয়োগ করতে পারি না। নিজে সোজাভাবে যা উপলব্ধি করি, সেটাই সরলভাবে বর্ণনা করি। একবার ঈদকে সামনে রেখে যখন কবিতার কথা ভাবছিলাম তখন মনের আকাশে উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলে উঠেছিলো একটি মানুষ– যার নাম কমরুদ্দি। সেই লোকটিই হয়ে গেলো আমার কবিতার উপাদান। তাকে নিয়ে লিখলাম– "একটি ঈদ, নতুন বাংলার কমরুদ্দি",

তাকে দেখেছি কতোবার
আপন পরিক্রমায় একান্ত আপন মনে
ডাক দিয়ে গেছে মরমিয়া গানে
মানুষের প্রাণে
রাত্রির নিয়মে
আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাকে
সেই কবে আমার পিতার সময় থেকে
কী এক আশ্চর্য একাগ্রতায়
সে বলে গেছে
তোমরা ওঠো সেহরির সময় হয়েছে এখন
আজান পড়েছে তারপর তিস্তার নির্জন চরে
বিস্তীর্ণ বাতাসে।

www.pathagar.com

তার কণ্ঠের পরিচিতি হাঁক এখনো কানের কাছে
ক্রমাগত কথা বলে
তিরিশটি দিন সে জেগে থাকে
যেন এক দৃঢ়তার অবিচ্ছিন্ন ছায়া
তীক্ষ্ণ এক ছবির শরীর
আমার পিতার সময় ছিলো সেই বলিষ্ঠ কৃষক
কমরুদ্দি নাম যার
কোনোদিন বলেনি যে, তারো আছে
অনেক খাবার লোক
তারো চাই অনেক পরার কাপড়
অভাবের পুরনো দেয়াল এক
অবরুদ্ধ করেছে জীবন
সেও বসে থাকে অপেক্ষার দীর্ঘ পথে

কবে পাবে ফসলের দাম
একখণ্ড ভূমি তার নিজের সন্তানের মতো।
পরনে একদা দেখেছি তার খোপকাটা
লুঙ্গির কাপড়
রঙিন ফতুয়া গায়ে আর কাঁধে লাল রঙ
গামছার সনাতন শরীর
কবেকার রৌদ্রস্নাত, ক্রমাগত পুড়ে পুড়ে
হয়েছে ধূসর
এবং বসে আছে অপেক্ষার দীর্ঘ পথে
কবে পাবে ফসলের দাম।
কখনো পাতেনি হাত কারো কাছে
নেয়নি দয়ার দাম কোনোদিন
কখনো বলেনি কারো কাছে নিজের সেহরি তার
জোগাড় করেছে কীভাবে।

এতোদিন পরে রোজার মাসের শেষে
তার মুখ শুধু ভাসে
আমার ঋণের ফিকে রঙ পটভূমি জুড়ে
একান্ত স্বচ্ছ এক ছবির মতোন
তাকে যদি এখন পেতাম আমি কাছে
ঈদের দিনের এই একান্ত মুহূর্তে
বিনীত শ্রদ্ধায় তাকে জানাতাম

www.pathagar.com

বলতাম প্রকাশ্য উচ্চারণে

হে বন্ধু হে চিরায়ত বাংলার কমরুদ্দি
এ ঈদ তোমার
তোমার বিশ্বাসের সেতু বেয়ে
আমরা করেছি অতিক্রম সিয়ামের মাস
আমার চিরদিনের বাংলার কমরুদ্দি
আমার নতুন বাংলার
তোমার মধ্যেই আমি কেবলি দেখেছি সেই
রোজাদার সাহসী সংযমী মানুষ
সকল ঈদের কবিতা তাই মিশে আছে
তোমার একান্ত সেই কণ্ঠ জুড়ে
সেহরির সময় হয়েছে এখন তোমরা ওঠো
আজান পড়েছে তারপর তিস্তার নির্জন চরে
বিস্তীর্ণ বাতাসে।

আমার বর্ণনার কমরুদ্দি শুধু একজন ব্যক্তি নয়। সে সারাদেশের কমরুদ্দিদের প্রতীক। আগেই বলেছি ঈদের মর্মবাণী নিয়ে আমার কবিতা লেখা হয়নি। তবে ঈদের আনন্দধারায় অবগাহন করার সুখ অনুভবের আগে কমরুদ্দিদের ছবিগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাই ঈদের কবিতায় ওদের মুখগুলো রচনা করেছি হৃদয়ের গভীর আকুতি দিয়ে। এবার ঈদকে সামনে নিয়ে এখনো নতুন কোনো কবিতার কথা ভাবিনি। মনে হয়েছে পৃথিবীটা গদ্যময় হয়ে গেছে। গোটা মুসলিম জাহানে ছন্দপতন ঘটেছে। ঈদের মাহাত্ম্য যেনো ভুলতে বসেছি। কাকে ঈদ মোবারক জানাবো– কাকে আলিঙ্গন করতে পারবো– কিছুই যেনো ঠিক করতে পারি না। আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশের বাসিন্দা। এক জাতি ও এক ভাষার মানুষের বাস এখানে। ধর্মীয়ভাবে ৯০ ভাগই মুসলমান। অন্যান্য ধর্মের যে জনগোষ্ঠী আছে তাদের নিয়ে অপূর্ব সম্প্রীতির মধ্যে বাস করে আসছি আমরা। অথচ নিজেদের মধ্যে কতো বিভেদ– বিসম্বাদ, কতো হানাহানি, হিংসা বিদ্বেষ। রাজনৈতিক বিভেদ, নীতি আদর্শের বিভেদ, মত ও পথের বিভেদ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কিংবা কুক্ষিগত করার জন্য সংঘাত ও নৃশংসতা– অরাজকতা। সকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবণতা। দেশজুড়ে বোমা হামলা হয়। এক সময় মিছিলের স্লোগানে শুনতাম– ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এখন বাস্তবে দেখছি ঘরে ঘরে অস্ত্রাগার গড়ে উঠছে। কারা এই অস্ত্রগোলাবারুদ নিয়ে ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছে? কি তাদের উদ্দেশ্য? কি চায় তারা? এই অস্ত্র দিয়ে কাদের বুক ঝাঁঝরা করতে চায়– কাদের শরীর ছিন্নভিন্ন করতে চায়? এসব চিন্তা মাথায় এলে মনের মধ্যে ঈদের আনন্দ ম্লান হয়ে আসে।

www.pathagar.com

কমরুদ্দিদের মুখগুলো পর্যন্ত চোখের সামনে ঝাপসা মনে হয়। কবিতায় ছন্দ হারিয়ে ফেলি। অথচ কবিতা আমার জীবনের একমাত্র খোলা জানালা। এই জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমি ঈদকে দেখেছি কতোবার। ঈদের আনন্দ ও খুশির অনুভূতি ব্যক্ত করেছি কবিতায়।

আমার কবিতা আর আমার মা উভয়ে আমার হৃদয়ের গহিন কুঠরির সহাবস্থানের বাসিন্দা। এদের একজন পরম শ্রদ্ধা আর অন্তহীন ভালোবাসা, অপর বাসিন্দা আমার গভীর প্রেম। ঈদ মুসলমানের জীবনে মহাআনন্দের প্রতীক। তাই ঈদের দিনে অনুভব করি মায়ের পবিত্র স্পর্শ। আর হৃদয়ের প্রেমে উপলব্ধি করি কবিতার প্রতি ভালোবাসা। উভয়ের মিলনে আমার ঈদ হয়ে ওঠে পবিত্র আনন্দময়। একবার ঈদে মায়ের কাছে যাবার সুযোগ ছিলো না। তাই অপেক্ষায় ছিলাম মায়ের চিঠির। ঈদকে উপলক্ষ করে লিখেছিলাম একটি কবিতা। শিরোনাম ছিলো "আমার মায়ের চিঠি"। সেই ঈদের কবিতা :

সজনে গাছের ডালে দুপুরের কাক
ঠোঁট মুছে নিলো কয়েকবার
ভাঙা ভাঙা হাতের লেখায়
নিশ্চয়ই এখন আসবে সেই চিঠি
নিঃসঙ্গ মফস্বল শহর থেকে
আমার মায়ের সেই পত্র
রাত জেগে জেগে লেখা
স্নেহের অজস্র শিখায় আন্দোলিত।
অতি পরিচিত স্মারকলিপি যেনো
সেই চিঠিতে থাকবে
মানুষের কথা
আমাদের চিরচেনা
মানুষেরা সব
গরিবদের জন্য চাই ঈদের কাপড়চোপড়।
আমি জানি আসবে আমার মায়ের চিঠি
এই দুপুরের ক্লান্তির ভেতর।
কতোবার তোমাকে বলেছি মা
তুমি ভেবো না কখনো
আমি জানি তুমি কী চাও
কী করতে হবে আমার।
তবু মা আমার কখনো মানতে চায় না
আমার মায়ের মন পড়ে থাকে
গ্রামবাংলার মাঠে বিপন্ন মানুষের কাছে।

www.pathagar.com

সজনে গাছের ডালে দুপুরের কাক
ঠোঁট মুছে নিলো কয়েকবার
এখন আসবে চিঠি আমার মায়ের।

ঠিকই মায়ের চিঠি যথাসময়ে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। যেমনটি প্রত্যাশা ছিলো– ঠিক তেমনই। ঈদের আনন্দের মতো সেই চিঠি পাওয়ার আনন্দ। একে অপরের পরিপূরক। দু'য়ে মিলে আমার ঈদ হয়েছে ছন্দময়। এবার ঈদকে সামনে নিয়ে ঈদের কবিতার স্মৃতিমন্থন করতে বসেছি। নতুন কবিতার অবগুণ্ঠন এখনো কেনো খুলতে পারছি না– সে হিসাবটাও মিলিয়ে দেখতে পারিনি। কবিতা আমার জীবনের খোলা জানালার মতো হলেও নিজের চারদিকে আছে অনেক দৃশ্যমান বা অদৃশ্য দেয়াল। নানাবিধ সমস্যার জাল অক্টোপাসের মতো বেঁধে রাখে। রাজনৈতিক, সাংসারিক, সামাজিক এবং দেশের চিন্তাতো আছেই। আরো আছে সময়ের সীমাবদ্ধতা। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের সামনে যে দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে, সেই তুলনায় জীবনের পরিধি অনেক ছোট। আমরা সেই ছোট্ট জীবনকেই নিয়ে যেতে চাই সীমাহীন মুক্তির আলোকে। মুক্তির এই আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে মানুষের পবিত্র এবং সর্বোত্তম প্রত্যাশা। মানুষের আত্মার ওপর যে জানালা দিয়ে এক টুকরো আলো এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জীবনকে ঝলমলে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারে, তারই নাম কবিতা। আমার উপলব্ধি তাই। এই উপলব্ধিটাকে যে কাজে লাগাতে পারে, সে-ই কবিতাকে আলোতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। একটি কবিতাকে মুক্তি দিতে পারে। কবিতাকে মুক্তি দেয়ার স্বাদ যে কতো মধুর তাও ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। তবে আমার কবিতাকে মুক্তি দেয়ার চেতনাও দীর্ঘ সময়ের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলো। আমি একদা একটি উৎসবে যাবার প্রত্যাশায় মনের মাঝে ছন্দের ছবি এঁকেছিলাম। কবিতার ভাষায় সেখানে বলেছি :

উৎসব আক্রান্ত নয় আজো। যদিও
কতিপয় লোক উৎসবের বিপক্ষে– ঐতিহ্য
বিকৃতির কাজে নিয়োজিত। এদেশের মাটিতে
একদা আজানের ধ্বনি, ফসলের গান আর
শুভেচ্ছা বিনিময়ে পরিচয় পূর্ণ হতো। অন্তর
থাকেনি শূন্য। কোথাও কারো না কারো
জন্ম হতো প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার নিয়মে।
ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট। প্রানবন্ত প্রিয়ার
মনে ঝড়ে না মধু। আন্তরিক কোনো মুখ
ওঠেনা ভেসে সাহসীর যোদ্ধার চোখে
যুদ্ধে যাবার আগে। অন্তরে হাহাকার!

www.pathagar.com

বিপন্ন সম্পর্ক খুলে দেয় অশান্তির দ্বার–
নীরব সাক্ষীরা সব ইতস্ততঃ ছড়ানো
কখনো সচল কখনো অচল অবস্থার
শিকার তারা। ভীত অবনত সময়ের কাছেও
পরাজিত তারা। বিবেক থেকেও মৃত।

আকাশের নীলের সাথে দেখা হয় যখন
থাকে না পাখিদের গান আঙ্গিনায়–
থাকে শুধু ক্রন্দন, দরিদ্রের নীচে যাদের
কৌতুক নাচে। আনন্দ করার কথা যার
সে বালক বিব্রত। সাহসী হবার কথা যার
সে নাবিক আজ দিশেহারা প্রাণ।

তবুও পাখিরা ফেরে ঘরে দিনশেষে
গান থাকে, রৌদ্র-মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি
সব থাকে– থাকবে চিরদিন। নিমেশে
কেউ হয়তো চলে যায় এ জগত ছেড়ে
জগত থেমে থাকে না তারপরও। মানুষ
প্রার্থনায় দাঁড়াবে প্রতিদিন কথা ছিলো;
ক্ষমা চাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে
সে কথাও ছিলো একদা। কি যে হলো অঙ্গনে
বদলে গেলো দৃশ্যপট চোখের পলকে।
হারায় ইতিহাস দ্রুত পুরুষ ও নারী। জীবনের গতি
থেমে থাকে শহরের পতাকার নীচে।
রচিত হয় না উপন্যাস-কবিতা-গল্প সেভাবে;
পুরুষ এবং নারী চাহিদা অতিরঞ্জিত করে
ভুলে যায় দাঁড়াতে প্রার্থনায়। কেনো এ ভুল
এর উত্তর তাদের জানা নেই। অপ্রতুল আলো
এবং আরো কতোদূর যেতে হতে তাদের অজানা।
তবুও উৎসবে যাবার সুযোগ অতি সহজে
গলিয়ে যায় মন থেকে হৃদয়ে,
থেকে যায় কবিতায় এবং জীবনে–
হেঁটে যায় কাল থেকে মহাকালে।

www.pathagar.com

কবে কখন আমার মনে কবিতার চেতনা জাগ্রত হয়েছিলো তার দিনক্ষণ কিছুই মনে নেই। এটুকু শুধু মনে পড়ে, আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম কবিতার দু'টি চরণ যখন ইচ্ছার অজান্তেই অগোছালোভাবে কাগজের বুকে লিপিবদ্ধ করেছি। সময়টা ঠিক মনে নেই। সেটা হয়তো কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ হবে। ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে নানা রূপে জীবনের ঋতু পরিবর্তনের এক অপূর্ব মুহূর্তে যখন প্রবেশ করেছে– ঠিক তখন এক মোহনীয় আলোকবর্তিকা শান্তিমন্ত্রধ্বনি হয়ে আমার হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছিলো। সে ছিলো আমার কবিতা– আমার হৃদয়ের রানী, আমার সাধনার আরাধ্য প্রেমিকা। আজ জীবনের সামনে যখন সায়াহ্নছায়া অপেক্ষা করছে তখন মনে হয় যাকে আমি ইচ্ছার অজান্তেই অবলীলায় পেয়েছিলাম তাকে যেনো লালন করেছি অবহেলায়। আজ মনে হয় জীবিকার জন্য যদি সৈনিক জীবন বেছে না নিতাম– ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা যতোই দেখা দিক না কেনো, যদি রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ না করতাম অথবা অনিবার্য কারণে রাজনীতির জটাজালে পা দু'টোকে জড়িয়ে না ফেলতাম, তাহলে হয়তো অলৌকিকভাবে যে আনন্দের ভার আমার ওপর অর্পিত হয়েছিলো তাকে আঁকড়ে ধরেই আত্মপ্রকাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে সফল করতে পারতাম।

মানুষ অনায়াসে যা পায় তার অধিকাংশই অবহেলায় হারিয়ে ফেলে। আমার জীবনেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কাব্যকে আমি যথাযথ আদরে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। তারপর আবার সে কবিতা যখন তন্দ্রাতুর চোখে স্বপ্নের রানী হয়ে বিচরণ করতে চেয়েছে তখন কোনো এক কালো ব্যাধের শরাঘাতে সে আহত হয়েছে। আমি তাকে উদ্ধার করতে পারিনি, কারণ তখন আমি বন্দি। আমার চারদিকে উচ্চ প্রাচীর– লোহার গরাদ। একটুকরো কাগজ আর একটা কলমের জন্য আমার কবিতা শরবিদ্ধ কপোতের মতো আর্তনাদ করতো। আমি অসহায়ভাবে তখন জীবনমন্থন বিষ আকণ্ঠ পান করে নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আর কবিতাকে শুধু সান্ত্বনাসুধায় সিক্ত করে মনের মাঝে লুকিয়ে রেখেছি। তাকে বাইরের জগতে আনতে পারিনি। সেই নির্জনের ব্যথাগুলো নতুন ছন্দে সাজানোর চেষ্টা করেছি। নতুনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে। আমার জীবনের সে দুঃসহ দীর্ঘ সময়ের নির্জন-স্বজনের নিত্য সঙ্গমের মধ্যে শুধু কবিতার কথাই ভাবতাম। এই কবিতা আমার হৃদয়ের অরণ্যে তীরবিদ্ধ হরিণের মতো যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করেছে। আমার হাত ছিলো অদৃশ্য শেকলে বাঁধা। আমি কবিতাকে সাজাতে পারিনি কলমের তুলি দিয়ে। অথচ কতো কবিতা তখন মুক্তির জন্য আর্তচিৎকার করেছে। আমি সে কবিতাগুলোকে মুক্ত করতে পারিনি। আমার হাতে কলম ছিলো না, কাগজ ছিলো না। এমনভাবে কেটে গেছে ছ'ছটা বছর। ছ'টা বসন্ত, ছ'টা হেমন্ত শরৎ শীত বর্ষা গ্রীষ্ম কখন কীভাবে কেটেছে অনুভবের সুযোগও আসেনি। বারোটা ঈদের আনন্দ কেমন ছিলো জানিনি– বুঝিনি। ঈদকে উপলক্ষ করে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ঈদের

www.pathagar.com

মর্মবাণীকে উপজীব্য করে কবিতা লেখার সাধ জেগেছিলো। কিন্তু সাধ্য আমার ছিলো না। তারপর ফিরে এলো মুক্তির এক মাহেন্দ্রক্ষণ। কারাপ্রাচীর থেকে বেরিয়ে এলাম মুক্ত বাতাসে। আহত কবিতাগুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। কিছু পেলাম– কিছু পাইনি। কিন্তু হারানো ঈদ আর ফিরে এলো না।

কাব্যের জগতে আমি শুধুই একজন কবিতা-প্রেমিক। এখানে আর কোনো সত্তার ঠাঁই নেই। আমার একটি রাজনৈতিক সত্তা রয়েছে। কিন্তু কাব্যের মাঝে আমি রাজনৈতিক সত্তাকে বিন্দুমাত্র ঠাঁই দেই না। কবিতা কখনো দেশ-কাল-পাত্র-মত-আদর্শের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। কবিতা সার্বজনীন– কবিতার ব্যাপ্তি বিশ্বময়। আমার অন্তরের একান্ত সাধনার সম্পদের ওপর আমি রাজনীতির পরশ লাগাতে চাই না। রাজনৈতিক কারণে আমি কারারুদ্ধ হলেও আমার সব কবিতাকে সাজাতে চাই কাব্যের মহিমায়। কারা জীবনে ঈদ আমার কেমন কেটেছে সে প্রসঙ্গে এবারই অন্য একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু আমার ঈদের কবিতার কথাই বলছি। আমার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতোও কারা নির্যাতনের দুর্যোগ এসেছে। সেবার জেলে কাটাতে হয়েছে ছয় মাস। সেই সময়টা ছয় বছরের চেয়েও দুর্বিষহ লেগেছে। দুঃখবোধও ছিলো তখন প্রচুর। একটি কবিতায় সে দুঃখবোধ ব্যক্ত করেছি। সেই কবিতাটি এখানে উপস্থাপন করতে চাই। কবিতাটির নাম দিয়েছি "আবার ফিরে যাওয়া"।

চার বছরের ব্যবধান
আবার সেখানে ফিরে যাওয়া
ফিরে পাওয়া অদ্ভুত পুরস্কার
উপকারের পুরস্কার রাজত্ব দেওয়ার
পুরস্কার। একবার
দেশকে সাজানোর– গরিবকে বাঁচানোর
সমৃদ্ধি সংস্কার উন্নয়নের
পুরস্কার ভোগ করলাম
ছ'টা বছর ধরে।
ভাবলাম কি বিচিত্র এই দেশ
এখানে যেনো গড়া মূল্যহীন
ভাঙ্গায় কদর বাড়ে। বিস্মিত হলাম
কি করলাম– কি তার প্রতিদান।
ছ'বছরে রাত আর দিন

সমান কাটলো। আমার 'বাহেরা'
আমাকে ছিনিয়ে আনলো–
চারটা বছর আগলে রাখলো
বুকের কাছে। তারপর

www.pathagar.com

যার কপালে রাজটিকা তুলে দিলাম
সেই– ঠিক সেই আবার
পুরস্কার তুলে দিলো আমার হাতে–
লোহার বেড়ি– উপকারের প্রতিদান!
উপায় ছিলো না– বিচার দিলাম
মহান আল্লাহপাকের দরবারে।
সে বিচারের রায় পেতে একটু দেরি হলো।
কিন্তু তার আগে?
সেই কয়েক বর্গফুটের
পুরনো পরিচিত আবদ্ধ কক্ষ।
বন্দি-যন্ত্রণার দ্বিতীয়বারের
স্বাদ গ্রহণের সময় শুরু হলো।
মাঝে মাঝে মনে পড়তো
সম্রাট শাজাহানের কথা–
জাহানারাকে বলেছিলেন–
"বিয়ে করিসনি মা ভালো করেছিস।
বিয়ে করলে তোর সন্তান হতো
সেই সন্তান তোকে জেলে পুরে
রাখতো– তোমরা কেউ তোমাদের
সন্তানের মুখে অন্ন তুলে
দিয়ো না– পারলে বিষ দাও।
তা না হলে গলা টিপে
মেরে ফেলো।
প্রায় সমান কথা আমার মনেও জাগতো–
তোমরা কেউ কারো উপকার করো না–
উপকার করলে সে তোমার
পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেবে,
পারলে ক্ষতি করো।
কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ তো তা নয়–
তার যে নির্ভুল বিচার,
আমি যে তার বিচারের রায় দেখেছি।

আজ আমি মুক্ত মানুষ। মুক্ত মনে কবিতা লিখছি। ঈদকে সামনে রেখে সব কবিরাই কবিতা লেখেন। পত্র-পত্রিকায় বর্ণাঢ্য ঈদসংখ্যা প্রকাশিত হয়। আমিও লিখি। সম্পাদকরা ছাপেন। এবার শুধু ভাবলাম নতুন কোনো কবিতার পটভূমি চিন্তা করার আগে ঈদের কবিতার স্মৃতিমন্থন করলে কেমন হয়। কখনো কখনো পুরনো দিনের কথা ভাবতে বেশ ভালো লাগে। জীবনের স্মৃতির পাতার

www.pathagar.com

ভাঁজে ভাঁজে তো জমে আছে অনেক কথা। অতীতের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে কিছু তার মনে পড়ে– কিছু তার নতুন বেশে মনের মাঝে হাজির হয়। তখন হারিয়ে ফেলি বর্তমানকে, অলক্ষ্যে চলে যায় আগামীর ভাবনা, ফিরে আসে অতীত এক মনোহর বেশে। মনে হয় যে দিন চলে গেছে, সেটাই ছিলো স্বর্ণালী সময়। ফিরে পেতে মন চায় মায়ের কোলের শৈশব, চঞ্চল কৈশোর কিংবা জীবন গড়ার দুরন্ত রঙিন যৌবন। বিগত দিনের স্মৃতি মন্থন করে হারানো দিনগুলোকে যেমন উপভোগ করা যায়– এবার সেভাবেই মনে করার চেষ্টা করলাম বিগত ঈদের কবিতাগুলোকে। শত সমস্যার মধ্যে থাকলেও ঈদ এলে অনেক আশায় বুক বেঁধে দাঁড়াই। একবার ঈদে সেই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করলাম যে কবিতায় তার শিরোনামও ছিলো "আশায় বুক বেঁধে থাকি"।

বদলে যাচ্ছে যেনো সবকিছু
আমি দেখছি অবাক বিস্ময়ে–
আকাশ মাটি মানুষ বদলে যাচ্ছে;
প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শেও
বদলের হাওয়া– পরিবর্তনের সুর।
ঋতুর চরিত্রগুলোও যেনো তাদের
পরিচ্ছদগুলোর ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছে,
শ্রাবণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় বর্ষাকে
অঝোরে ঝরায় শরৎ অকালে
ভাসায় শহর নগর বন্দর গাঁও
বিস্তীর্ণ জনপদ হাবুডুবু খায়
দুর্ভোগের সীমানা পেরিয়ে।
ভাবছি কেনো এমন হচ্ছে? কেনো
বিবর্তনের ধারা সব কিছু ওলট-পালট করে দেয়
ঋতুরানী কেনো তার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না
নিয়ে তুষ্ট নয় এখন? আগের মতো
কেনো চিনতে পারি না
বছরের ছয় খণ্ড উপাখ্যান!
আমার পারিপার্শ্বিক রূপ দেখে
আমি আঁতকে উঠি– বন্ধুকে চিনতে
ভুল করি, রূপ বদলের আতঙ্কে থাকি।
মানুষের মানবিকতা বোধের
নির্মম অবক্ষয়ের মতো–
প্রকৃতির রূপের বিবর্তন দেখতে চাই না–
সান্ত্বনা পেতে চাই প্রকৃতিকে দেখে।
পাখিরা পৃথিবীর সব প্রান্তে বসে

www.pathagar.com

গাইবে একই সুরে গান, ফুল ফুটবে
একই গন্ধ রূপ আর রং নিয়ে
নদী ছুটবে পাহাড় থেকে সাগরে
বসন্ত তার আপন মহিমায়
আবির্ভূত হবে শীতের আবরণ ছেড়ে!
কিন্তু মনে হয় সবকিছু যেনো
একে একে বদলে যাচ্ছে ঠিক মানুষের
ন্যায়-নীতি-আদর্শ বোধের মতো–
কে কার কাছ থেকে শিখছে এসব?
মানুষ না প্রকৃতি? না কি আমার সবই
চোখের ভুল– দেখার ভ্রান্তি!
কোথায় মানুষের সেই সহমর্মিতা বোধ,
একে অপরের আপন হবার বাসনা
কেনো বিবর্ণ হয়ে যায়?
ভালোবাসা ভুল হয়, প্রেমের পরিণতি
কেনো যুবতীর এসিডে ঝলসানো মুখ?
রাজনীতিতে কেনো প্রতিহিংসার অনুপ্রবেশ!
এক মানুষের অলক্ষ্যে কেনো
লুকিয়ে থাকে প্রাণ-লোভী আর এক
মানুষ রূপের হায়না !
নিরপরাধ মানুষের বুক কেনো
ঝাঁঝরা হয়ে যায় ঘাতকের
বুলেটে বোমায় গ্রেনেডে!
মানুষ কেনো টুকরো টুকরো হয়?
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নৈতিকতার বিপর্যয়ের
বিষ-বাষ্প কি ছড়িয়ে পড়েছে ঋতুতে
আকাশে বাতাসে নদীতে সমুদ্রে?
পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে কি
মানুষেরই সংক্রমিত রোগে?
তবুও এত কিছুর পরে–
একটি পবিত্র দিনকে সামনে রেখে
আশায় বুক বেঁধে রাখি–
যদি ভেদাভেদহীন আলিঙ্গনে
দু'টি বুকের ভেতর থেকে
একই সাথে একই সুরে গাঁথা
বেজে ওঠা শব্দের মিলনের মতো

www.pathagar.com

আমরা সবাই মিলে থাকতে পারি
যতক্ষণ ওই সুরের স্পন্দন জেগে থাকে!

ঈদ এমনই এক সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসব– যা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেয়। আনন্দ উদযাপনের মধ্য দিয়ে খোদার নৈকট্য লাভের সুযোগ আসে ঈদের মাধ্যমে। তাই ঈদকে উপলক্ষ করে যা কিছুই করা হোক না কেনো তার মধ্যে পবিত্রতার ছোঁয়া লেগে যায়। ঈদকে উপজীব্য করে কাব্য বা সাহিত্য রচনার মধ্যেও যেমন সুখ থাকে তেমনি পাওয়া যায় আনন্দ। ঈদ যেমন সার্বজনীন, বিশ্বের সব মানুষ ঈদের আনন্দে শরিক হতে পারে– বুকে বুকে আলিঙ্গনে হৃদয় থেকে হৃদয়ে সুদৃঢ় বন্ধনের সৃষ্টি হয়; তেমনি সাহিত্যকর্মও সার্বজনীন। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা ধর্মের জন্য আদালা আলাদাভাবে সাহিত্য রচিত হয় না। একই কাব্য-সাহিত্য সব মানুষের জন্যই রচিত হয়। যেমন অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করে গীত রচনা করেছেন– আবার অনেক হিন্দু কবিও কোরআনের বাণী ভিত্তি করে কবিতা লিখেছেন। কোনো লেখা যখন সুখপাঠ্য হয় বা লেখা যখন পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে তখন পাঠক আর লেখকের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই অনুভূতি থেকে প্রত্যেকবার ঈদকে সামনে রেখে কিছু লেখার চেষ্টা করি। কবিতায় আমার স্বাচ্ছন্দবোধটা একটু বেশি থাকে বলে ইতিপূর্বে সে দিকেই মনোনিবেশ করেছি বেশি। মনে হয় অনেক ভাবকে মন্থন করলে যে নির্জাস বের হয়– সেটাই কবিতার একটি লাইন। যার ব্যাখ্যা করলে অনেক বিষয় বেরিয়ে আসে। এবার কবিতা লেখার আগে কিছুটা স্মৃতিচারণ করে ফেলেছি। এই বিশ্বে যার পবিত্র আগমনে আজ আমরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করছি, সেই মহা আনন্দের জন্মদিনকে নিয়ে একবার লিখেছি–"একটি দিনের প্রতীক্ষা"।

একটি আলোকিত দিনের প্রতীক্ষায়
আমার প্রতিদিন কেটে যায় উদাসীন
পথিকের মতো পথপানে চেয়ে চেয়ে।
অন্ধকার পৃথিবীতে দিকভ্রান্ত দিশেহারা
মানুষের পথের দিশা পাওয়ার
যে দিনটি এসে বদলে দিলো
মানুষের দৃষ্টি– বিশ্বের মানচিত্র,
ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনার বিভৎস চিত্র–
যে দিন এসে খুলে দিলো
বিশ্বাসের আলোর দুয়ার, এনে দিলো
শান্তির বার্তা, মানব জাতির মুক্তির পথ–
উন্মুক্ত করলো বেহেস্তের সিঁড়ি,

www.pathagar.com

নতুন সূর্য নিয়ে এলো আসমানে
জমিনে ফুটলো সুরভিত ফুল
ক্ষেত বিলিয়ে দিলো বৃক্ষ-শস্য-ফল
নদী ধারন করলো পিপাসার পানি।
যে দিনে মুক্তিদাতার আগমনী বার্তা পেয়ে
পাখি গেয়ে উঠলো খুশির গান–
সে দিনের নাম বারই রবিউল আউয়াল
মাটির বুকে এক মহা নক্ষত্রের জন্মক্ষন–
ধরায় সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান
অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে তুলনাহীন
এক অদ্বিতীয় মহামানব রাসুল (সাঃ),
যার নাম আমার অন্তরের
সর্বশ্রেষ্ঠ ধন– প্রানের সঞ্চালন, শ্রেষ্ঠতম অর্জন
মানবজাতির জন্য করুনাময়ের শ্রেষ্ঠতম উপহার
তাঁর জন্মদিন অনন্ত অসীম
প্রতীক্ষিত সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।

তবুও এত কিছুর পরে–
একটি পবিত্র দিনকে সামনে রেখে
আশায় বুক বেঁধে রাখি–
যদি ভেদাভেদহীন আলিঙ্গনে
দু'টি বুকের ভেতর থেকে
একই সাথে একই সুরে গাঁথা
বেজে ওঠা শব্দের মিলনের মতো
আমরা সবাই মিলে থাকতে পারি
যতক্ষণ ওই সুরের স্পন্দন জেগে থাকে!

ঈদ যখন সামনে সমাগত তখন পেছনের ফেলে আসা কিছু বেদনাময় স্মৃতিও বেশ তাড়া করে যাচ্ছে। তা হলো দেশের পরিস্থিতি। বারে বারে মনের মাঝে ভেসে উঠছে আসন্ন ঈদ আমরা কীভাবে উদযাপন করতে পারবো! আবার কোনো বিপর্যয় জাতিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে না তো! আসলে জাতি হিসেবে আমরাতো দুঃখ সওয়া জাতিতে পরিণত হয়ে গেছি। যেমন কথায় বলেন- "অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর"। আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে তেমন। আমরা আর কাতর হই না– এখন পাথর হয়ে গেছি। দুঃখই এখন এই পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে আহত হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে অশান্তি-দুঃখ-বেদনা-অসম্মান-অপমানের পাহাড়। আমরা ব্যর্থ-অকার্যকর-সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে পরিচিত হচ্ছি।

www.pathagar.com

বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলার ঘটনায় গোটা জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। সকল দিক থেকে দেশ স্থবির হয়ে পড়ছে। সেই পরিবেশের মধ্যেই ঈদ আসছে। কিন্তু ঈদ এমন এক বিষয় তাকে কোনো বিরূপ পরিবেশ স্পর্শ করতে পারে না। সে শাশ্বত আনন্দ। তাকে আমরা বরণ করবো হৃদয়ের পবিত্রতা উজাড় করে– সকল দুঃখ ব্যথা ভুলে গিয়ে। একটি পবিত্র দিনকে সামনে রেখে এই প্রার্থনাই করবো– ধুয়ে যাক- মুছে যাক অতীত দিনের সকল দুঃখ-গ্লানি-ব্যথা-বেদনার রাশি। ঈদের মহিমায় সিক্ত হয়ে গোটা জাতি যেন বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারি আগামীর সোনালি দিন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। খোদা যেনো কবুল করেন আমাদের মনের পবিত্র বাসনা।

www.pathagar.com

ফজল শাহাবুদ্দীনের জন্মদিনে

বন্ধু কী? সে সম্পর্কে এরিস্টটল বলেছেন, দু'টি দেহের মধ্যে অভিন্ন একটি হৃদয় হচ্ছে বন্ধু। আবার আর এক মনীষী বলেছেন, সবাই বন্ধু হয় না– কেউ কেউ বন্ধু হয়। আসলেই দু'জন মানুষের মধ্যে যখন অভিন্ন একটি হৃদয় গড়ে ওঠে– তখনই সেই হৃদয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। আমার তেমনই এক বন্ধু কবি ফজল শাহাবুদ্দীন। ওর সাথে আমার বন্ধুত্বের বয়সটা খুব বেশি আগের নয়। বাল্য কিংবা কৈশোর, এমনকি যৌবনেরও নয়। যৌবন হলো বন্ধুত্ব গড়ার উপযুক্ত সময়। ওই সময়ে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে কাছে টানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বেশি বন্ধুত্ব হয় শিক্ষা জীবনে। সেটাই যৌবনের কাল। সেই যৌবনে ফজলের সাথে আমার দেখাও হয়নি। হয়তো মনের অজান্তে যুগ যুগ ধরে আমি পথ হেঁটেছি একজন ফজল শাহাবুদ্দীনকে বন্ধু হিসেবে পাবার জন্য। পেয়েছি তাকে পৌঢ় বয়সে। যখন ওকে পেয়েছি তখনই মনে হয়েছে ফজলের সাথে আমার এই মাত্র পরিচয় নয়, এ যেনো অনেক সুদূরের পরিচয়। আমরা দু'জনে পথ হেঁটেছি দুই পথে– একটি গন্তব্যে পৌঁছার লক্ষ্যে। সেই গন্তব্যস্থলই হচ্ছে আমাদের বন্ধুত্ব। সে আমার সত্যিই অভিন্ন এক হৃদয় বন্ধু।

বন্ধুর কাছে বন্ধুর জন্মদিনটা একটি অন্যতম স্মরণীয় দিন। ফজলের সাথে বন্ধুত্ব হবার পর নতুন ইংরেজি বছর শুরু হলেই মনের গভীর থেকেই সাড়া দেয়– সামনে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। এই দিনটিতে ফজলকে একটি বাক্য বলার জন্য মনে যেনো আমি সারাটা বছর অপেক্ষায় থাকি। কখন বলবো– 'হ্যাপি বার্থডে ফজল'। এই দিনে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে– হে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, তুমি কি আমার জন্য হাজারটা ফজল শাহাবুদ্দীনের জন্ম দিতে পারোনি? তাহলে যে আমার হাজারটা ফজল বন্ধু থাকতো। যদিও এসব কথা হচ্ছে কল্পনার সৃষ্টি। অবশ্য কল্পনায় বিচরণ করতে অনেকে ভালোবাসেন– আমিও বাসি। কবি তো কল্পনায়ই কবিতার জাল বোনেন। ফজল একজন দেশবরেণ্য কবি। আমিও কবিতা নিয়ে চর্চা করি। এখানে আমার সফলতা-বিফলতা কোনো মাপকাঠিতে বিচার করি না। আমি আমার সৃষ্টিকে নিয়ে উল্লাসে মেতে থাকি।

কবিতাকে আমি কতোটুকু কী দিতে পেরেছি– তা জানি না। তবে কবিতা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। যেমন কবিতা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কবি ফজল শাহাবুদ্দীনকে। যাকে আমি হৃদয়ের বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।

www.pathagar.com

তখন আমি দেশের রাষ্ট্রপতি। একজন রাষ্ট্রপতি কবিতা নিয়ে ভাববেন– আমার পূর্বে তা ছিলো অবাস্তব বিষয়। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম। সেটা দোষের ছিলো নাকি ভালো একটা উদ্যোগ ছিলো– তার বিচার-বিশ্লেষণ হয়তো এখন করা হবে না। কারণ এখনো আমি বেঁচে আছি। যখন থাকবো না, তখন হয়তো কোনো কবির কলমের আঁচড়ে উচ্চারিত হবে– কবিতা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যে কোনো রন্ধ্রে প্রবেশ করতে পারে। কবিতার দ্বার সব জায়গাতে উন্মুক্ত। সে রাজআসনেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আবার দরিদ্রের পর্ণ কুটিরেও বাসা বাঁধতে পারে। একজন ছোট্ট কবি রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার কবিতাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তাতে কবিতার মর্যাদা বেড়েছে– কবি রাষ্ট্রীয় অতিথি হবার সম্মান পেয়েছেন। এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে গিয়ে আমি যে লাভবান হয়েছি– তারই দৃষ্টান্ত ফজলের সাথে আমার বন্ধুত্ব।

'বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্রের' মাধ্যমে ফজল শাহাবুদ্দীনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। ও ছিলো কবিতা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক। সেই কবিতা কেন্দ্রের উপহারই একজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ফজল শাহাবুদ্দীন। কবিতা কেন্দ্র আজ নেই। আছে ফজলের সাথে আমার বন্ধুত্ব। সেটাই আমার অনেক বড় অর্জন। তবুও কবিতা কেন্দ্র এখনো আমাকে আবেগতাড়িত করে। এই কবিতা কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে দুইবার এশীয় কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফজল ছিলো সেই কবিতা উৎসবের প্রধান সম্পাদক। ১৯৮৭ সালে এবং ১৯৮৯ সালে এশীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বরেণ্য কবিগণ এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। তারা আমাদের দেশের কবিতা চর্চা নিয়ে একটা সু-উচ্চ ধারণা নিয়ে গেছেন। তারা অভিভূত হয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাব্য সাহিত্যের চর্চা হয়– কবিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান হয়! উৎসবে যোগদানকারী এশীয় কবিরা বাংলাদেশের কবিদের বার্তা নিয়ে গেছেন নিজ নিজ দেশে। আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম– আমাদের শিল্প-কলা-কাব্য সংস্কৃতির অনেক উঁচুতে। আমাদের সংস্কৃতির রয়েছে হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস। কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা তারই ধারাবাহিকতা বয়ে নিতে চাই। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যারা শিল্প-অর্থনীতিতে অনেক বেশি অগ্রসর। অথচ তাদের সংস্কৃতির কোনো ইতিহাস-ঐতিহ্য নেই। এশিয়ার দুই সমৃদ্ধ দেশ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া। কিন্তু তাদের কোনো সংস্কৃতির ইতিহাস নেই। তাদের নিজস্ব ভাষায় কোনো কবিতা-কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়নি। তাদের মাতৃভাষাকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সব দিক থেকে আমরা অনেক বেশি ধনী। আমাদের নিজস্ব ভাষার সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। সেই ভাষায় কবিতা-গল্প-উপন্যাস রচিত হয়। আমাদের মুখের ভাষায় রচিত গ্রন্থ নোবেল পুরস্কার লাভ করে। সেই ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে রাখা এবং সেই ভাষার কবিতার কথা বিশ্বের দেশে দেশে পৌঁছে দেয়ার যে বাসনা

www.pathagar.com

আমার হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিলো– ফজলের মতো কবির মনে তারই সুর ঝঙ্কারিত হয়েছিলো বলেই তার একান্ত প্রচেষ্টায় আমরা ঢাকায় এশীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন করতে পেরেছিলাম। এই উৎসবের সফলতার জন্য আমি আরো অনেক কবির কথা স্মরণ করি। তাদের প্রত্যেকের অবদান আমার কাছে কবিতার জগতে এক একটি ইতিহাস। সবার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই না। ফজলের জন্মদিনকে সামনে রেখে আজ শুধু তার কথাই বলবো– শুধু তাকে নিয়েই ভাববো।

মনে পড়ে– এশীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন করেও আমি কিন্তু সমালোচনার জটা-জাল থেকে মুক্ত থাকতে পারিনি। ফজল শাহাবুদ্দীনও নয়। ওরা 'দালাল কবি' আখ্যায়িত হয়েছে– আমাদেরই কিছু কবি বন্ধুর মুখে। দেশের সব কবিকে আমি এশীয় কবিতা উৎসবে সম্পৃক্ত করতে পারিনি। কবি ও কবিতাকেও রাজনীতির কুটিলতার চক্রে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো। যারা এশীয় কবিদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন তাদের বলা হয়েছিলো– 'রাজসভা কবি'। আরো অনেক নেতিবাচক বিশেষণে তাদের ভূষিত করা হয়েছিলো। আর যারা উৎসবে যোগদান করেননি তারা নিজেদের বিরোধী কবি হিসেবে পরিচিত করেছিলেন। আজ তাদের কাছে বড় জানতে ইচ্ছে করে– সেদিন এশীয় কবিতা উৎসব বর্জন করে আপনারা কতোটুকু কী অর্জন করতে পেরেছিলেন? দেশের সকল কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে চেয়ে আমি কী অন্যায় করেছিলাম? সেদিন যদি কবিতা কেন্দ্রের উৎসবকে সর্বজনীনভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে পারতাম এবং আমার পদক্ষেপকে ধারাবাহিক জাতীয় উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হতো– তাহলে তো এখনো দুই বছর অন্তর সেইভাবে উৎসব পালিত হতে পারতো। বন্ধু ফজল নিশ্চয়ই আমার মতো ব্যথিত যে– আমার পরে আর কোনো সরকার সেই ধরনের কোনো উৎসবের কথা ভাবেনি। সেদিন যেসব কবিরা কবিতা কেন্দ্রের আয়োজনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের উদ্যোগেও পরবর্তীতে যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোনো কবি সম্মেলন বা কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো– তাহলেও খুশি হতাম। ভাবতাম– কবিদের নিয়ে তো জাতীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে– হোক তা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কবির মর্যাদা স্বীকৃতি পাচ্ছে– এটাই বা কম কিসে?

আমি যখন কবিতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি তখন আমার সুদিন ছিলো। অর্থাৎ আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলাম। সাধারণত বলা হয়– সুযোগ-সুবিধার লোভেই অনেকে সরকারের কাছে ঘেঁষতে চায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা হয়তো ঠিক। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। অনেকে দেশ জাতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্যাণ সাধনের জন্য সরকারের সান্নিধ্য নিয়ে কাজ করতে চান। কবিতা কেন্দ্রের সাথে জড়িত হবার মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির কোনো যোগ ছিলো না। এখানে ছিলো শুধু কবিতার চর্চা এবং কবির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়। ফজল শাহাবুদ্দীন সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে এসেছিলেন। সে আমার বন্ধুত্বকে বরণ করেছিলো হয়তো কবিতাকে

www.pathagar.com

ভালোবেসেই। কারণ ও বুঝেছিলো– আমি কবিতাকে ভালো না বাসলে এসব উদ্যোগ গ্রহণ করতাম না। আর ফজল তো নামকরা কবি। একজন কবি তার কবিতাকে কতোখানি ভালোবাসেন– তা তো আমি নিজের উপলব্ধি থেকেই বুঝি। ফজল আর আমার মিলিত ভালোবাসা দিয়ে এ দেশকে কবিতার মতো ছন্দময় করে তুলতে চেয়েছিলাম। কবিতায় হয়তো পেট ভরে না– কিন্তু মন ভরে। কবিতায় স্বাধীনতার সুর থাকে– যা স্বাধীনতা অর্জনে প্রেরণা যোগায়। কবিতা অর্থ দিতে পারে না– কিন্তু একটি জাতিকে গড়ে দিতে পারে। কবিতা দেশপ্রেম শেখাতে পারে– মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচার শিক্ষা দিতে পারে। সেই লক্ষ্যে আমরা দু'জন একত্রে কাজ শুরু করেছিলাম। ফজলের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো প্রত্যাশার চিহ্ন খুঁজে পাইনি। ওকে শুধু ভালোবাসা দিয়েছি– ও শুধু সেই ভালোবাসা আকণ্ঠ পান করেছে– আর কিছু পেতে চায়নি কখনো।

আগেই বলেছি– এক সুদিনে ফজলের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুর্দিনেও সে আমাকে ভোলেনি। সুদিনে আর দুর্দিনে যে সব সময় পাশে থাকে সেই তো প্রকৃত বন্ধু। এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছে ফজল শাহাবুদ্দীন। আমি যখন কারাগারে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছি, ফজল তখন মুক্ত জীবনে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি– ওর হাত-পা হয়তো খোলা ছিলো, তবে মনটা তার বন্দি ছিলো। ওর হাতে কলম ছিলো– সেই কলম দিয়ে একজন কবিকে বন্দি রাখার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সেই প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে তার কবিতায়। সে একটি কবিতা লিখে পোস্টার করেছিলো। সেই কবিতায় ফজল শাহাবুদ্দীন বলেছে–

মানুষ তোমার ভালোবাসা ছিলো
ভালোবাসা ছিলো নদী
তুমি জেনেছিলে বেঁচে থাকা এক
ভালোবাসা নিরবধি

তুমি জেনেছিলে ভালোবাসা এক
আকুল আগামীকাল
ভালোবাসা এক চির বিজয়ের
হাতিয়ার সুবিশাল

ভালোবাসো তুমি স্বদেশের ডাক
ভালোবাসো বাঙলারে
তোমার হৃদয় সারা দেশ জুড়ে
তুমি আছো কারাগারে

www.pathagar.com

আমার অফিস কক্ষে সেই পোস্টারটি অতি যত্নের সাথে বাঁধাই করে রেখেছি। সেই পোস্টারটি শুধু আমার দেয়ালে রাখিনি, রেখেছি আমার অন্তরেও। ওটা শুধু পোস্টার নয়, বন্ধুত্বের প্রতীক। একজন কবির অবস্থান থেকে তার প্রতিবাদের দলিল। আমি মনের দামে ফজলের মন কিনেছি– হয়তো তাই ও আমাকে এরকম একটি প্রতিদান দিয়েছে। শুধু এখানেই নয়– ও আমার দুঃখের সময়ে আরো এগিয়ে এসেছে। ফজলের কবিতা আমার মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিলো– কিন্তু ঠিক তার চার বছর পর আবার নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা আমাকে জেলে নিয়ে গেলো। সেবার জেলে প্রবেশের ঠিক আগের দিন নিদারুণ কঠিন সময় কাটাচ্ছিলাম। পরের দিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হবে– বন্দি যন্ত্রণা আমাকে প্রতিনিয়ত কষাঘাত করবে। মুক্ত সময়ে বসে সেই জীবনের ছবি আঁকছিলাম। বারিধারার ৮ নম্বর রোডের অফিসে বসে– আমার অবর্তমানের দলীয় কিছু কাজের বিবরণী ঠিক করে রাখছিলাম। তখন রাত প্রায় ১০টা হবে। অফিসের ২/৩ জন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ ছিলো না আমার কাছে। এমন সময় ফজল এলো আমার মনের কষ্টের কিছু অংশ কেড়ে নিতে। আজো ভুলিনি সেই সময়টার কথা।

ফজল আর আমি পরস্পরকে 'তুমি' সম্বোধন করি। এটা অবশ্য আমারই প্রস্তাব। ওকে তখনই না করে দিয়েছি– বন্ধুত্বের মাঝে কোনো রাষ্ট্রপতি থাকতে পারে না। তাই লেখার মাঝেও কোথাও 'আপনি' সূচক কোনো প্রত্যয় ব্যবহার করিনি। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে– ফজলের মতো একজন কবি আমার বন্ধু। ও তো বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। যতোদিন বাংলাদেশ থাকবে– বাংলা ভাষা থাকবে– ততোদিনই তো ফজলের কবিতা অমর হয়ে থাকবে। কবিতায় মুসলিম কবিদের আবির্ভাব খুব বেশি সুপ্রাচীন নয়। অবশ্য মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পরই এখানে মুসলিম কৃষ্টি-কালচার গড়ে উঠতে থাকে। কবি আলাওল ও কায়কোবাদের পথ ধরেই বাংলায় মুসলিম কবিদের যাত্রা শুরু। এখন ফজল শাহাবুদ্দীনের মতো মেধাবী কবিরা বাংলার কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতার সংখ্যা কতো হবে? নিশ্চয়ই হাজারের অনেক উর্ধ্বে। আমি অবাক হই এতো অদ্ভুত কবিতা ও কী করে লেখে। ফজলের "আমার কবিতা" নামের কবিতা সমগ্র গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯৬। সেই কাব্যগ্রন্থে ফজল লিখেছে, তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র অমিত তাকে একদিন প্রশ্ন করেছে– 'কেমন করে কবিতা লেখ তুমি?' ওকে আমারও একই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে– ফজল তুমি কেমন করে এত সুন্দর কবিতা লেখ? ও হয়তো উত্তর দেবে– তুমি যেভাবে লেখো, সেভাবেই। কিন্তু আমি যে জানি একজনের ভাব আর একজনের মতো হতে পারে না। ওর লেখার ভাবটা আমার জানতে বড় ইচ্ছা হয়।

www.pathagar.com

ফজলের জন্মদিনকে সামনে রেখেই ওর সম্পর্কে এতো সব কথার মালা গাঁথা। একবার ওর জন্মদিন উপলক্ষে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেই কবিতাটি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

কবিকে তার জন্মদিনে
একজন কবি
মানুষকে ভালোবাসা শেখায়
প্রকৃতির মধ্যে মিশে যেতে শেখায়।

একজন কবি
জীবন জগত অনুভূতি আবেদনে
আগ্রহী হতে সাহায্য করে। নিয়ে যায়
হাসি-কান্নার গভীরতায়।

একজন কবি
প্রেম ভালোবাসার বাণী
অন্তরে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

একজন কবি
ফুল পাখি গান ক্ষেত ফসল
চেনাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

একজন কবি
ঘৃণার বদলে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায়
সাহায্য করে যুদ্ধের জায়গায়
শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়।

হে কবি তোমার জন্মদিনে
তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করি–
তোমার মাঝে খুঁজে পাই প্রেম প্রীতি ভালোবাসা
জীবন-জগত অনন্ত অসীম,
তুমি ভালো থেকো– ভালোবাসা দিয়ে
আমাদের ভরিয়ে রাখো।

ফজলের জন্মদিনে ওর লেখা একটি কবিতা উদ্ধৃত না করে পারছি না। জন্মদিন নিয়ে ওর লেখা সেই কবিতাটি আমার ভালো লাগা কবিতার মধ্যে

www.pathagar.com

অন্যতম একটি। সেই কবিতার শিরোনাম 'আমার ত্রিশলক্ষতম জন্মদিন'। অনেক দীর্ঘ সেই কবিতার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই।

'আজ আমার ত্রিশলক্ষতম জন্মদিন।
আমি আজো বেঁচে আছি
এবং বেঁচে থাকবো চিরকাল।

কেননা, আমার একমাত্র মৃত্যুকে
আমি অতিক্রম ক'রে এসেছি দীর্ঘদিন
শত শত বছর আগে, হাজার হাজার বছর আগে।

সেই মৃত্যুকে আমি অতিক্রম ক'রে এসেছি
বহুদিন বহু শতাব্দী আগে

যে মৃত্যু আমার শরীরকে আলাদা করেছে
আমার চিরদিনের জাগতিক অস্তিত্ব থেকে
যে মৃত্যু কেড়ে নিয়েছে আমার রক্তমাংসের
নিয়ত প্রবল চিৎকার
যে মৃত্যু আমার ক্ষুধাকে হরণ করেছে
আমার তৃষ্ণা আমার কাম
আমার যৌবন আমার বার্ধক্যকে দিয়েছে
এক অবিনশ্বর সমাপ্তি
আমি সেই মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে এসেছি
দীর্ঘদিন
আমার একমাত্র রক্তমাংসময় মৃত্যু
আমার একান্ত আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত মৃত্যু
আমার অবিশ্বাস্য বেদনাভারাক্রান্ত মৃত্যু
দীর্ঘকাল গত

আজ আমার ত্রিশলক্ষতম জন্মদিন
আমি আজো বেঁচে আছি
এবং বেঁচে থাকবো চিরকাল
পৃথিবীর মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে . . .'

ফজল যে ভাব নিয়ে এই কবিতাটি লিখেছে তার গভীরে আমি যেতে চাই না। আমি সহজ ভাষায় বুঝতে চাই–ফজলের জন্মদিনের কথা। 'ত্রিশ লাখ'

www.pathagar.com

শব্দটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি প্রবাদ প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আমার কাছে ফজলের জন্মদিনটাও একটি প্রবাদ দিবসের মতো। আমার কামনা– ৪ ফেব্রুয়ারিকে পরিচয় করিয়ে দেবে ফজলের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চরল এখানে স্মরণ করি– 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসে আমার কবিতাখানি.....'। আমি আজ সেইভাবে চেয়ে আছি এখন থেকে শতবর্ষ সামনে একটি ৪ঠা ফেব্রুয়ারির দিকে– সেদিন যেনো এদেশের কবিতাপ্রেমীরা পালন করে আমার বন্ধু কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের আড়ম্বরপূর্ণ জন্মদিন।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে অম্লান মাওলানা মান্নান

তখন আমি সৌদি আরবে। সৌদি বাদশার অতিথি হিসেবে রাজকীয় অতিথিশালায় অবস্থান করছি। শারীরিক অবস্থা চেক-আপের জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর আমাকে রিয়াদে কিং ফয়সাল হাসপাতালে যেতে হয়। সৌদি সরকারের বদান্যতায় চিকিৎসা বা চেকআপের এই সুযোগটুকু পাই। মধ্যপ্রাচ্য তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে আমার গড়া সুসম্পর্কের কথা সৌদিরা স্মরণ করে। বিশেষ করে কুয়েত যুদ্ধের সময় সৌদিতে বাংলাদেশের সৈন্য প্রেরণের কথা ওরা ভুলে যায়নি। শুধু সরকারই নয়, সৌদির সাধারণ মানুষেরাও আমাকে মনে রেখেছে। সৌদিতে সফরকালে কোনো বাজারে গেলে বা দোকানে কোনো কিছু কেনা-কাটার জন্য ঢুকলে ওরা চিনে ফেলে। সৌদিতে বাংলাদেশী সৈন্য প্রেরণের কথা স্মরণ করে। কিছু কেনা-কাটা করলে আমার কাছ থেকে দাম নিতে চায় না। আমাকে 'রইস এরশাদ' বলে সম্বোধন করে। রইস মানে রাজা। ওরা আরবিতে যা বলে তার অর্থ হলো– 'তুমি আমাদের দেশের জন্য যা করেছো তা আমাদের মনে আছে। তোমার কাছ থেকে কোনো জিনিসের দাম নিতে পারি না। তোমার যা প্রয়োজন নিয়ে যাও।' এসব কথা শুনে বিগলিত হই– মুগ্ধ হয়ে যাই ওদের কৃতজ্ঞতায়। সেদিন মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে বাংলাদেশের সৈন্য প্রেরণ করেছিলাম বলে সৌদিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের সম্মান এবং কদর অনেক ঊর্ধ্বে। বাংলাদেশের জনশক্তি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারছে। সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক সেখানে নিয়োগ করছে। জনশক্তি খাতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসছে সৌদি থেকে। এসবই সম্ভব হয়েছে আমার একটি সিদ্ধান্ত থেকে। অথচ দেশে সেদিন তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কেনো আমি সৌদি আরবে সৈন্য পাঠাচ্ছি। তার প্রতিবাদে সকল বিরোধী দল মিলে হরতাল করলো। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস– সেদিন যারা সৌদিতে সৈন্য প্রেরণের বিরোধিতা করেছিলেন, তারাই এখন সেই পদক্ষেপের সুফল ভোগ করছেন। সৌদিতে গেলে ওইসব স্মৃতিকথা খুব মনে পড়ে। অসম্ভব ভালো লাগে সৌদি সফরে। পবিত্র মাটির পরশে দেহ-মনকে শুদ্ধ করে নেয়ার আনন্দ তো আছেই– সেই সাথে আরবীয়দের ভালোবাসাতেও সিক্ত হয়ে যাই।

সৌদি সফরের প্রতিদিনের মতো ৬ ফেব্রুয়ারি-০৬ তারিখের সকালটাও মধুর আতিথেয়তার অনুভূতি উপভোগ করছিলাম। এমন সময় ঢাকা থেকে ফোন

www.pathagar.com

পেলাম। আমার একান্ত সচিব খালেদের টেলিফোন। ও জানালো– মাওলানা মান্নান আর নেই। গতরাতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হৃদয়বিদারক খবর। খানিকটা সময়ের জন্য আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ভাবতেই পারছিলাম না মাওলানা মান্নান আর নেই! জানালা পথে আমার দৃষ্টি চলে গেলো আকাশের দিকে, শূন্য-মহাশূন্যতা যেখানে অবিরত ঘোষণা করে– একদিন সকলেই এমনিভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। ইহলোকে মাওলানা মান্নানের জীবনের অস্তিত্ব আজ শূন্য। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি আর অসংখ্য অমর কীর্তি। সেই স্মৃতি আমাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো। মাওলানা মান্নানের ইন্তেকাল সম্পর্কিত বিস্তারিত খবর জেনে নিলাম। সৌদি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে একটি শোকবার্তার কথা জানালাম আমার প্রেস সচিব সুনীলকে। ওকে বললাম– আমার শোকবাণীটা পত্রিকা অফিসে পৌঁছে দিতে।

সেই শোকবাণীতে মনের শোকের উপশম হচ্ছিলো না। হৃদয়ের মাঝে জমে থাকা মাওলানার স্মৃতিগুলো আমাকে দারুণভাবে পীড়া দিচ্ছিলো। এর আগে দেশের আর এক বরেণ্য রাজনীতিবিদ, আমার অনেক দিনের সহকর্মী মিজানুর রহমান চৌধুরীও চলে গেছেন। এসব চির-বিদায় আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো। মিজান চৌধুরীর শোক ভুলতে না ভুলতেই মাওলানা মান্নানও জান্নাতের পথে পা বাড়ালেন। মাওলানা অনেক দিন ধরেই শয্যাশায়ী ছিলেন। জীবন আর মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবধারিত পথেই তাকে পা বাড়াতে হলো। অখণ্ড মহাকালের কোলে নশ্বর জীবন প্রতিনিয়ত শেষ হয়ে যাবার পথে অগ্রসর হতেই থাকে। সেই সারা হবার অনিবার্যতা জেনেও মানুষ সৃষ্টির উৎসবে মেতে থাকে। সেটাই হয়তো পরওয়ারদিগারের ইচ্ছা। তা না হলে তার সৃষ্টি হয়তো আরো সুন্দরের দিকে ধাবিত হতো না। মাওলানা মান্নানও জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে অনেক অমর কীর্তি সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিলেন। সব কথা যদি বাদও দেই– একটি কীর্তিই হয়তো তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে যাবে। আর তা হলো মাওলানা মান্নান তাঁর নিজ খরচে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোককে হজ করতে পাঠিয়েছেন। আর কোনো দিল-দরিয়া মানুষ এটা করতে পেরেছেন কিনা জানি না– তবে মাওলানা মান্নানের এই কীর্তি নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার রেকর্ড বুকে স্থান পেয়েছে।

মাওলানা মান্নানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ক্ষমতা গ্রহণের পর। তার আগে তিনি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা একজন পীর ছিলেন। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে তাঁর মাজার আছে। মাওলানা মান্নানের সাথে একবার মাজার জিয়ারত করে এসেছি। মান্নান সাহেবের সাথে পরিচয়ের পর থেকেই তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা এবং আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। তাঁর ইসলামী শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করে। আমি সেই প্রথম পরিচয় থেকেই উপলব্ধি করেছিলাম যে, ইসলামের সেবায় তাঁর মতো লোকের সহযোগিতা ও পরামর্শ আমার প্রয়োজন হবে। মাওলানা মান্নান আমার দলে

www.pathagar.com

এলেন। আমার দল থেকে এমপি নির্বাচিত হলেন। আমি তাকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত করলাম। সঠিক কাজের জন্য উপযুক্ত লোক যাচাই-বাছাই-এ আমার যে ভুল হয় না, মাওলানা মান্নান তার উদাহরণ।

আমি ক্ষমতায় থাকাকালে যে সব উন্নয়ন, সংস্কার ও সেবামূলক কাজ করেছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্মীয় পদক্ষেপসমূহ। আমি ইসলামের সেবায় বেশ কিছু কাজ করেছি। সেগুলো আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলে আমি মনে করি। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারলে ওই কাজগুলো করা আমার পক্ষে কোনো দিন সম্ভব ছিল না। হয়তো আল্লাহ এই দায়িত্ব পালনের জন্যই আমার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। আর তাই আমি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা, জুমার দিনকে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণাসহ অসংখ্য ধর্মীয় সেবামূলক কাজ করতে পেরেছিলাম। আজ মাওলানা মান্নানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সে সব কাজের কথাগুলো স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠছে। কারণ এই কাজগুলো করার আগে ধর্মমন্ত্রী হিসেবে আমি মাওলানা মান্নানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিতাম। তিনি আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইসলামী ধারায় ব্যাখ্যা দিতেন। তাঁর ব্যাখ্যায় আমি আরো অনুপ্রাণিত হতাম। ধর্মীয় কাজ সম্পাদনে বেশি উদ্যোগী ও উদ্যমী হতাম। আমি ইসলামের সেবায় যে সব কাজ করেছি– তার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। মসজিদ নির্মাণ একজন মুসলমানের জন্য পবিত্র কাজ। সেই ভাবাদর্শে আমি নিউমার্কেটে মসজিদ, সাভারে স্মৃতিসৌধ মসজিদ, পিডব্লিউডি মসজিদ, গোলাপ শাহ মসজিদ, বেইলি রোডে অফিসার্স ক্লাব মসজিদ নির্মাণ করেছি। মাওলানা মান্নানের একান্ত চেষ্টায় মহাখালীতে নির্মাণ করেছি গাউসুল আযম মসজিদ। এছাড়া জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, কাওরান বাজার শাহী মসজিদ, লালবাগ কেল্লার মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ, লালবাগ জামে মসজিদ মিনার, দিলকুশা জামে মসজিদ এবং ঢাকা চট্টগ্রামসহ দেশের বহু স্থানে অনেক মসজিদ সংস্কার ও উন্নয়ন করেছি। আমিই বায়তুল মোকাররম মসজিদকে জাতীয় মসজিদ ঘোষণা করেছি। ইচ্ছা ও উদ্যোগ নিলে যেকোনো মহৎ কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই মসজিদের নকশা প্রণয়ন করেছিলেন প্রখ্যাত স্থপতি আবুল হোসেন থাইরানি। এর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর ছেলে টি. থাইরানি। স্পেনের একটি বিখ্যাত মসজিদের ধারণার সাথে মিল রেখে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছিলো। এই মসজিদের পুরো প্রকল্পটি ৮ দশমিক ৩০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু মূল নকশা অনুযায়ী এই মসজিদের অনেক কাজ অসমাপ্ত ছিলো। আমি ক্ষমতায় এসে মসজিদটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এর জন্য ৩ কোটি টাকার অনুদান সংগ্রহ করেছিলাম ওআইসি থেকে। বাকি ২৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম সরকারি তহবিল থেকে। ফলে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে নির্মিত হয়েছে দৃষ্টিনন্দন জাতীয় মসজিদ।

www.pathagar.com

আমি প্রায়ই মাওলানা মান্নানকে বলতাম– ইসলামের সেবায় যা কিছু করা যায় সে ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দেবেন। তিনি সেই কাজটি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে সম্পাদন করতেন। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি প্রথমবারের মতো ১৯৮৫ সালে দাখিলকে এসএসসি সমমান এবং ১৯৮৭ সালে আলিম শ্রেণীকে এইচএসসি সমমান ঘোষণা করেছি। ১৯৮৯ সালের ১০ জুন তারিখে মাওলানা মান্নান গাউসুল আযম কমপ্লেক্সে আমার সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। মাওলানা ছিলেন ওই সভার সভাপতি। সে দিন আমি অভিভূত হয়েছিলাম ওই মসজিদ কমপ্লেক্সটি দেখে। কমপ্লেক্সের জায়গা বরাদ্দ করেছিলাম আমি আর নির্মাণ ব্যয়ের অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। তবে এই মসজিদ এবং কমপ্লেক্স নির্ধারণের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন মাওলানা মান্নান। তিনি উদ্যোগী না হলে ওখানে এই পবিত্র মসজিদটি হয়তো নির্মিত হতো না। তবে সব কিছু তো আল্লাহর ইচ্ছা। এখানে মাওলানা মান্নান ছিলেন উপলক্ষ। আল্লাহ তাঁর মহতী লক্ষ্য সফল করেছেন। আজ তিনি সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁর কবর জিয়ারত করতে গিয়ে মনে পড়েছে– এখানেই মাওলানার সংবর্ধনা নিতে এসে ঘোষণা করেছিলাম– 'মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় অথবা আমার প্রিয় মাদ্রাসা শিক্ষকদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করার মতো কিছু হলে তা বাতিল করা হবে'। আমিই ১৯৮৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর শ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অনুদান দেয়ার ঘোষণা করেছিলাম। আমি সকল সমালোচনা ও বিরোধিতা পেছনে রেখে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছি। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন রাত ৮টা ১২ মিনিটে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত অষ্টম সংশোধনী বিল ২৫৪-০ ভোটে পাস হয়। তার দুই দিন পর আমি রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিলে সম্মতি প্রদান করি। ১৯৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সূত্রাপুর জামে মসজিদে মুসল্লিদের উদ্দেশে বলেছিলাম– 'ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করায় আজ আমরা জাতীয় সত্তা লাভ করেছি।' সেদিনও মাওলানা মান্নান আমার সাথে ছিলেন। ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশবলে আমি যাকাত ফান্ড গঠন করেছিলাম। এই ফান্ড গঠনের পর বেশ কয়েকটি কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আমি ১৯৮৩ সালে ১১টি মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মসূচি ইসলামিক মিশনের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। আমি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বীনিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলাম।

কোনো স্থানে মসজিদ গড়ে ওঠার পর এলাকার জনগণই নিজেদের অর্থ দিয়ে ইমাম, মুয়াজ্জিনদের বেতন-ভাতাদিসহ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ এমনকি পানি ও বিদ্যুতের বিলসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতো। আমি ১৯৮৩ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় ইসলামী মহাসম্মেলনে দেশের সকল মসজিদের পানি ও বিদ্যুতের বিল মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। সেই সাথে দেশের প্রায়

www.pathagar.com

আড়াই লাখ মসজিদের ৫ লাখ ইমামের জন্য মাসিক ২০০ টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলাম। হাইকোর্টের সামনে মজা পুকুরটি ভরে সেখানে জাতীয় ঈদগাহ আল্লাহর ইচ্ছায় আমিই গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, রেডিও-টিভিতে আজান প্রচারের ব্যবস্থাও আমার উদ্যোগে হয়েছিলো। আজ মাওলানা মান্নানের কথাগুলো যখন অতি যত্নের সাথে স্মরণ করছি তখন ইসলামের সেবায় আমার প্রচেষ্টার এসব কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি আমাকে একবার শর্শিনায় পীর সাহেবের দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের সাথে ছিলেন বাংলাদেশে সফররত ইরাকের উপ-রাষ্ট্রপতি। শর্শিনায় বিশাল সমাবেশ হয়েছিলো। ওখানেই আমি রেডক্রসের নাম বদল করে রেডক্রিসেন্ট করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। এই নাম বদলের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মাওলানা মান্নান আমাকে যথার্থ ধারণা দিয়েছিলেন। এবার সৌদি থেকে ফিরে ওই দিনই দক্ষিণবঙ্গে রাজনৈতিক সফরে গিয়েছিলাম। লঞ্চে শর্শিনার পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই স্মৃতি মনে পড়েছিলো। ফেরার পথে শর্শিনার পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করেছি। সেখানে গিয়ে মনে পড়লো– যার সাথে প্রথম এখানে এসেছিলাম ঢাকায় ফিরে তাঁর কবরও জিয়ারত করতে হবে। এই তো জীবনের পরিণতি!

মাওলানা মান্নানের আরো একটি অবদানের কথা আমি ভুলতে পারি না। সাধারণের মধ্যে একটি ধারণা ছিল যে, পরিবার পরিকল্পনা একটি ইসলামবিরোধী কাজ। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে এই পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন– পরিবার পরিকল্পনা ইসলামের বিরোধী নয়। ধর্মমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মতো ওলামায়ের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য আলেম ওলামা ও মসজিদের ইমামগণ পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে জনগণকে বুঝিয়েছেন। তাতে মানুষ সচেতন হয়েছে। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কেউ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। আর সে কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আমি সফল হয়েছিলাম। এই সাফল্যের জন্য আমি জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছি।

মাওলানা মান্নান একবার চাঁদপুরে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন– পত্র-পত্রিকা আপনার খবর সঠিকভাবে প্রচার করে না। আমি একটা পত্রিকা প্রকাশ করবো– সেখানে আপনার খবর সঠিকভাবে তুলে ধরবো। জনসভায় দাঁড়িয়েও তিনি পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা দিলেন। সত্যি সত্যি মাওলানা মান্নান তাই করলেন। তিনি প্রকাশ করলেন দৈনিক ইনকিলাব। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে ইনকিলাব প্রতিষ্ঠাও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। তাঁর সুযোগ্য সন্তান এ এম এম বাহাউদ্দীন আজ ইনকিলাবের কর্ণধার, সুদক্ষ সম্পাদক। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব এখন তাঁর। মাদ্রাসা সংগঠনকে তাকেই এগিয়ে নিতে হবে। মাদ্রাসার উপর বারবার আঘাত আসে। দেশে জঙ্গি তৎপরতা

www.pathagar.com

শুরু হলে তখনও মাদ্রাসার উপর ঢালাওভাবে দোষ চাপানো হয়েছিলো। মাওলানা মান্নান শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করতে পারেননি। আমি সোচ্চার হয়েছিলাম। বলেছি– দরিদ্র মানুষের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার্জনের প্রতিষ্ঠানের উপর ঢালাওভাবে দোষ চাপাবেন না। যারা দু'বেলা ঠিকমতো খেতেও পায় না, মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় যাদের চলতে হয়– তারা কোনো ধরনের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হতে পারে না।

মাওলানা যখন শয্যাশায়ী তখন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছি। কষ্ট পেয়েছি তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে। চিকিৎসার জন্য বাহাউদ্দীন তাকে বিদেশেও নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ওপারের ডাক যদি আসে– কে তারে ধরে রাখতে পারে! আমার দুর্ভাগ্য মাওলানা মান্নানের জানাজা কিংবা কুলখানি কোনোটাতেই শরিক হতে পারিনি বিদেশে ছিলাম বলে। তাঁর কবর জিয়ারত করতে গিয়ে আরো কতো কথা মনে পড়লো। যতোবার মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছি– প্রত্যেকবার মাওলানা মান্নান আমার সাথে ছিলেন। মাতৃভাষার মতো আরবিতে কথা বলতে পারতেন তিনি। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে সাক্ষাতের সময় মাওলানা মান্নান দো-ভাষীর কাজ করতেন। আমার কথা আরবিতে ভাষান্তর করে দিতেন। গভীর সম্পর্ক ছিলো তাঁর সাদ্দাম হোসেনের সাথে। আজ যদি সাদ্দাম হোসেন মুক্ত থাকতেন তাহলে মাওলানা মান্নানের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি অবশ্যই বাংলাদেশে আসতেন বলে আমার বিশ্বাস। চিরতরে হারিয়ে গেলেন মাওলানা মান্নানের মতো একজন আলেম। তাঁর মতো ইসলাম-দরদি মানুষের অভাব এদেশে আর পূরণ হবে কিনা জানি না। এভাবেই একদিন চলে যেতে হবে সবাইকে। আমিও থাকবো না। তবে যতোদিন বেঁচে আছি, ততোদিন ইসলামের সেবায় মাওলানা মান্নানের অমর অবদান আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের আদিকাল থেকে আজকের 'সমকাল'

'অ্যাকটা ডায়ারনা' থেকে শুরু করতে চাই না। সেটা হবে দীর্ঘ ইতিহাস। 'দিকদর্শন' কিংবা 'সমাচার দর্পণ' থেকে 'সমকাল'। মাঝখানে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের নদীসমূহে গড়িয়ে গেছে অনেক পানি। গুটেনবার্গের -১৩৯৭-১৪৬৮ খ্রিঃ) আবিষ্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র থেকে সিসার টাইপ কিংবা কাঠের ওপর খোদাই করা হরফে ছাপা হওয়া সংবাদপত্র দীর্ঘ পথ সাঁতার দিয়ে আজ বিশ্বের বিস্ময় কম্পিউটার জগতে প্রবেশ করেছে। সংবাদপত্রের আদি বা মধ্যযুগে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবা যায়নি অথবা কল্পনায়ও স্থান পাওয়া যা অসম্ভব ছিলো– পত্র পত্রিকা জগতে আজ সেই যুগ এসেছে। জানি না এখান থেকে সংবাদপত্র আর কতদূর অগ্রসর হবে। হয়তো এমনও দিন আসবে যখন সংবাদপত্র ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট মাড়িয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা মোবাইল সেটের পর্দায় দেখা যাবে। এখনো যে তা পাওয়া যায় না তা নয়– তাজা খবর মোবাইল টেলিফোন সেটের মাধ্যমে শোনা যায়। অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংবাদপত্র আরো আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশ করুক সেই আশায় থেকে আজ এখানে বর্তমানকে নিয়ে কিছু কথা বলি আর অতীতকে নিয়ে খানিকটা স্মৃতিচারণ করি।

আমার এই কথাগুলো যখন একটি আধুনিক ছাপার মেশিনে সাদা কাগজের উপর ছাপা হয়ে আসবে তখন সেই ছাপানো কাগজটি হবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পরিবারে নতুন অতিথি। তাকে সদ্য প্রসূত শিশুর সাথে তুলনা করতে যাবো না। কারণ এই অতিথি হবে সম্পূর্ণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত টগবগে যৌবনের সংবাদপত্র। সে জন্মেই ট্রাক এন্ড ফিল্ডে নামবে দ্রুততম হবার প্রতিযোগিতায়। অন্তত পূর্বায়োজন থেকেই তা আমার কাছে মনে হয়েছে। এই পত্রিকার সম্পাদক গোলাম সারওয়ার– যিনি স্বনামেই ধন্য। কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় প্রশংসা করে তাঁকে খাটো করতে চাই না। তিনি সংবাদপত্র শিল্পকে কতদূর এগিয়ে নিতে পারেন– তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। এই শিল্পে তার নতুন সংযোজন দৈনিক সমকাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন। অপূর্ব ছন্দের বাণীতে গাঁথা সেই চিঠি। সম্পাদক সাহেব আমার মতো একজন অনিয়মিত এবং নিছক শখের লেখকের কাছে তাঁর পত্রিকার উদ্বোধনী

www.pathagar.com

সংখ্যায় একটি লেখা চাইবেন– এটা ছিলো আমার জন্য অনেক সম্মানের, অনেক গৌরবের। সাধারণ একজন রাজনীতিবিদ কিংবা সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার কাছে মাঝে মধ্যে কোনো পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা বা বর্ষপূর্তি সংখ্যার জন্য শুভেচ্ছা বাণী চাওয়া হয়ে থাকে। আমি সে ক্ষেত্রে অভিনন্দন জানিয়ে সাফল্য-সমৃদ্ধি কামনা করি। এখানে ঠিক তা নয়। সমকালের জন্য একটি লেখা চাওয়া হয়েছে। ফলে এই দৈনিকটির কাছে অনেক প্রত্যাশার কথা বলার সুযোগ হলো। সমকালের যাত্রায় আমার অংশীদারিত্ব থাকলো– সমকালের সাথে একাত্ম হবার সুযোগ হলো। কিন্তু কী লেখা যায়? তাই ফিরে তাকাতে চাই সংবাদপত্রের অতীতের দিকে। কী প্রত্যাশা করা যায় সমকালের কাছে? সে জন্য দেখতে চাই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কেনো হয়েছিলো।

সংবাদপত্রের সেই আদি ইতিহাসের পাতাগুলো যদি উল্টিয়ে দেখতে যাই তাহলে দেখতে পাবো অভ্যুদয়ের সূচনাকাল থেকেই সংবাদপত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্রের নামই 'অ্যাকটা ডায়ারনা (Acta Diurna)।' সেখান থেকে শুরু করে আমি স্বল্প পরিসরে অগ্রসর হতে পারবো না। প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে কিছু কথা বলি। 'অ্যাকটা ডায়ারনা' যখন প্রকাশিত হয় তখন ছাপা মেশিনের উদ্ভব হয়নি। যীশুখৃষ্টের জন্মের আগেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। রোম নগরী সংবাদপত্রের প্রথম জন্মস্থান। বিশ্বখ্যাত রোমান রাষ্ট্রনায়ক জুলিয়াস সিজারই হলেন সংবাদপত্রের জনক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১০২ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ অব্দে ঘাতকের ছুরিকাঘাতে মারা যান। মৃত্যুর ৫ বছর পূর্বে তিনি 'অ্যাকটা ডায়ারনা' প্রকাশ শুরু করেন। এই নামটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'ঘটনা–বিবরণী'। প্রতিদিন হাতে লিখে এই দৈনিক কাগজটি প্রকাশ করা হতো। এই খবরের কাগজটি প্রতিদিন রোম নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের প্রাচীর বা স্তম্ভগাত্রে ঝুলিয়ে রাখা হতো। অসাধারণ প্রতিভাধর রাষ্ট্রনায়ক জুলিয়াস সিজার হয়তো অবাধ তথ্যপ্রবাহের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তা না হলে সেই যুগে তিনি তথ্যাবলী জনসমক্ষে উপস্থাপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাবেন কেনো। তার প্রকাশিত সংবাদপত্রে সামরিক, রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যাদির পাশাপাশি সিনেট বিতর্কের বিবরণ, সিনেটে প্রণীত আইনসমূহের ভাষ্য এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির খবর অ্যাকটা ডায়ারনায় প্রকাশিত হতো। সিজারের শাসনামলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত রোমান সিনেট তথা এক কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট ছিলো রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সিনেটর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই নির্বাচিত হতেন প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেনাপতিমণ্ডলী। দুঃখজনক ঘটনা যে, সেই যুগে সিজার এতোটাই গণতান্ত্রিকমনা হওয়া সত্ত্বেও সিনেট কক্ষেই ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। সিজার রেখে গেছেন অনেক ইতিহাস। তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তথ্য প্রচারের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে জনগণের ব্যাপক

www.pathagar.com

অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের সবকিছু জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই বাস্তব সত্যটি জুলিয়াস সিজার অনুধাবন করেই তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে সিজারের ধ্যান-ধারণার কথা চিন্তা করলে স্বাভাবিক কারণেই বিস্ময়বোধ করবো।

সংবাদপত্র যুগে যুগে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছে সেই অ্যাকটা ডায়ারনা থেকেই। ১৭৮৯ সালে বিশ্বকাঁপানো ফরাসী বিপ্লবকালেও সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম উদ্যোক্তাই ছিলেন সাংবাদিক কামি দামুলি (Camille Desmaulaims)। ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর সংবাদপত্র 'রিভ্যালিওশনস্ দ্য ফ্রাঁসে' এবং কিছুকাল পরে প্রকাশিত 'ট্রিবিউনে দে প্যাত্রিতেস' এর জ্বালাময়ী নিবন্ধমালা সম্রাট ষোড়শ লুই-এর অরাজক শাসন এবং গণনির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রথম জনমনে বিক্ষোভ ধূমায়িত করে তোলে। সংবাদপত্রের সোচ্চার ভূমিকার কারণেই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনতা ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই অবরোধ করে কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিলো সারা বিশ্বের পুরানো ঘুণে ধরা রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙার বিপ্লব। ইতিহাস বলে, যার মূলমন্ত্র ছিলো মানবিক সাম্য, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র। বলা যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন কলমযোদ্ধা সাংবাদিক কামি দামুলির আপোসহীন ভূমিকা এবং নিজ জাতির প্রতি তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধের কল্যাণেই তাঁর স্বদেশ ফ্রান্স পরবর্তীকালের অনেক রক্তক্ষরণ আর টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মুখ দেখেছে। এবং দেশটি বিশ্ব সাংবাদিককতা, গণতান্ত্রিক চিন্তা এবং গণমুখী সমাজ ব্যবস্থার নতুন যুগ প্রবর্তক হিসেবে আধুনিক ইতিহাসে নিজের আসন দখল করে নিয়েছে। ইতিহাসের এই সব তথ্য উত্থাপনের কারণ হলো– ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়– যা এখন আমরা ভুলতে বসেছি।

ষোড়শ শতকে ইউরোপে প্রথম যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিলো সেটির নাম 'নোতিজিয়ে স্ক্রিতে' ১৫৫৬ সালে এই কাগজটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন গুটেনবার্গের মুদ্রন যন্ত্রটি পুরোপুরি ছাপার জন্য চালু হয়ে গেছে। নোতিজিয়ে স্ক্রিতে ছাপার মেশিনে মুদ্রিত হয়েই প্রকাশিত হতে থাকে। ওই সময়ে পাক–ভারত উপমহাদেশে ঘটে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়া মজবুত হয়। উপমহাদেশে তখন সার্বিক অর্থে সংবাদপত্রের অভ্যুদয় না ঘটলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ সংবলিত এক ধরনের তথ্যসমৃদ্ধ রাজকীয় ইশতেহার বিলি করা হতো দরবারের আমির-ওমরাহ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, প্রদেশের সুবেদার, সামরিক কর্মকর্তা, ফৌজদার তথা জেলা প্রশাসক এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে। এসব ইশতেহার বিলি-বণ্টন ছাড়াও সম্রাটের দরবার, রাজধানী ও সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরে টাঙিয়েও রাখা হতো। যারা এই

www.pathagar.com

ইশতেহারের তথ্য সংগ্রহ করতেন তাদের বলা হতো 'ওয়াকিয়ানবিস'। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সাংবাদিক। দিল্লির প্রথম তুর্কি সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের আমল থেকে শুরু করে বাংলার স্বাধীন সুলতান আমল, গোটা মোগল যুগ –১৫২৬-১৭৫৬) এবং শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আমল পর্যন্ত ওয়াকিয়ানবিসগণ ছিলেন খোদ সম্রাট বা সুলতানের আস্থাভাজন ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী। এদের প্রভাবটাও ছিলো অনেক বেশি। বর্তমান সময়ের সাংবাদিকরাও সেরকম প্রভাবশালী। আকবরের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সময়কার ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরীতে' প্রামাণ্য তথ্য ও সূত্র হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর পূর্বতন যুগের ওয়াকিয়ানবিসদের বর্ণিত বিবরণসমূহ। আওরঙ্গজেবের রচিত ঐতিহাসিক পত্রগ্রন্থ 'খত-ই-আলমগিরি' তেও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে কয়েকজন ওয়াকিয়ানবিসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ওয়াকিয়ানবিসগণ বর্তমান সময়ের রিপোর্টারের মতোই কাজ করেছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শামসুদ্দিন সিরাজ, আফিক প্রমুখ ছিলেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট ওয়াকিয়ানবিস তথা রিপোর্টার। এদের বর্ণানার ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ তথ্যজ্ঞাপক ইশতেহারসমূহের সাথে খ্রিস্টপূর্ব যুগে জুলিয়াস সিজারের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা অ্যাকটা ডায়ারনার অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে একটি রাজকীয় ইশতেহারের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এতে মধ্য প্রদেশে উল্কাপাতের একটি ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। একজন ওয়াকিয়ানবিস ঘটনাস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্টের আকারে খবরটি পাঠিয়েছেন সম্রাটের কাছে। একেবারে স্পষ্ট রিপোর্টিং-এর মতো। সম্রাট এই খবরের ভিত্তিতে স্থানীয় ফৌজদারকে নির্দেশ দিলেন– উল্কাপাতের জায়গাটি খনন করে দেখতে হবে– উল্কার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেলে তা সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে। জায়গাটি খোঁড়ার সময় খননকারী দল ও স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাটির খুব গভীরে পাওয়া গেলো উল্কার প্রচুর ধাতব উপাদান। সম্রাটের কামারেরা তা থেকে আধা মণ লোহা বের করে। এরপর সম্রাটের নির্দেশে সেই লোহা দিয়ে কয়েকটি তরবারি তৈরি করা হয়। রাজকীয় ইশতেহারে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তারপর সম্রাট তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি'- তে এই ঘটনার উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে যখন সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়– এশিয়ায় তখন সেভাবে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে না থাকলেও প্রকাশনার বিকাশ ঘটতে থাকে। চতুর্দশ শতকে দিল্লির তুঘলক বংশের সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের আমলে দিল্লিতে প্রথম স্থাপিত হয় হস্তচালিত ছাপযন্ত্র তথা প্রেস মেশিন। এটাই ছিলো এই উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রেস। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক, যাঁকে পাগলা সুলতান বলা হয়ে থাকে। চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে

www.pathagar.com

তুঘলক, যাঁকে পাগলা সুলতান বলা হয়ে থাকে। চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তুঘলক প্রেস স্থাপন করেছিলেন। চীন সম্রাট কুবলাই খান বিশ্বে প্রথম কাগজের নোট বের করে মুদ্রার জগতে এবং সভ্যতার ইতিহাসে এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেন। কুবলাই খানের প্রবর্তিত কাগজের নোট ছাপা হতো পিকিং শহরে স্থাপিত হস্তচালিত কাঠের প্রেস থেকে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চীনেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় ছাপার প্রেস। বলাই খানের দেখাদেখি মুহম্মদ বিন তুঘলকও কাগজের নোট চালু করেন এই উপমহাদেশে। দিল্লিতে স্থাপিত কাঠের প্রেসে ছাপা হতো কাগজের নোট। সংবাদপত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে এশিয়ার মধ্যে চীনেই প্রথম সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রটি হচ্ছে 'নোতিজিয়ে স্ক্রিতে'। ১৫৫৬ সালে এটি প্রকাশিত হবার বছরখানেকের মধ্যে পাঠক নন্দিত হয়ে ওঠে। পাঠক সমাজ পয়সা দিয়ে পত্রিকাটি কিনতে শুরু করেন। পরবর্তী শতকে বৃটেনে আরো উন্নতমানের সংবাদপত্র প্রকাশ হতে থাকে। আমি সেই ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই না। ফিরে আসতে চাই আমাদের বাংলা সংবাদপত্রের জগতে। সংবাদপত্রের সাথে ছাপাখানা বিষয়টি একই দেহের দুইটি অঙ্গের মতো জড়িত। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলায় যন্ত্রচালিত ছাপার মেশিনের প্রচলন বাংলাভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ এবং বাংলা গদ্যের বিকাশের জন্য আমরা ইউরোপীয়দের কাছে অনেকখানি ঋণী। পলাশী যুদ্ধের আট বছর পরে ১৭৬৫ সালের দিকে চুঁচড়া শহরে প্রথম যন্ত্রচালিত ছাপাখানা চালু করেন গুলন্দাজ ধর্মযাজকগণ। ছাপাখানায় বাংলা মুদ্রাক্ষরও প্রথম ব্যবহার করেন তারা। বাংলাভাষায় খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যে ইউরোপের ধর্মযাজকরা এই কাজটি শুরু করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ পুস্তকটিও ছাপিয়েছিলেন পশ্চিমা ধর্মযাজকরা। এই বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন বৃটিশ পণ্ডিত ও ধর্মযাজক হলহ্যাড সাহেব। এই উপমহাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক। জেমস আগস্টাস হিকি ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি "বেঙ্গল গেজেট" নামের এই ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। হিকির গেজেট প্রকাশের ৩৮ বছর পরে ১৮১৮ সালে প্রথম অভ্যুদয় ঘটে বাংলা সংবাদপত্রের। 'দিকদর্শন' নামের আদি বাংলা সাময়িক পত্রটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন একজন ইংরেজ। তাঁর নাম ছিলো জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদক। সেখানে থেকে যাত্রা শুরু করে আজ পর্যন্ত হিসেবে বাংলা সংবাদপত্রের জগতে নবীনতম পত্রিকা সমকালের সম্পাদকের দায়িত্ব গোলাম সারওয়ারের কাছে পৌঁছেছে। হয়তো কাল আর একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হবে–আর একজন নতুন সম্পাদক হবেন। তবে আজ আমি এই নতুন পত্রিকার নতুন সম্পাদকের সাফল্য কামনা করি একান্ত মনে।

'দিকদর্শন' কিন্তু পুরোপুরি বাংলা পত্রিকা ছিল না। এই পত্রিকায় বাংলা সংবাদ নিবন্ধের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাতেও লেখা ছাপা হতো। বাংলা

www.pathagar.com

ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান যুবকদের খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিলো দিকদর্শনের উদ্দেশ্য। দিকদর্শন প্রকাশের এক মাস পরে উইলিয়াম কেরির সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ ঘটলো বিখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাটির। কেরি সাহেবের কেরানি রাম রাম বসু ছিলেন সমাচার দর্পনেণ সম্পাদনা সহকারী। এটিও ছিলো মূলত খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারপত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাচার দর্পণ বাংলা সাংবাদিকতার গোড়াপত্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস মন্থনে নিজের কাছে ভালো লাগছে বলেই এই আলোচনার অবতারণা করলাম। আজ থেকে দুশ' বছর আগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলাদেশে কোনো ইংরেজি কিংবা বাংলা দৈনিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে ইংরেজি ভাষার কাগজ স্টেটসম্যান যার আদি নাম ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া এবং অমৃতবাজারসহ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অমৃতবাজার দেশীয় স্বার্থরক্ষা করার নীতি অবলম্বন করতে গিয়ে বৃটিশ শাসকদের রাজরোষে পড়ে। ফলে অমৃতবাজারকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮১৮ সালে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হবার পক্ষকালের ব্যবধানেই প্রথম বাঙালি সম্পাদিত পত্রিকা সাপ্তাহিক 'বাঙ্গালা গেজেটি' প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং প্রকাশক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। এই উপমহাদেশের পত্রপত্রিকার ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, উপমহাদেশীয় ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে সংবাদপত্রের। আজ ভাবতেও ভালো লাগে যে, উপমহাদেশীয় সাংবাদিকতায় বাঙালিরাই পালন করেছে অগ্রপথিকের ভূমিকা। এই ইতিহাস হয়তো অনেকেরই জানা হয়তো বা অনেকের জানা নেই। তবে গৌরবের ইতিহাস যতই ঘাঁটা হবে ততই মঙ্গল হবে। নতুন প্রজন্ম পুরনো দিনের কথা জানবে। তারা গৌরবের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত হবে। সে কারণেই আমার এই আলোচনা।

১৮৩১ সালে মুসলমান সাংবাদিক সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিলো 'আখবার'। এটি ছিলো ফার্সি ভাষার কাগজ। 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র প্রকাশিত হয়েছিলো কোলকাতার কালিঙ্গা রোড থেকে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেখ আলিমুল্লাহ। তার পথ ধরে অনেক মুসলমান সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশে এগিয়ে আসেন এবং তারা বাংলা সংবাদপত্রকে এগিয়ে নিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এখানে তাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সম্পাদক শেখ আলিমুল্লাহর পর ১৮৪৬ সালে কোলকাতার বৈঠকখানা রোড থেকে ফরিদুদ্দিন খাঁ পঞ্চভাষিক সাপ্তাহিক 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশের মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকেও বেশ কিছু পত্রপত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এগুলোর মধ্যে ১৮৬১ সালে আলাহেদাদ খাঁ সম্পাদিত পাক্ষিক 'ফরিদপুর দর্পণ' মানিকগঞ্জের পারিল গ্রাম

www.pathagar.com

আনিসউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত পাক্ষিক বার্তাবহ, মাগুরা থেকে মুনশি গোলাম কাদেরের সম্পাদনায় মাসিক 'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী' কুষ্টিয়ার লাহিড়ী পাড়া থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'হিতকরী' –১৮৯০), ১৮৯২ সালে টাঙ্গাইল থেকে মোসলেম উদ্দিন খানের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল হিতকরী, কুষ্টিয়া থেকে মুহম্মদ রওশন আলীর সম্পাদনায় মাসিক সাহিত্যপত্র 'কোহিনূর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমার জানা মতের বাইরে এ সময়ের মধ্যে আরো পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। আমার নিজ শহর রংপুরও সংবাদপত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের আজকের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রথম সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিলো রংপুর থেকেই। ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে অর্থাৎ বৃটিশ শাসনাধীন থেকে দেশ স্বাধীন হবার ঠিক একশ' বছর আগে এই অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার এই পত্রিকার নিজস্ব প্রেস 'বার্তাবহ যন্ত্রালয়' থেকে মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৫৩ সালের সরকারি রিপোর্ট অনুসারে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিলো মাত্র একশ কপি, চাঁদা ছিলো বার্ষিক ৬ রুপি এবং অগ্রিম দিলে ৪ রুপি। রঙ্গপুর বার্তাবহ আজ সংবাদপত্রের এক গৌরবের ইতিহাস। সেই গৌরবের ধারাবাহিকতা নিয়ে আমাদের হাতে আসছে দৈনিক সমকাল। দেড় শতাধিক বছর আগের 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বর্তমানের কাছে পৌঁছাতে পারেনি– মাঝে কখন কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না, আশা করি সমকাল শতাব্দীর পথে চলতে কখনো হারাবে না। শত বছর পরে কোনো পাঠক যদি সূচনা সংখ্যাটির ইতিহাস নাড়াচাড়া করতে যায় তাহলে আমার আজকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

আমি আগেই বলেছি বাংলা সাংবাদিকতায় মুসলমানরা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। উনিশ শতকের শেষ অধ্যায়ে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান সম্পাদকদের সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৯৫ সালে মিহির ও সুধাকর প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে সম্পাদনা করেন শেখ আব্দুর রহিম, মোহম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ও সৈয়দ ওসমান আলী। ১৮৭৭ সালে মৌলভী আব্দুল খালেকের সম্পাদনায় উত্তর শিয়ালদা থেকে প্রকাশিত হয় অর্ধসাপ্তাহিক 'মহাম্মদ আখবর'। ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সৈয়দ হাসান আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক সুধাকর'। ১৯০১ সালে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও নিবারণ চন্দ্র দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক বালক'। ১৯০৩ সালে কোলকাতা থেকে কবি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত মাসিক নবনূর এবং একই বছর আগস্ট মাসে প্রথিতযশা সাহিত্যিক–সাংবাদিক মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় মাসিক এবং পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

ও দৈনিক হিসেবে 'মোহাম্মদী' প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভোলার কবি মোজাম্মেল হকের যুগ্ম সম্পাদনায় কোলকাতা থেকে 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' এবং একই বছর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সম্পাদনায় কোলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে 'মাসিক সওগাত' প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ সালে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও আব্দুর রশিদ সিদ্দিকীর যুগ্ম সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো মাসিক সাহিত্য পত্র 'সাধনা'। ১৯১৯ সালে শেখ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় 'মাসিক বঙ্গনূর', জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় কোলকাতার কলেজ স্কয়ার থেকে অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' এবং ১৯২৬ সালে মোহাম্মদ জাফর আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মাসিক সবুজ পল্লী', কমরেড মোজাফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় কোলকাতার হ্যারিসন রোড থেকে সাপ্তাহিক গণবাণী, আব্দুল মোনেমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক জনমত এবং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের নেতা আবুল হোসেন ও পরে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শিখা' প্রকাশিত হয়েছিলো। শেরেবাংলা ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মোজাফ্ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯২০ সালের মে মাসে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক নবযুগ', মওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় ১৯২১ সালে প্রকাশিত দৈনিক সেবক, ১৯২২ সালে দৈনিক মোহাম্মদী, ১৯২৬ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় 'দৈনিক সোলতান', ১৯৩৬ সালে প্রথমে মওলানা আকরম খাঁ এবং পরে আবুল কালাম শামসুদ্দিনের সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ', ১৯৪৬ সালে আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় 'দৈনিক ইত্তেহাদ'– ইত্যাদি পত্রিকাগুলো প্রাক–ভারত বিভাগ যুগে জাতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী যুগের উন্মোচন করেছে। এই কাগজগুলোর প্রাতঃস্মরণীয় সম্পাদকদের নির্মিত পথ অনুসরণ করেই আজ আমাদের সংবাদপত্র জগতের মহাশূন্য বিজয়ের এ যুগে প্রবেশ করেছি। আজ আমরাও এ যুগে পেয়েছি গোলাম সারওয়ার, এ. বি. এম. মূসা, বজলুর রহমান, তোয়াব খান, মাহবুবুল আলম, রাহাত খান, এনায়েতউল্লাহ খান, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান, জাকারিয়া খান, আসাফউদ্দৌলা, মহিউদ্দিন আহমেদ, আমানুল্লাহ কবীর, এ. এম. এম. বাহাউদ্দিনের মতো সম্পাদকবৃন্দকে। তাঁরা আমাদের সংবাদপত্র জগতের গৌরবের উত্তরাধিকারী।

আজ বাংলাদেশে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আমি নিজেও একটি দৈনিক প্রকাশের দুঃসাহসী কাজে হাত দিয়েছিলাম। তবে সফল হতে পারিনি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি– পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে। সংবাদপত্রের প্রতি দুর্বলতা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। আমি নিজে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সফল হতে না পারলেও এই শিল্পের সাথে জড়িত

www.pathagar.com

মানুষগুলোর জন্য অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি একান্তভাবে। আমাদের সাংবাদিকরা যাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আজ সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেছেন তাদের গৌরবগাথা ইতিহাস আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম আমাদের সাংবাদিক সমাজের কল্যাণে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি। সাংবাদিকদের জন্য পঞ্চম ওয়েজবোর্ড পর্যন্ত আমার আমলেই দেয়া হয়েছে। তারপর সাংবাদিকরা গত ১৪ বছরে সরকারের কাছ থেকে কত কী সুবিধা আদায় করতে পেরেছে তা আমার জানা নেই। আমিই প্রথম সাংবাদিকদের জন্য আবাসিক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছিলাম। তাদের জন্য মিরপুরে প্লট বরাদ্দ করেছি। আমি খুবই গর্ববোধ করছি আমার সেই বরাদ্দকৃত প্লটে সাংবাদিকদের নিজস্ব ভবন তৈরি হয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম– সেই অর্থে প্রেসক্লাবের দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণের কাজ হয়েছে। শুধু জাতীয় প্রেসক্লাব নয়– দেশের আরো কয়েকটি প্রেসক্লাবে আমার শাসনামলে অনুদান পেয়েছে। জানা মতে আমার পরে আর কোনো সরকারের কাছ থেকে এদেশের সাংবাদিক সমাজ এমন কোনো সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারেনি। সংবাদপত্র শিল্পকে দিয়ে আমি এদেশের কাগজ শিল্পকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমার শাসনামলে দেশীয় কাগজে আমাদের সংবাদপত্র ছাপা হতো। আজ আর সেই অবস্থা নেই। দেশের কাগজের বাজার দখল করেছে বিদেশী কাগজ। বন্ধ হয়ে গেছে খুলনার বিখ্যাত নিউজপ্রিন্ট মিল। বেকার হয়েছে হাজার হাজার শ্রমিক। বেকার হয়েছে এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত লাখো মানুষ। দেশের কাগজ শিল্পকে ধ্বংস করে বিদেশী বর্ণিল কাগজ আমদানির নীতি অবলম্বন করে জাতীয়ভাবে কতোটুকু লাভ পাওয়া গেছে তা সময়ই বলে দেবে।

আমি সংবাদপত্র শিল্প এবং সাংবাদিক সমাজের জন্য যা কিছু করেছি– তা বিবেকের তাগিদেই করেছিলাম। তবে আমার জন্য দুঃখজনক ঘটনা হলো সংবাদপত্রের কাছ থেকে আমি সুবিচার পাইনি। যাদের আমি ঘর দিয়েছি, ওয়েজবোর্ড দিয়েছি, তারাই আমার বিরুদ্ধে যেনো বেশি সোচ্চার হয়েছে। মনে হয়েছে– আমাকে কটাক্ষ করে কিংবা আমাকে আঘাত করে কিছু লিখতে পারলেই যেনো জাতি উদ্ধার পেয়ে যাবে। আমার রাজনৈতিক দল দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও অনেক সংবাদপত্রে সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। এর জন্য আমি আহত ও ব্যথিত হলেও ক্ষুব্ধ হই না। আমি বিশ্বাস করি সাংবাদিক বন্ধুগণ একদিন তাদের প্রকৃত বন্ধুকে চিনতে পারবেনই। কারণ আমার শাসনামলে কোনো সাংবাদিককে শামসুর রহমান, মানিক সাহা, হুমায়ুন কবির বালু, দীপঙ্কর, বেলালের মতো প্রাণ দিতে হয়নি। কোনো সাংবাদিককে নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করতে হয়নি– কোনো সাংবাদিকের শরীরে এতোটুকু আঘাত লাগেনি। আমার শাসনামলে কোনো পুলিশ প্রেসক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকদের বেধড়ক পিটুনি দেয়নি। কোনো প্রেসক্লাবে বোমা হামলা হয়নি।

www.pathagar.com

এসবের মূল্যায়ন তো একদিন হতেই হবে। তা না হলে ন্যায়নীতি, আদর্শ, কৃতজ্ঞতা এসব শব্দ তো অভিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি এটাই যদি আমার একমাত্র দোষ হয়ে থাকে, তাহলে আরো অনেকেই এই দোষে দুষ্ট আছেন। একটি কথা আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই– ক্ষমতা আমি গ্রহণ করিনি। ক্ষমতা আমার উপর অর্পিত হয়েছে। পরবর্তীতে আমি আমার ক্ষমতাকে গণতান্ত্রিক বিধিসম্মত করে নিয়েছি। আর সে কারণেই আমার পরে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করতে পেরেছেন। তবে এই দুই নেত্রীর আমলের গণতন্ত্র আর আমার আমলের গণতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করে দেশ ও জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তার ব্যবধানটা বের করতে পারলেই প্রকৃত গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই সাথে আমার পূর্বে ক্ষমতা গ্রহণের ইতিহাসটাও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন আছে। সদ্য স্বাধীন দেশে যে নেতৃত্ব ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলো, তারা স্বাধীন দেশের নির্বাচিত সরকার ছিলো না। তখন জাতীয় সরকার না হয়ে একটি দল ক্ষমতা গ্রহণ করছে। খন্দকার মোস্তাক বা জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ গণতান্ত্রিক পন্থায় হয়নি। কিন্তু সেই জিয়াউর রহমানই দেশকে দিয়েছেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। আর আমি দেশকে উপহার দিয়েছি উন্নয়ন সমৃদ্ধি এবং সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার বদলের প্রক্রিয়া। যারা ৪টি মাত্র পত্রিকা রেখে বাকি পত্রিকাগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়ে সাংবাদিকদের বেকার করে দিলেন, যারা প্রেসক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকদের নির্দয়ভাবে পিটিয়ে যখম করে দিলেন, যাদের আমলে একের এক সাংবাদিক নির্মমভাবে নিহত হলেন– আহত হলেন তারাই হয়ে গেলেন সাংবাদিকদের বন্ধু। তারা হয়ে গেলেন গণতান্ত্রিক– আমি হলাম গিয়ে "স্বৈরাচার"– এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু আমি কোনো কিছুতেই হতাশ হই না, হাজার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আশায় বুক বেঁধে রাখি। ভীষণভাবে একজন আশাবাদী মানুষ আমি। পুরাতনের যা মন্দ তা পরিত্যাগ করে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু গৌরবের সেসব কিছুকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চাই। নতুনের কাছে অনেক প্রত্যাশা করি।

---

www.pathagar.com

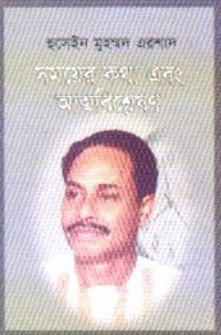

লেখক পরিচিতি

কবি, লেখক, রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর জন্ম ১৯৩০ সালে উত্তরাঞ্চলীয় জেলা রংপুরে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁর প্রথম কবিতা রচনার প্রয়াস। কবিতার পাশপাশি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় গল্প, প্রবন্ধও তিনি লিখতেন। তবে কবিতার দিকেই ঝুঁকেছিলেন বেশী। বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষ কবির সকল মুগ্ধতার মধ্যে একটি একান্ত নিঃসর্গের মতো জন্ম নিয়েছিলো সেই কিশোরকালেই। পেশা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সৈনিকের জীবন। ১৯৫২ সালে তিনি সেনাবাহিনীর কমিশন লাভ করেন। ১৯৭৮-এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯৮২-র ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেন। খেলাধূলার প্রতি তাঁর আসক্তি সর্বজনবিদিত। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তিনি লাভ করেছেন জাতীয় পুরস্কার। সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ প্রবল। ব্যক্তিগত জীবনে কবি এরশাদ মৃদুভাষী এবং মিষ্টি স্বাভাবের মানুষ। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'কনক প্রদীপ জ্বালো', 'এক পৃথিবী আগামীকালের জন্য, 'নির্বাচিত কবিতা', 'নবান্নে সুখের ঘ্রাণ', 'যুদ্ধ এবং অন্যান্য কবিতা','এরশাদের কবিতা সমগ্র', 'ইতিহাসে মাটির চেনা চিত্র', 'যেখানে বর্ণমালা জ্বলে ও 'কারাগারে নিঃসঙ্গ দিনগুলো'। প্রবন্ধগ্রন্থ 'দেশে ও দশের কথা বলছি'। 'সময়ের কথা এবং আত্মবিশ্লেষণ তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ।

প্রকাশক